কেদারনাথের পথ—ফটো : ডাঃ শীতাংশু মিত্র

ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির
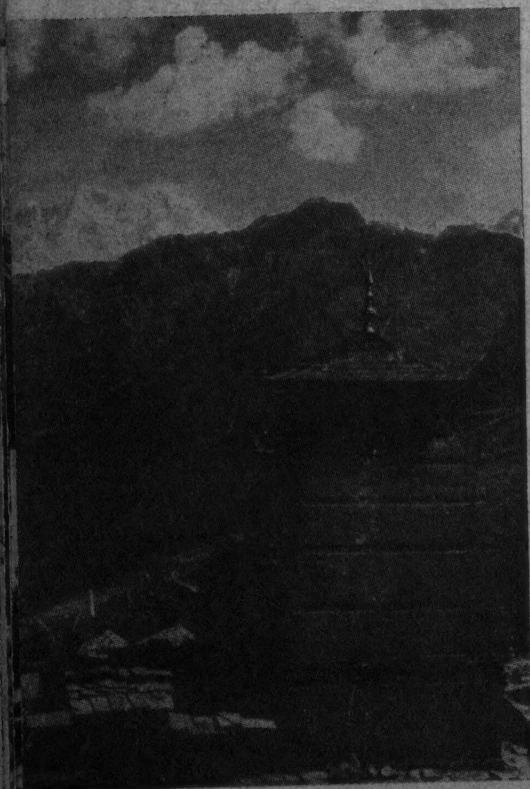
তুঙ্গনাথের মন্দির—ফটো ঃ অমু চ্যা

হিমালয় পর্ব

রম্যাণি বীক্ষ্য

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ কাহিনী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭০০০৭৩

RAMYANI BEEKSHYA
Himalaya Parva
(A Bengali Travelogue)
By Subodh Kumar Chakravarti

প্রকাশক :
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৬৫

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীসুধীর মৈত্র
ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

মুদ্রাকর :
শ্রীরণজিতকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-৭০০০১৪

উৎসর্গ

গত বিশ বছর ধরে প্রশংসা ও নিন্দা করে
যাঁরা আমার লেখার প্রেরণা জুগিয়েছেন
তাঁদের হাতে

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা
যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

—ঋগ্বেদ ।

এইসব হিমবান্ শৈলমালা মহিমা যাঁহার,
মহিমা যাহার এই নদী-সাথে মহা পারাবার,
দশদিক যার বাহু নিখিলেরে করিছে ধারণ,
সেই কোন্ দেবতারে হবি মোরা করি সমর্পণ !

(রবীন্দ্রনাথ)

বদ্রীনাথ থেকে নীলকণ্ঠ পর্বত

(উপরে) বরফের উপর দিয়ে পথ—ফটো ঃ অমু চ্যাটার্জি (নিচে) আদিবদরী

(উপরে) কেদারনাথের পথে চটি

(নিচে) উত্তরকাশীর সদাব্রত
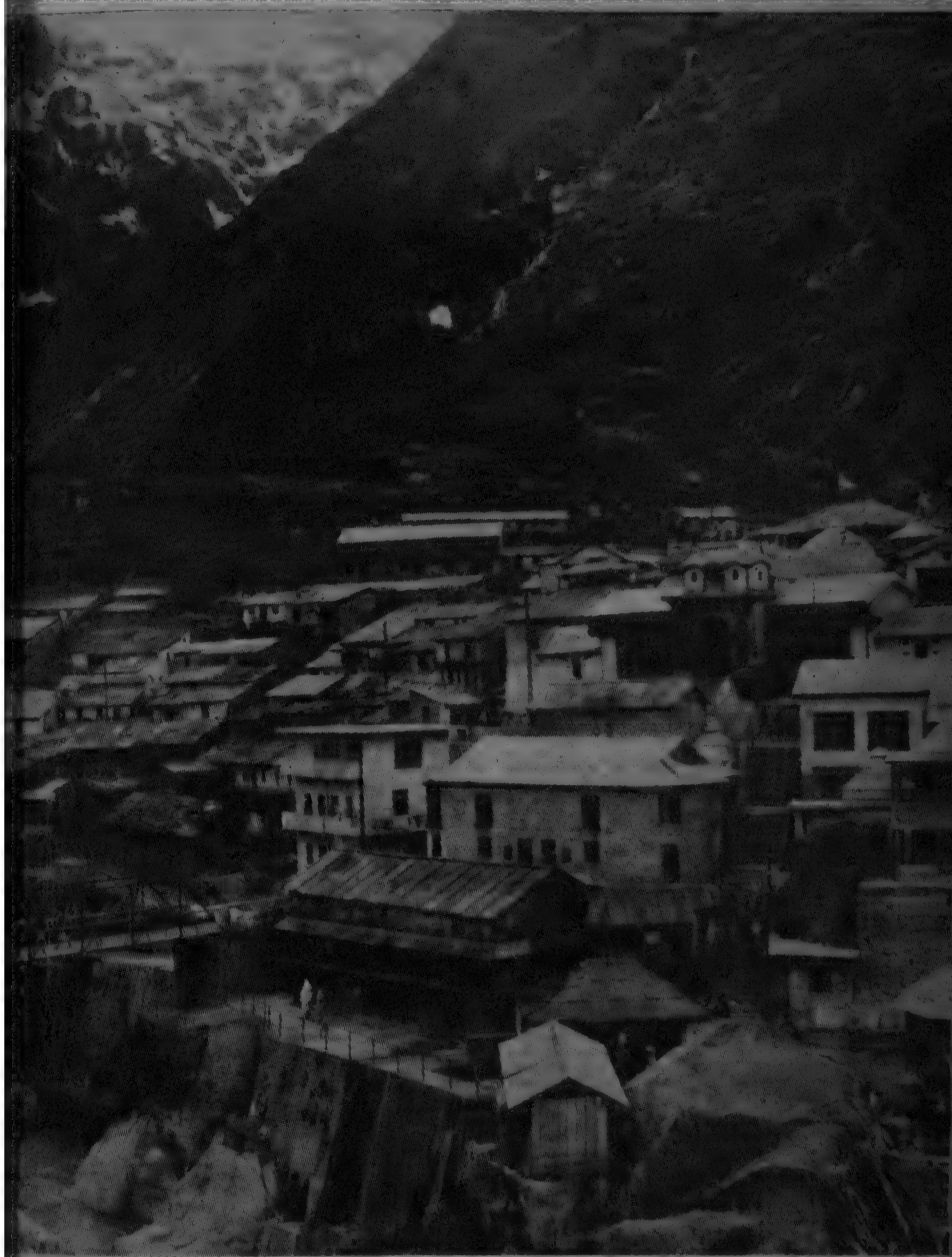
অলকনন্দার তীরে বদ্রীনাথ শহর

(উপরে) উত্তরকাশীতে ভাগীরথী

(নিচে) গঙ্গোত্রীর পথ
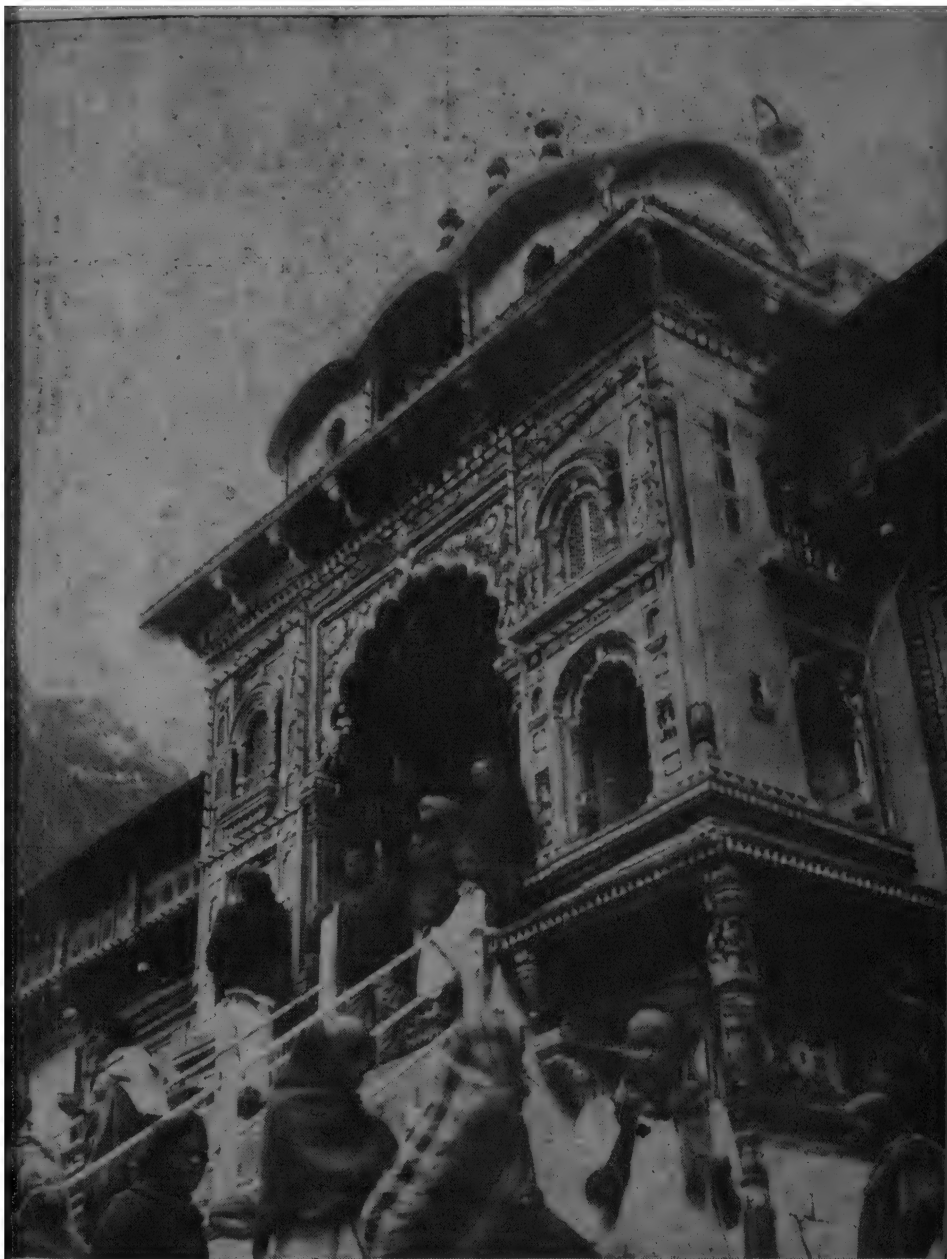
বদ্রীনাথের মন্দির ফটো ঃ ডাঃ শীতাংশু মিত্র

গোপেশ্বরের মন্দির—ফটো : অমু চ্যা

উত্তরকাশীর মন্দির

রুদ্রপ্রয়াগে অলকনন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম

১

চোখ মেলে অন্ধকার দেখলুম, আর যেন দোল্‌নায় দুলছি। কয়েকটা মুহূর্ত সময় লাগল বুঝতে যে ট্রেনে চলেছি, আর রাতের অন্ধকার এখনও তেমন স্বচ্ছ হয় নি। ছোট লাইনের ছোট গাড়ি, ফার্স্ট ক্লাস কুপে কম্পার্টমেন্ট। আমি উপরের বাঙ্কে শুয়ে ঘুমিয়েছিলুম। বোধ হয় সারা রাত ঘুমিয়েছি, তাই শুয়ে থাকবার ইচ্ছা আর হল না। একটু সাবধানে সর্তক ভাবে নিচে নেমেই আশ্চর্য হয়ে গেলুম।

স্বাতি উঠে বসে ছিল। জানালার শার্সি তুলে দিয়ে পৃথিবীর নিদ্রাভঙ্গ দেখছিল গভীর মনোযোগে। আমার পায়ের শব্দ পেয়েও সে চমকে উঠল না। যেন এই রকমই আশা করছিল অনেকক্ষণ থেকে, এমনি ভাবে বলল : ঘুম ভাঙল ?

উত্তরের প্রয়োজন ছিল না, তবু বললুম : তুমি জাগিয়ে দিলে আগেই নামতুম।

স্বাতি বলল : ঘুমোবার সময় আছে বলেই জাগাই নি।

বলে জানালার ধারে আরও একটু সরে বসে আমাকে বসবার জায়গা করে দিল। আমি তার পাশে এসে বসলুম।

জানালা দিয়ে ভোরের মিষ্টি বাতাস আসছে আর দিগন্তে আলোর সঙ্কেতও পাওয়া যাচ্ছে। নৈনিতাল এক্সপ্রেস এখন কাঠগোদামের দিকে ছুটছে। আমরা এবারে হিমালয় দেখতে যাচ্ছি।

হিমালয়!

আশ্চর্য এক নাম। দেবতাত্মা নয়, ভারতাত্মা হিমালয়। যুগ যুগ ধরে এই হিমালয় ভারতকে বাঁচিয়েছে, রক্ষা করেছে ভারতের অধ্যাত্ম-চেতনা। হিমালয় না থাকলে ভারতের অস্তিত্ব আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

না, আমরা এই হিমালয় দেখতে যাচ্ছি না। যে হিমালয় দেখেছি কাশ্মীরে আর দার্জিলিঙে, সেই হিমালয়েরই নির্জন রূপ দেখতে যাচ্ছি রানীখেতে।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটবার পর স্বাতি বলল: স্বপ্ন কি সত্যি হয়?

আমি হেসে বললুম: রাতে আজ স্বপ্ন দেখেছ বুঝি?

স্বাতি মাথা নাড়ল, তার পরে বলল সেই স্বপ্নের কথা: বরফের পাহাড়, তারই কোলে পাথরের মন্দির। পেঁজা তুলোর মতো বরফ পড়ছে। আর তুমি দাঁড়িয়ে আছ সেই মন্দিরের সামনে।

আর তুমি?

আমি!

স্বাতি যেন ভাবনার মধ্যে ডুবে গেল, আত্মস্থ ভাবে বলল: আমি কি মন্দিরের ভেতরে ঢুকেছিলাম? কিন্তু তোমাকে বাইরে রেখে আমি একা মন্দিরে ঢুকব কেন?

আমি হেসে বললুম: এ রকম মন্দিরের স্বপ্ন তুমি এর আগেও দেখেছিলে!

দেখেছিলাম বুঝি!

বললুম: দ্বারকা যাবার পথে। স্বপ্নে তুমি সোমনাথের ভাঙা মন্দির দেখেছিলে সমুদ্রের ধারে। আর ফিস ফিস করে সেই গল্প বলেছিলে চলন্তি গাড়িতে।

স্বাতি বলল: মনে পড়েছে। বাবা-মা তখনও ঘুমোচ্ছিলেন।

এবারে তাঁরা সঙ্গে নেই। এবারে তাঁরা হাওড়া স্টেশনে আমাদের তুলে দিয়েছেন পাঞ্জাব মেলে। কুপে কম্পার্টমেন্টে। প্রসন্ন মনে আশীর্বাদ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের চোখ ছল ছল করে উঠেছিল আনন্দে না বেদনায়, তা বুঝতে পারি নি। স্বাতি তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, তার দৃষ্টি আমি দেখতে পাই নি।

রাত আটটার পাঁচ দশ মিনিট আগে ট্রেন ছেড়েছিল। আর পর

দিন দুপুর সাড়ে তিনটের পরে আমরা লক্ষ্ণৌএ নেমেছিলুম। পাশেই ছোট লাইনের স্টেশন। সেখান থেকে এই নৈনিতাল এক্সপ্রেস ছেড়েছে রাত সাড়ে নটায়। সকাল আটটায় কাঠগোদামে পৌঁছবে। কাঠগোদাম থেকে বাসে আমরা রানীখেতে যাব।

স্বাতি বলেছিল : এবারে আমরা এমন জায়গায় যাব, যেখানে ভিড় নেই। আর বারান্দায় বসে দেখব হিমালয়। পাথরের পাহাড় নয়, বরফের পাহাড়। দার্জিলিঙের মতো সারাক্ষণ বরফ দেখতে চাই, কিন্তু মানুষের ভিড় দেখতে চাই নে।

তার এই ইচ্ছার কথা শুনে রানীখেতের কথা আমার মনে পড়েছিল। বলেছিলুম : রানীখেত ঠিক এই রকম শহর বলে শুনেছি।

তাই সিমলা নয়, মসুরি নয়, নৈনিতালও নয়, রানীখেতেই আমরা যাচ্ছি। রানীখেত থেকে কৌসানি যাওয়া যায়। কৌসানি আরও নির্জন, আর হিমালয় আরও সুন্দর।

স্বাতি এইবারে প্রশ্ন করল : স্বপ্নে আমি কোন্ মন্দির দেখলাম বলতে পার ?

একটি মন্দিরের নামই আমি জানতুম, বললুম : কেদারনাথের মন্দির।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : মন্দিরের ঠিক পেছনেই বরফের পাহাড়। কেদারনাথকে প্রণাম করবার জন্যে বরফ যেন মন্দিরের দরজায় নেমে এসেছে। অপরূপ দৃশ্য।

আরও আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল : তুমি দেখেছ !

আমি হেসে উত্তর দিলুম : ছবি দেখেছি।

ছবি ! কিন্তু আমি কি এই ছবি কখনও দেখেছি !

না দেখে থাকলে স্বপ্ন দেখবে কী করে !

স্বাতি ভাবতে লাগল। আর এই ভাবনার কবল থেকে তাকে মুক্তি দেবার জন্যে বললুম : তাহলে কল্পনায় ঐ ছবি দেখেছ।

তা কি সম্ভব!

বলে স্বাতি আমার দিকে ফিরে তাকাল।

সম্ভব, এ কথা বলতে পারলুম না। অসম্ভব বলাও চলে না। স্বাতি যে স্বপ্ন দেখেছে, তা মিথ্যে নয়। বরফের পাহাড়ের কোলে মন্দির দেখেছে, তাও সত্যি। সে মন্দির কেদারনাথের না হতে পারে, কিন্তু মন্দির সে ঠিকই দেখেছে। কিন্তু কেন এই মন্দিরের স্বপ্ন দেখেছে, তা বিশ্লেষণ করতে পারি এমন বিদ্যা আমার নেই। ফ্রয়েডের ড্রিম পড়েছি, পড়েছি গিরীন্দ্রশেখর বসুর স্বপ্ন। এই বিদ্যা নিয়ে স্বাতির স্বপ্ন বিশ্লেষণ করার সাহস আমার হল না। বললুম : সত্য স্বপ্ন নয়, কিন্তু স্বপ্ন অনেক সময় সত্য হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু রানীখেতে তো কোন মন্দির নেই!

নাই বা থাকল!

বেরোবার সময় কেদারনাথের কথা তো আমরা ভাবি নি!

আমি হেসে বললুম : তাহলে কেদারনাথ বোধ হয় আমাদের দর্শন দেবেন।

স্বাতি গম্ভীর হয়ে রইল, কোন উত্তর দিল না।

কিন্তু আমার এই পরিহাস শুনে বিধাতা যে হেসেছিলেন, তা আমি বুঝতে পারি নি। বিচিত্র রহস্যে আবৃত মানুষের ভবিষ্যৎ। তা আমরা দেখতে পাই নে বলেই জীবনে বৈচিত্র্য আছে, স্বপ্ন আছে, আছে মাধুর্য। বর্তমান থেকেই আমরা বিপদ ও দুঃখ জয়ের শক্তি সঞ্চয় করি অজ্ঞাত প্রত্যাশায়। ভবিষ্যৎ তাই অন্ধকারেই আবৃত থাক। বিধাতার পরিহাস আমরা দেখতে চাই না।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে থাকবার পরে স্বাতি বলল : সাড়ে ছটায় চা পাওয়া যাবে। তার আগেই আমাদের মুখ হাত ধুয়ে নিতে হবে।

বললুম ঃ বুঝেছি।

কী বুঝেছি তা জানবার জন্যে স্বাতি আমার দিকে ফিরে তাকাল।

বললুম ঃ কাঠগোদামে আব সময় নষ্ট করতে চাও না।

স্বাতি আমার কথা মেনে নিল, বলল ঃ তাড়াতাড়ি বাস ধরতে পারলে দুপুরে আমরা রানীখেতেই খেতে পারব।

তার এই খাবার চিন্তা দেখে আমি হাসলুম। আর স্বাতি রাগের ভান করে বলল ঃ সময় মতো খেতে না পেলে এই হাসির মেজাজটি আর থাকবে না।

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম ঃ প্রাতঃস্মবণীয়রাই প্রাতে এ কথা স্মরণ করে।

স্বাতি বলল ঃ চিরস্মরণীয়দের জন্যেই সব কথা মনে রাখতে হয়।

বলে ব্যাগের ভিতর থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বার করে আমার হাতে দিল। বাধ্য ছেলের মতো আমি সেগুলো হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলুম।

আমি ফিরে আসবার পরে স্বাতি গেল। ফিরল তার প্রসাধন শেষ করে। ট্রেনে সে সিল্ক মেশানো টেরিলিন পরে। তাতে ভাঁজ পড়ে না। রাতের পরা শাড়ি গুছিয়ে পরে নিলেই চলে। আজও তাই তার শাড়ি বদলের প্রয়োজন হল না।

লালকুয়া জংসনে আমাদের চা এল। আমরা আসছি বেরেলি জংসনের দিক থেকে। মোরাদাবাদ জংসন থেকেও এখানে ট্রেন আসে। আর ঐ লাইনের ধারেই রামনগর স্টেশন। কর্বেট পার্ক যেতে হয় সেখান থেকে, রানীখেত থেকেও সেখানে যাওয়া যায়।

এবারে আমার এ সব কথা ভাববার ইচ্ছা ছিল না। স্বাতির প্রশ্নের উত্তরেই বেয়ারা এই খবর দিয়ে গেল।

এক সময়ে স্বাতি বলল ঃ এবারের ভ্রমণ নিয়ে কি কিছু লিখবে না?

বললুম : কুমায়ুন পাহাড় নিয়ে অনেকেই বই লিখেছে।

হিমালয় নিয়ে কিছু লেখ।

হিমালয় নিয়ে!

আমি যেন চমকে উঠলুম।

আর স্বাতি তা দেখতে পেয়ে বলল : চমকে উঠলে যে ?

ভয়ে ভয়ে বললুম: কোন্ দিন হয়তো বলবে, সমুদ্র নিয়ে লেখ।

এবারে স্বাতি হাসল।

বললুম : তবু সমুদ্রের ঢেউ আছে। তরঙ্গ ভঙ্গ আছে, গর্জন আছে। সমুদ্র নিয়ে আর জেলে নিয়ে গল্প লেখা যায়। কিন্তু সে গল্পও তো লেখা হয়ে গেছে।

স্বাতি বলল : অনেক বেশি আছে হিমালয়েব। পাথর আছে, বন আছে, বরফ আছে, আছে মানুষ আব মন্দির।

সে সব কথা লিখতে আর কিছু বাকি নেই।

কিন্তু তোমার লেখা তো বাকি আছে!

কতকটা বিহ্বল চোখে আমি তার দিকে তাকালুম।

উজ্জ্বল চোখে স্বাতি বলল : সতেরো পর্বে কোন গ্রন্থ শেষ হয় না।

মানে ?

মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব, পুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ। শুধু বেদব্যাসই এই কথা মানেন নি, কৃষ্ণও মেনেছিলেন। তাঁর গীতারও অষ্টাদশ অধ্যায়।

সত্যি!

সহাস্যে স্বাতি বলল : এ হল আমাদের হালদার মশায়ের কথা। তিনি উত্তরাখণ্ডের চার ধাম দর্শনে গেছেন—যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী আর কেদার-বদরী। ফিরে এসে তোমাকে এই গল্প বলবেন তোমার অষ্টাদশ পর্বের জন্যে।

বললুম : এ সব কথা লিখতে আর বাকি নেই। অনেকে

লিখেছেন। হালদার মশাইকে শাস্ত্রবাক্য বলো, ও অঞ্চল ঘুরে এলে নিজেকেই লিখতে হয়।

কাঠগোদামের আগে আর একটি মাত্র স্টেশন, তার নাম হল্‌দোয়ানি। সেখান থেকেও কুমায়ুন পাহাড়ের নানা স্থানে যাওয়া যায়। বেয়ারা এসে চায়ের ট্রে নামিয়ে নিয়ে যাবার পরে আমি বিছানাপত্র বেঁধে ফেললুম। স্বাতি আমাকে সাহায্য করল চাদর ভাজ করার সময়ে। তার পরে বার্থের ব্যাক-রেস্ট উঁচু করে দিয়ে আবার আমরা পাশাপাশি বসলুম।

হল্‌দোয়ানি ছেড়ে ট্রেন এবারে কাঠগোদামে এসে দাঁড়াবে। অনেক দূরে নীল পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ঐ পাহাড়ের পাদদেশে আমরা নামব, তার পরে বাসে চেপে উঠব পাহাড়ের গায়ে। এর নাম কুমায়ুন পাহাড়। হিমালয় এত বড় যে তার এক এক জায়গায় এক এক নাম। অসংখ্য নাম। কাশ্মীব থেকে আসামের পূর্ব-প্রান্ত পর্যন্ত এই হিমালয় ভারতের উত্তর সীমান্ত রক্ষা করছে। মাঝখানে তিনটি পার্বত্য রাজ্য—নেপাল সিকিম ও ভুটান। নেপাল সার্বভৌম রাজ্য। কিন্তু সিকিম ও ভুটানের সঙ্গে ভারতের চুক্তি অন্য রকম, স্বাধীন হয়েও তারা ভারতের সঙ্গে যুক্ত।

স্বাতি যে হিমালয়ের কথাই ভাবছিল, তা বুঝতে পারলুম তার কথা শুনে। বলল: কোনও বই-এ হিমালয়ের সম্পূর্ণ রূপ দেখতে পাই নে। হিমালয় নীলগিরি পাহাড় নয়, আল্‌প্‌স্ পাহাড়ও নয়। হিমালয়কে বাদ দিয়ে আমরা ভারতের কথা ভাবতে পারি নে। হিমালয়—

বলে স্বাতি থামল। কী বলবে বোধ হয় ভেবে পাচ্ছিল না। তাই তার কথাটা আমিই সম্পূর্ণ করলুম: হিমালয় ভারতের আত্মা।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্বাতির চোখ, বলল: ঠিক বলেছ। হিমালয়ের এই রূপ কি তোমার লেখায় দেখতে পাব না?

বললুম : সে তো সহজ কাজ নয়, সেই দুরূহ কাজের জন্যে অপরিমেয় শক্তির দরকার।

স্বাতি বলল : সচেতন হওয়া দরকার আরও বেশি। আর সেই জন্যেই তোমার কাছে আমার প্রত্যাশা আছে।

আমি বললুম : শক্তি তো আমার নেই!

তৎপর ভাবে স্বাতি বলল : যা আছে তার বেশি দরকার হবে না। কী গড়তে হবে তা তুমি জানো, তিলোত্তমা না হলেও মানুষের আকার হবে। হিমালয় জীবন্ত হয়ে উঠবে তোমার লেখায়।

লজ্জিত ভাবে আমি বললুম : এ তোমার দুরাশা।

দুরাশাও আশা।

বলে স্বাতি গভীর দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

ট্রেন তখন কাঠগোদাম স্টেশনে এসে ঢুকছে।

২

ভেবেছিলুম, এবারের এ যাত্রায় চোখ বুজে চলব, আর মনের পাখা মেলে দেব আকাশের পাখির মতো হাল্কা হাওয়ায়। গত দু তিন বছরে অনেক পাহাড় দেখেছি—দক্ষিণের নীলগিরি পাহাড় থেকে উত্তরের মসুরি ও সিমলা পাহাড়। তার পরে কাঙ্গড়া ও কাশ্মীর উপত্যকা। বাঙলার দার্জিলিঙও দেখেছি, আর সিকিমের গ্যাংটক। সব পাহাড়েরই রূপ এক। পাহাড়ের গা বেয়ে একই রকম ভাবে উপরে উঠতে হয়। কোথাও বরফ দেখতে পাওয়া যায়, কোথাও যায় না। কোথাও বরফ দেখতে হলে অনেক উপরের পাহাড়ে উঠতে হয় পরিশ্রম করে। এবারে কোন পরিশ্রম করতে নয়, এবারে আমরা কয়েকটা দিন বিশ্রাম করতে যাচ্ছি। তাই ভেবেছি, এবারে আমি চোখ বুজেই যাব।

স্বাতি বাসে আমার পাশে জানালার ধারে বসেছিল। বলল : রাগ করেছ নাকি ?

কেন বল তো ?

বলে আমি তার দিকে ফিরে তাকালুম।

স্বাতি বলল : জানালার ধারে বসতে দিই নি বলেই কি চোখ বুজে আছ ?

হেসে বললুম : না।

তবে চোখ বুজে চলেছ কেন ?

কোন পরিশ্রম করব না।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল : চোখ মেলে থাকলে তোমার পরিশ্রম হয় !

হয় বৈকি। পথ কেমন, গাছপালা কী রকম, কোন্ পাহাড়ের মতো দেখতে, আরও কত রকম ভাবনা আসে। চোখ বুজে থাকলে নিশ্চিন্ত।

স্বাতি বলল : বুঝতে পেরেছি। মনে মনে কোনও ফন্দি আঁটছ !

বুঝতে পারলুম যে চোখ বুজে চলা আমার চলবে না। স্বাতির সঙ্গে কথা বলেই চলতে হবে। বললুম : চোখ বুজে তপস্যা করে জানতুম, কিন্তু ফন্দি আঁটবার জন্যে যে চোখ বুজতে হয় তা জানা ছিল না।

কাঠগোদাম স্টেশনে নেমে আমাকে কোন কাজ করতে হয় নি। স্বাতি নিজেই সব দায়িত্ব নিয়েছে। আর তার জন্যে তাকে কোন কষ্ট পেতে হয় নি। ছোট স্টেশন, কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন। বাসের টিকিটের জন্য স্টেশনের বাহিরে গিয়ে ছুটোছুটি করতে হয় নি। প্ল্যাটফর্মের বাহিরে স্টেশনে প্রবেশপথের পাশে বাসের টিকিটের অনেকগুলি কাউণ্টার। নৈনিতাল, রানীখেত ও আলমোড়ার বাস ছাড়ে স্টেশনের সামনে থেকেই। তাদের সময় সূচী আছে। টিকিট কাটতে হয় লাইনে দাঁড়িয়ে। স্বাতি লাইনে দাঁড়িয়ে প্রথম বাসের টিকিটই পেয়ে গিয়েছিল।

আমি দাঁড়িয়েছিলুম পিছনে কুলির সঙ্গে। কাছে এসে বলল : চল।

কুলি আমাদের মালপত্র নিচে নামিয়ে রেখেছিল। আমি সেই মালপত্র তার মাথায় তুলে দেবার জন্যে হেঁট হতেই স্বাতি খপ্ করে আমার দু হাত ধরে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল। বলল : এ সব করতে তোমাকে বারণ করেছি না !

আমি তার ভর্ৎসনা মেনে নিলুম। কিন্তু স্বাতি থামল না, বলল : এই তো সেদিন তোমার কাঁধের হাড় ভেঙেছিল ! এত তাড়াতাড়ি সে কথা ভুলে গেলে চলবে কেন !

বললুম : সেদিন বোলো না। সে দুর্ঘটনার পর ছ মাস কেটে গেছে।

আমাদের কুলি তখন অন্য একজন কুলির সাহায্যে মালপত্র মাথায় তুলে নিয়েছে। এবারে আমাদের একটি স্যুটকেশ, বিছানাও একটি। আর একটি বড় ব্যাগ, তার মধ্যে দুজনেরই জিনিস। টাকাকড়ি স্বাতির ব্যাগে, আমার পকেটেও আছে কিছু। আর কোথায় আছে, তা স্বাতি জানে। আমাকে জানতে দেয় নি।

নিজেদের বাসের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দুর্ঘটনার কথা আমার মনে পড়ল। দার্জিলিঙের পথে আমাদের জীপ অন্য জীপের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁচাতে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়েছিল। অজ্ঞান অবস্থায় দার্জিলিঙের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলুম। খবর পেয়ে স্বাতি ছুটে এসেছিল দিল্লী থেকে। তার পরে দার্জিলিঙ থেকে কলকাতায়।

কলকাতার কলেজে স্বাতি একটা কাজ পেয়েছে। চেষ্টা করছে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে একটা পছন্দ মতো কাজের। সেই ফার্মের কাজ আমাকে ছাড়তে হয়েছে। আসামে আর ফিরে যেতে পারি নি। পাকাপাকি ভাবে আমি একটা কলেজে ঢুকেছি। হাতে প্রচুর সময় থাকলে সাহিত্যে উন্নতি করতে পারব, স্বাতির এই বিশ্বাস। তাকে নিরাশ করবার সাহস আমার নেই। বাসনাও নেই। তার কর্তৃত্ব আমি মেনে নিয়েছি।

স্বাতি আমার কথার উত্তর দেয় নি। বাসের নম্বর মিলিয়ে নিজেদের জিনিস ছাদের উপর তুলে দিয়েছে। আর বড় ব্যাগটা তুলেছে বাসের ভিতরে। নিজে জানালার ধারে বসে আমাকে তার পাশের জায়গাটি দিয়েছে। তার পরে কুলির পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বলেছে: তুমি তো ছেলেমানুষ নও যে ছ মাসেই হাড় ঠিক মতো জুড়ে যাবে। এখনো অনেক দিন তোমাকে সাবধানে থাকতে হবে।

এর পরেই আমি চোখ বুজেছিলুম। কোন্ বাস আগে ছাড়ল আর কোন্ বাস পরে তা দেখতে পাই নি। স্টেশন এলাকা ছেড়ে

কখন এসে হিমালয়ের পাদদেশে পৌঁছেছে তাও লক্ষ্য করি নি। পাহাড়ে ওঠার কথা বুঝেছি বাসের শব্দ শুনে। এই শব্দের সঙ্গে আমি পরিচিত। শব্দ শুনেই বুঝতে পারি যে চড়াই উঠছি, না সমতল পথ পাওয়া গেছে খানিকটা।

জানালার ধারে বসার যেমন সুবিধা আছে, অসুবিধাও আছে তেমনি। পাহাড়ে ওঠবার সময় কখনও এধারে পাহাড়, কখনও ওধারে। কখনও পাহাড়ের কর্কশ দেহ দৃষ্টি অবরুদ্ধ করে, কখনও খাদের অপরূপ দৃশ্য মুগ্ধ করে মন। স্বাতি তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। এ ধারের জানালার পাশে বসে সে পাহাড় দেখছে, খাদ দেখতে হলে আমার দিকেই তাকে ফিরে থাকতে হবে। তাই সে কথা বলছে। আমার কথার উত্তরে বলল: ভেবেছ, ফাঁকি দেবে, কিন্তু তা পারবে না। অনেক কাগজপত্র সঙ্গে এনেছি।

আমি তার কথা শুনে সোজা হয়ে বসলুম।

স্বাতি হেসে বলল: তুমি কি ভেবেছিলে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বসে থাকবে দিনের পর দিন!

না।

তবে ?

তোমার দিকে চেয়ে চেয়েই দিন কাটাব।

লজ্জা করবে না ?

লাজ লজ্জা তো হোমের আগুনে পুড়িয়েছি।

তাই বলে কি বেহায়াপনা করবে ?

ভণ্ডামি করতেও পারব না। মন যা চাইবে, তাই তো করব !

তা জানি।

বলে স্বাতি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। জিজ্ঞাসা করল: কাঠ-গোদাম থেকে রানীখেত কত দূরে জানো ?

বললুম: মনে নেই।

সে কি !

এ দিকে তো এর আগে আসি নি! শোনা কথা বেশি দিন মনে থাকে না।

স্বাতি সহাস্যে বলল : পড়া কথা তো কখনও ভোলো না।

প্রফেসর শর্মার কথা সহসা আমার মনে পড়ে গেল। গত পূজোর আগে কাশী থেকে হরিদ্বার যাবার পথে পরিচয় হয়েছিল একখানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। কুমায়ুন পাহাড়ের কথাও শুনেছিলুম তাঁর কাছেও হিমালয়ের এই অঞ্চলের গিরিশ্রেণী কুমায়ুন নামে পরিচিত। নৈনিতাল রানীখেত আর আলমোড়া হল এই পাহাড়ের জনপ্রিয় শৈলাবাস। এ ছাড়াও আরও অনেক সুন্দর জায়গা আছে। আর একটি বৈশিষ্ট্য হল কতকগুলি স্বাভাবিক জলাশয়। চারি ধারে পাহাড় ঘেরা এই জলাশয়গুলিকে এ দিকে তাল বলে। তালের নামেই জায়গার নাম। নৈনিতাল, ভীমতাল প্রভৃতি নানা নামের গোটা ষাটেক তাল নাকি এই অঞ্চলে আছে।

স্বাতি যে আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছিল, তা বুঝতে পারলুম তার পরের প্রশ্ন শুনে। বলল : পড়া কথাও মনে পড়ছে না?

বললুম : কিছু পড়েছি বলে মনে পড়ছে না।

আশ্চর্য!

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

আর আমি বললুম : পড়ার প্রয়োজন তো ফুরিয়ে গেছে!

কিন্তু আমার উত্তর শুনে স্বাতি হতাশ হল না। যেন এই রকম উত্তরেরই আশা করেছিল। এই ভাবে বলল : সেই জন্যেই আমাকে পড়াশুনো করে আসতে হল। কিন্তু মনে রাখা খুব কঠিন কাজ।

বলে নিজের ব্যাগ থেকে একখানা সরকারী পুস্তিকা বার করল। ভাঁজ-করা কাগজ। তাতে কয়েকখানা ছবি, আর ছোট মানচিত্র একখানি।

দেখ।

বলে স্বাতি মানচিত্রটি আমার দিকে এগিয়ে দিল।

এই অঞ্চলের মানচিত্র। লালকুয়া হল্‌দোয়ানির উপর দিয়ে ট্রেন এসেছে কাঠগোদামে। রেল লাইনের পাশে সড়কও আছে। সেই পথ কুমায়ুন পাহাড়ে উঠেছে। পাহাড়ের পাদদেশে পথের ডান দিকে রানীবাগ। তার পর জেওলিকোট নামে একটি জায়গায় তেওঁ এই পথ দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে। বাঁ হাতের পথ গেছে নৈনিতালে। আর ডান দিকে গেলে ভাওয়ালি। নৈনিতাল থেকেও একটি পথ ভাওয়ালি এসেছে। কাঠগোদামের দিকে খানিকটা এগোবার পরে ভাওয়ালির পথ আলাদা হয়ে গেছে। এ একটি ত্রিভুজ, কিন্তু মাইলের হিসেব এতে নেই, আর পথ উঁচু-নিচু আঁকা-বাঁকা বলে তা অনুমান করাও সম্ভব নয়।

পাতাটা উল্টে দিয়ে স্বাতি বলল: মাইলের হিসেব এই দিকে আছে।

সত্যিই আছে। কাঠগোদাম থেকে নৈনিতাল বাইশ মাইল পথ; আর রানীখেত বাহান্ন মাইল দূরে। নৈনিতাল থেকে ভাওয়ালির দূরত্বও দেখছি সাত মাইল, কিন্তু কাঠগোদাম থেকে ভাওয়ালির দূরত্ব নেই।

হঠাৎ স্বাতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, বলল: এই দিকে দেখ।

ত্বরিতে মুখ তুলে পাহাড়ের দিকে তাকালুম। কিন্তু কী দেখতে হবে বুঝতে পারলুম না।

স্বাতি বলল: নৈনিতালের পথ আমরা বাঁ হাতে ছেড়ে এলাম।

পাহাড়ের অবরোধে সে পথ আমি দেখতে পেলাম না। এখান থেকে নৈনিতাল কত দূরে, আর ভাওয়ালির দূরত্বই বা কত, তার হিসেব এই পুস্তিকায় নেই। তবে হিসেব করে বার করা সম্ভব। নৈনিতাল থেকে রানীখেত সাঁইত্রিশ মাইল, সেই হিসেবে ভাওয়ালি থেকে রানীখেত তিরিশ মাইল দূরে। ভাওয়ালি পৌঁছলে আমাদের

বাইশ মাইল পথ অতিক্রম করা হবে। তার মানে কাঠগোদাম থেকে নৈনিতাল ও ভাওয়ালির দূরত্ব হল সমান।

আবার আমি মানচিত্রটির দিকে তাকালুম। মনে হল, ভাওয়ালি যেন শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা। পাঁচটি পথ এখান থেকে পাঁচ দিকে গেছে। কাঠগোদাম, নৈনিতাল আর রানীখেত—এই তিনটি পথের কথা জানা। আর একটি পথ গেছে নৌকুচিয়াতাল, ভীমতাল এই পথের ধারে। আর সাততালের পায়ে-হাঁটা পথও বেরিয়েছে এই পথের দক্ষিণে। পঞ্চম পথ রামগড়ের দিকে গেছে, রামগড় ছাড়িয়ে মুক্তেশ্বর।

স্বাতি আমাকে নীরবে থাকতে দিতে চায় না। বলল : অমন মনোযোগ দিয়ে কী দেখছ বল তো ?

সংক্ষেপে বললুম : কুমায়ুনের পথ ঘাট।

পথের কথা আমাকেও বল।

বলে সে আমার দিকে তাকাল। আর আমি তাকে ভাওয়ালির পাঁচ মাথা দেখালুম। পাতা উল্টে পথের দূরত্বও দেখে নিলুম। ভাওয়ালি থেকে ভীমতাল সাত মাইল দূরে। এই পথে সোয়া ছ মাইল যাবার পরে সাততালের সাড়ে তিন মাইল পায়ে-হাঁটা পথ। নৌকুচিয়াতাল ভীমতাল ছাড়িয়ে আরও আড়াই মাইল যেতে হয়। পথের শেষ সেইখানেই। অন্য পথে রামগড় ভাওয়ালি থেকে নয় মাইল, আর মুক্তেশ্বর সেখান থেকে ষোল মাইল দূরে। রামগড় থেকে মুক্তেশ্বরের পথে ফলের বাগান, আর মুক্তেশ্বরে ভেটেনারি রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট।

স্বাতি বলল : ভাওয়ালিতে নেমে পড়লে এ সব আমাদের দেখা হয়ে যেত।

হেসে বললুম : হিমালয় দেখা হত না।

স্বাতি এ কথার উত্তর না দিয়ে বলল : আলমোড়া কোন্ দিকে ?

বলে মানচিত্রের পাতাটা আবার খুলল।

সে পথও আমরা দেখতে পেলুম। ভাওয়ালি থেকে রানীখেতের পথ কোশী নদী পেরিয়ে উত্তরে গেছে। আর নদী পেরোবার আগে খৈরনা নামের একটা জায়গা থেকে আলমোড়ার পথ গেছে নদীর ধারে ধারে। রানীখেত থেকেও আলমোড়ার পথ আছে।

কাঠগোদাম থেকে আলমোড়ার দূরত্ব সাতান্ন মাইল, তার মানে ভাওয়ালি থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল। আর রানীখেত থেকে আলমোড়া উনত্রিশ মাইল দূরে।

গোঁ গোঁ করে আমাদের বাস পাহাড়ের পথ অতিক্রম করছে। মনে হচ্ছে ভাওয়ালি পৌঁছতে আর বোধ হয় দেরি নেই।

স্বাতি বলল : রানীখেতে যাবার আরও একটি পথ দেখতে পাচ্ছি।

এ পথ এসেছে রামনগর স্টেশন থেকে জিম কর্বেট ন্যাশনাল পার্কের ভিতর দিয়ে। পথের দূরত্ব দেখলুম উনষাট মাইল। মানচিত্রটি অসম্পূর্ণ বলে এ অঞ্চলের অন্যান্য স্থানের অবস্থান জানতে পারলুম না। সেটি মুড়ে স্বাতির হাতে আমি ফিরিয়ে দিলুম। আর স্বাতি তা নিজের ব্যাগের ভিতর তুলে রাখল।

পাশাপাশি বসে আমরা কথা বলছিলুম খুবই মৃদু স্বরে। বাসের অনেক যাত্রী আমাদের ফিরে ফিরে দেখেছে কিন্তু আমাদের কথা নিশ্চয়ই শুনতে পায় নি। তাদের দিকে আমরা ফিরে দেখি নি, কিন্তু তাদের কথা শুনেছি। বাসের শব্দ ছাপিয়ে উঠেছে অনেকের কণ্ঠস্বর। এই বারে কয়েকজন যাত্রীর মধ্যে খানিকটা তৎপরতা দেখা গেল। মনে হল, বাস থেকে নামবার জন্যে তারা তৈরি হচ্ছে ভাওয়ালি যে এসে গেলুম, তাতে আর সন্দেহ রইল না।

৩

ভাওয়ালির বাস স্ট্যাণ্ডে এসে বাস দাঁড়াতেই জনকয়েক যাত্রী নেমে পড়ল। তাদের স্থানীয় লোক বলেই মনে হল। বাস এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে শুনে আমরাও নেমে পড়লুম। যতটুকু দেখা যায়, ততটুকুই লাভ।

প্রশস্ত রাজপথ, কিন্তু বাজারটি ছোট। ফলের দোকানই বেশি। পূজোর সময় এলে নাকি ভাওয়ালির এই বাজারটি ফলের রাজ্য বলে মনে হবে। রামগড়ে বিস্তীর্ণ ফলের বাগান। সেই ফল আসে ভাওয়ালিতে কুমায়ুন পাহাড়ের চারি ধার থেকে। আর এখান থেকেই সর্বত্র সেই ফল চালান যায়। আপেল, অ্যাপ্রিকট, পীচ, নাসপতি ও প্লাম। আপেলের রস বিক্রি হয় বোতলে ভরে। এ দিকের লোক কোকাকোলার মতো আপেলের রস খায়। দোকানে দাঁড়িয়ে একজনকে খেতে দেখে ব্যাপারটা আমরা জানলুম।

স্বাতি বলল: দেখা যাক না চেখে।

আমি হেসে বললুম: মন্দ কি!

খেতেও মন্দ লাগে না। স্বাতি বলল: আপেল জলে সেদ্ধ করলেই বোধ হয় এই রকম শরবৎ হবে।

তার পরেই বলল: এখানে দেখবার কী আছে, জেনে নাও না জিজ্ঞাসা করে।

জেনে নিলুম। এটি একটি ছোট পাহাড়ী শহর। পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। জলবায়ু খুবই স্বাস্থ্যকর বলে এখানে একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে। তার নাম কিং এডওয়ার্ড দি সেভেন টি. বি. স্যানাটোরিয়াম। ছোটখাটো হোটেল আছে, ডাক বাংলো আর ফরেস্ট রেস্ট হাউস। বাংলো ও কটেজও ভাড়া পাওয়া যায়।

হৈ-হুল্লোড় যারা ভালোবাসে না, তারা এইখানে থেকেই কুমায়ুন পাহাড়ের অনেক সুন্দর জায়গা দেখে বেড়ায়।

সেই সব জায়গার কথাও শুনলুম। ভীমতালের পথে সাততাল। ঝাউ বনের মাঝে সাতটি জলাশয়, তার একটি হল সুখাতাল। আশেপাশে বন্য পশুর সংরক্ষণ ভূমি। ডক্টর স্ট্যান্‌লি জোন্স এখানে একটি আশ্রম স্থাপন করেছেন। গ্রীষ্মের সময় দেশের নানা স্থান থেকে লোক এসে এখানে ক্যাম্পে থাকে। এই সব লেকের জলে নৌকা বিহার করা যায়, মাছ ধরা যায়, আর সাঁতার কেটেও সুখ। যেমন পরিবেশ, তেমনি আবহাওয়া।

কোহ্-ই-নুর নামে আর একটা সুন্দর জায়গা সাততালের পোস্ট অফিস থেকে মাইল তিনেক দূরে। ভাওয়ালি থেকেও ছ-সাত মাইলের মধ্যে।

ভীমতালের নাম তো অনেকেই জানে। নৈনিতালের পরেই ভীমতাল। এই জলাশয়টির মাঝে একটি দ্বীপ আছে। আর তার জন্যে আরও সুন্দর মনে হয়। নৌকো করে সেই দ্বীপে গিয়ে বড় বড় গাছের নিচে চমৎকার পিকনিক করা চলে। জলে মাছও অনেক। মাছ ধরে রাস্তার ধারের হোটেলে দিলে চায়ের সঙ্গে মাছ ভাজা খাওয়া যায়।

স্বাতি বলল : ভারি মজার তো!

থাকবার জায়গাও আছে। পাহাড়ের মাথায় বাংলো আর কটেজ ভাড়া পাওয়া যায়। ডাক বাংলোও আছে। আর খানিকটা এগিয়ে গেলেই নৌকুচিয়াতাল।

এর পরে আর কিছু শোনা সম্ভব হল না। ড্রাইভারকে বাসে উঠতে দেখে আমরাও তাড়াতাড়ি বাসে উঠে বসলুম।

একজন যাত্রী বোধ হয় আমাদের অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিলেন। এইবারে প্রশ্ন করলেন : আপনারা বুঝি এ দিকে প্রথম আসছেন?

উত্তর আমি দিলুম। বললুম: হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বললেন: আপনাদের খোঁজ খবর নেওয়া দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম।

ড্রাইভার গাড়ির হর্ন বাজাচ্ছিল। কণ্ডাক্টর গাড়িতে উঠতেই সে চলতে শুরু করল।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা কি কলকাতা থেকে আসছেন?

আমি তাঁর সন্দেহ সমর্থন করলুম।

খুশী হয়ে তিনি বললেন: বাঙালীরাই এ দিকে বেশি আসেন।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। উত্তরপ্রদেশের লোকেরা মসুরি বেশি পছন্দ করে।

কেন?

শুকনো আবহাওয়ার জন্যে। তা না হলে মসুরির আর কী আছে বলুন! শুধু সাড়ে তিন শো হোটেল তো!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: সাড়ে তিন শো হোটেল!

ভদ্রলোক বললেন: অনেক দিন আগে তাই ছিল। এখন বেড়েছে, কি কমেছে, তা জানি নে।

স্বাতি আমার দিকে তাকাল একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে। তার মানে বুঝতে আমার অসুবিধা হল না। ঐ দৃষ্টি দিয়েই সে আমাকে বুঝিয়ে দিল যে এই ভদ্রলোকের কাছে অনেক কিছু জানা যাবে। আমি তাই এই সুযোগ নেবার জন্যে বললুম: এ দিকে রামগড় আর মুক্তেশ্বর নামে দুটো সুন্দর জায়গা আছে শুনেছি।

ভদ্রলোকের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন: বুঝেছি।

কিন্তু কী বুঝেছেন তা বললেন না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরে আমি প্রশ্ন করলুম: কী বুঝেছেন বলুন তো?

এবারে তিনি একটু বিরূপ ভাবে বললেন: আপনাদের রবীন্দ্রনাথ এসে কিছুকাল ছিলেন কিনা, তাই এই রকম ভেবেছেন।

আমি তাঁর কথা শুনে লজ্জিত হলুম। কিছু আশ্চর্যও হলুম। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বলে কি সে জায়গাকে ভাল বলা যায় না! কোথায় শুনেছি বা পড়েছি মনে পড়ছে না, রামগড়ের একটা ফলের বাগান প্রায় আট হাজার ফুট উঁচুতে। সেখান থেকে রানীখেতের চৌবাতিয়া বাগান, মুক্তেশ্বর ও বিন্‌সার নামের আর একটি পাহাড়ী শহরও দেখা যায়। দূরের বরফ-ঢাকা পাহাড়ের দৃশ্যও নাকি মনোরম। মুক্তেশ্বরও খুব উঁচুতে। আট হাজার ফুট উঁচুতে একটা মন্দির আছে, শহর শ তিনেক ফুট নিচে। আর চারি দিকের দৃশ্য অপরূপ। কিন্তু আমি ভদ্রলোকের কথার কোন উত্তর দিলুম না।

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক বললেন: গান্ধীজীও যে এই পাহাড়ের নানা জায়গায় বসবাস করেছেন, সে খবর আপনারা রাখেন কি?

ভদ্রলোকের ক্ষোভেব কারণ এইবারে বুঝতে পারি। তাই তৎপর ভাবে বললুম: রাখি বৈকি। কৌসানির ডাক বাংলোয় বসে তো তিনি গীতার ভাষ্য লিখেছিলেন।

ভদ্রলোক কিছু প্রসন্ন হলেন, বললেন: কুমায়ুনকে তিনি বলেছিলেন 'দি সুইজারল্যাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া।' বলেছিলেন, I wonder whether the scenery of these hills and the climate are to be surpassed or equalled by any of the beauty spots of the world. After having been nearly three weeks in Kumaon Hills, I am more than ever amazed why our people need go to Europe in search of health.

এক নিঃশ্বাসে ভদ্রলোক এই কথা বলে গেলেন। মনে হল, অনেককে তিনি এই কথা শুনিয়েছেন। শোনাতে শোনাতেই মুখস্থ হয়ে গেছে গান্ধীজীর এই কুমায়ুন প্রশস্তি। আর আমি তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নেবার জন্যে বললুম: সত্যিই এ অঞ্চল এত ভাল?

ভদ্রলোক গম্ভীর ভাবে বললেনঃ তা বুঝতে হলে আপনাকেও গান্ধীজীর মতো তিন সপ্তাহ থাকতে হবে।

কৌসানিতে ?

শুধু কৌসানি নয়, আরও অনেক জায়গা আপনাকে ঘুরে দেখতে হবে।

বললুমঃ একটু বুঝিয়ে বলুন না !

ভদ্রলোক বললেনঃ কুমায়ুন পাহাড়ে আসবার পথগুলি সব জানেন তো !

বললুমঃ রামনগর আর কাঠগোদামের পথ জানি।

আরও অনেক পথ আছে।

অনেক পথ !

হ্যাঁ। সব চেয়ে পূবে নেপাল ও উত্তরপ্রদেশের সীমান্তে হল টনকপুর রেল স্টেশন। সেখান থেকে আপনি পিথোরাগড়ের বাস পাবেন। পিথোরাগড় হল নতুন উত্তরাখণ্ড ডিভিসনের একটি জেলা। প্রধান শহর পিথোরাগড় টনকপুর থেকে পঁচানব্বুই মাইল উত্তরে, আর আলমোড়া থেকে চুয়াত্তর মাইল পূর্বে। আগে যখন বাস চলত না, তখন হাঁটাপথে দূরত্ব একুশ মাইল কম হত। কৈলাস-যাত্রীরা তখন এই পথেই যেত কৈলাসে লিপুলেক পাসের উপর দিয়ে।

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেনঃ এ পথে এলে আরও একটি জায়গা দেখে আনন্দ পেতেন। সে হল চম্পাবত। কুমায়ুনের চাঁদ রাজাদের পুরনো রাজধানী। টনকপুর থেকে সাতচল্লিশ মাইল উত্তরে। কয়েকটি সুন্দর মন্দির দেখতেন সেখানে।

আরও একটি জায়গার কথা আমার মনে পড়ল। রামকৃষ্ণ মিশনের মায়াবতী আশ্রম এই পথের ধারেই বলে শুনেছি। কিন্তু সে কথা ভদ্রলোককে বলবার সাহস পেলুম না। ভদ্রলোক নিজেও এ সম্বন্ধে কিছু বললেন না।

একটু থেমে বললেন : পশ্চিমের দিকে কোটদ্বার বলে একটি রেল স্টেশন আছে। সেখান থেকেও পৌড়ি শ্রীনগর কর্ণপ্রয়াগ হয়ে রানীখেতে আসা যায়। এই শ্রীনগর কাশ্মীরের শ্রীনগর নয়, গাড়োয়াল জেলার শ্রীনগর। ল্যান্সডাউন শহর হল এই পথের ধারে।

তার পর ?

তার পর হরিদ্বার-ঋষিকেশ। দেরাদুন থেকেও ঋষিকেশে আসা যায় মোটর পথে। আর বাসে চেপে শ্রীনগর হয়ে কর্ণ-প্রয়াগ। সেখান থেকে দ্বারাহাটের পথে রানীখেত।

ভেবেছিলুম যে কুমায়ুনের পথ বুঝি ফুরিয়ে গেল। কিন্তু ভদ্রলোক বললেন : আরও একটা পথ আছে। সে পথ মসুরি থেকে বড়কোট। বড়কোট হল যমুনোত্রীর পথে। সেখান থেকে আপনাকে ধরাসুর উপর দিয়ে টেহরি আসতে হবে। টেহরি থেকে সেই শ্রীনগরের পথ।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন : কুমায়ুন ডিভিসনের জেলাগুলি জানেন তো ?

বললুম : না।

আগে চারটি জেলা ছিল—টেহরি-গাড়োয়াল, গাড়োয়াল, আলমোড়া আর নৈনিতাল। সম্প্রতি উত্তরাখণ্ড ডিভিসন হয়েছে এই সব জেলার উত্তরাংশ নিয়ে—উত্তরকাশী, চামোলি ও পিথোরাগড় জেলা। বড় বড় তীর্থস্থানগুলি সব এই অঞ্চলে—যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ। এদের পশ্চিমে হল দেরাদুন জেলা—মসুরি ও চক্রাতা এই জেলায়।

স্বাতি এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। এইবারে বলল : রানীখেত থেকে কেদার-বদরী তাহলে খুব দূরে নয় !

আমি বললুম : মসুরি থেকেও যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী খুব কাছে মনে হচ্ছে !

ভদ্রলোক বললেন : সবই কাছাকাছি, অন্তত পুণ্যার্থীদের কাছে। সুযোগ পেলে তাঁরা চার ধাম এক যাত্রাতেই দেখেন।

পাহাড়ের উপরে উঠতে উঠতে এক সময় আমরা নিচে নামতে শুরু করেছিলুম। স্বাতি বেশ আশ্চর্য হচ্ছিল তাই দেখে। ভদ্রলোক তা লক্ষ্য করে বললেন : আমরা এখন কোশী নদীর ধারে নামছি। খৈরনায় নদী পেরিয়ে আবার আমরা উপরে উঠব।

আমরা যে কোশী নদী জানি, এ সেই কোশী নয়। এ কোনও পাহাড়ী নদী। নিচে নেমে কোনও বড় নদীর সঙ্গে মিলেছে।

ভদ্রলোক বললেন : রানীখেত যাচ্ছেন তো! একবার নৈনিতাল ও আলমোড়াও ঘুরে আসবেন। আর তার পরে কৌসানি। আলমোড়া থেকে আটচল্লিশ মাইল পথ। সম্ভব হলে আরও এগিয়ে বাগেশ্বরও ঘুরে আসবেন। আর সব চেয়ে সুন্দর হল পিণ্ডারি গ্লেসিয়ার। বারো থেকে চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে দু মাইল লম্বা এই হিমবাহ তিন চার শো গজ প্রশস্ত। নন্দাদেবী ও নন্দকোট গিরিশৃঙ্গের পাদদেশে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : রানীখেত থেকে কত দূরে?

ভদ্রলোক ভাবলেন একটুখানি, তার পরে বললেন : রানীখেত থেকে একশো কুড়ি মাইল দূরে। কিন্তু বেশি হাঁটতে হয় না। কাপকোট নামে একটা জায়গা থেকে ছত্রিশ মাইল হেঁটে উঠতে হয়। এইটিই সেখানে যাবার সময়।

স্বাতির দু চোখ যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আমি তা স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

বাস এবারে নদীর ধারেই নেমে এল। এখানে নাকি অনেকক্ষণ দাঁড়াবে। বেলা হয়েছে, খাবার সময় হয়েছে অনেকের। তাই যাত্রীদের অনেকেই এখানে খেয়ে নেবে।

জিজ্ঞাসা করলুম : রানীখেত এখান থেকে কত দূরে?

তা মাইল পনর হবে।

বলে ভদ্রলোক নেমে গেলেন।

স্বাতি ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল : চল আমরাও খেয়ে নিই।

এইখানে!

কেন, আপত্তি আছে?

বললুম : পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোটেল তো দেখছি না!

গাড়ি থেকে নেমে দেখলুম যে খাবার জিনিসপত্র অপরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া রানীখেতে পৌছবার আগেই হয়তো খাবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। তাই কোন দ্বিধা না করে আমরাও খেয়ে নিলুম।

বাহিরে বেরিয়ে দেখলুম কোশী নদী ও তার পুল। এ ধারের পথ চলে গেছে আলমোড়ার দিকে নদীর ধারে ধারে, আর নদীর পুল পেরিয়ে আমরা রানীখেতের দিকে যাব। নীল পাহাড় এখানে অরণ্যে আকীর্ণ। যে পাহাড় আমরা দেখতে যাচ্ছি, সে পাহাড় এখান থেকে দেখা যায় না। রানীখেতে পৌছে আমরা সেই বরফের পাহাড় দেখব—দিগন্ত জোড়া তুষার শৃঙ্গ। সেই হল সত্যিকার হিমালয়।

স্বাতির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। তার দৃষ্টিতে এক রকম আচ্ছন্নতা দেখছি। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম : কী ভাবছ বল তো?

ভাবছি—

হ্যাঁ, তোমার ভাবনার কথাই আমি জানতে চাইছি।

অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে স্বাতি বলল : সেই বরফের পাহাড় আর মন্দিরের স্বপ্ন আমি কেন দেখলাম বল তো!

তুমি কি কেদারনাথে যাবার কথা ভাবছ?

সহসা স্বাতি যেন জেগে উঠল, বলল : পাগল হয়েছ!

বলে বাসে উঠবার জন্যে এগিয়ে চলল।

৪

রানীখেতের বাস স্ট্যাণ্ডে এসে যখন নামলুম, তখন শিপশিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। অনেকক্ষণ থেকেই স্বাতির দুর্ভাবনা হচ্ছিল। থাকবার জায়গা নিয়ে দুর্ভাবনা। কিন্তু আমার এ দুর্ভাবনা ছিল না। পাহাড়ী শহরে হোটেলের কোন অভাব নেই। আর একটা না একটা হোটেলে জায়গা পাওয়া যাবেই। তাই আমি তাকে আগে থেকে ব্যবস্থা করতে বারণ করেছিলুম। বলেছিলুম, পথের ভাবনা পথেই আমরা ভাবব। তাতেই আনন্দ বেশি।

কিন্তু পথে নেমে আমরা ভাববার সুযোগ পেলুম না। এক দল লোক আমাদের ছেঁকে ধরল। তাদের কারও হাতে হোটেলের কার্ড, কেউ হাত দিয়েই তাদের হোটেল দেখিয়ে দিচ্ছে। সাইন-বোর্ডে তাদের হোটেলের নাম দেখতে পাচ্ছি। খুব কাছে। পথের ওপারেই বলা যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নতুন রঙে ঝকঝক করছে, আর বারান্দায় টাঙানো আছে জিরেনিয়ামের বাস্কেট। লাল আর গোলাপি ফুলের থোকা ঝুলে আছে নিচের দিকে।

আমি একখানা বড় ঘরের ভাড়া জিজ্ঞাসা করলুম, আর আশ্চর্য হলুম ভাড়ার অঙ্ক শুনে। আশাতীত কম। ঘরের সঙ্গে স্যানিটারি বাথরুমও আছে। কিন্তু স্বাতি খুশী না হয়ে বলল ঃ বারান্দা থেকে বরফের পাহাড় দেখা যায় ?

হোটেলের গাইড তৎপর ভাবে উত্তর দিল ঃ আকাশে মেঘ না থাকলে এখনই দেখিয়ে দিতাম। কাল ভোর বেলায় নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন।

স্বাতি বলল ঃ তাহলে আর জলে ভিজে কাজ নেই। চল, ঐ হোটেলেই যাই।

বলে গাইডকেই মালপত্র নামাতে বলল।

আমরা ভিতরের জিনিস নামিয়ে নিয়েছিলুম, কুলি নামাল উপরের জিনিস। একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে আমরা হোটেলের সামনে পৌঁছে গেলুম।

নিচে দোকান, আর উপরে হোটেল। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখলুম যে সামনে প্রশস্ত বারান্দা। প্রত্যেক ঘরের সামনে একখানি করে চৌকো টেবিল আর দুখানা চেয়ার রেলিঙের ধারে সাজানো আছে। ঘরের চাবি আনবার জন্যে গাইড যখন ম্যানেজারের ঘরে ঢুকল, আমি তখন পরম বিস্ময়ে এক দম্পতিকে লক্ষ্য করলুম। টেবিলের দু ধারে তারা মুখোমুখি বসেছে। গায়ে ওভারকোট, মাথায় উলের টুপি আর চোখে কালো চশমা। দুজনেরই বেশ কতকটা এক রকম। দুপুর বেলায় এই রকম পোশাক দেখে হঠাৎ আমার শীতবোধ হল। আর নিজের দিকে তাকিয়ে আমি আরও আশ্চর্য হলুম। আমার গায়ে একটি সার্ট; ব্যাগের ভিতরে যে স্লিপওভার ছিল, তা বার করে গায়ে দিতেও ভুলে গেছি। স্বাতিও ভুলে গেছে তার চাদর গায়ে দিতে।

কিন্তু বেশিক্ষণ আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হল না। ঘরের চাবি নিয়ে গাইড ফিরে এল হন্তদন্ত হয়ে। তার পিছনে ম্যানেজার। ঘরের তালা খুলে আমাদের ডাকল।

সেই দম্পতির পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলুম যে তারা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে একখানা মানচিত্র দেখছিল। সেটা টেবিলের উপর বিছানো ছিল। এখন দুজনেই তাদের কালো চশমা খুলে আমাদের দিকে তাকাল এমন দৃষ্টিতে যে মনে হল তারা অলৌকিক কিছু দেখতে পেয়েছে।

তাদের খুব কাছেই আমরা ঘর পেলুম এবং দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকবার সময় একটা মন্তব্য আমাদের কানে এল : পাগল নাকি!

বাঙলা মন্তব্য। কিন্তু আমি একা শুনলুম এই কথা। স্বাতি আমার আগেই ঘরে ঢুকে পড়েছিল। ঘর ও বাথরূম দেখে পছন্দ

হয়েছে তার। আসবাবপত্র চলনসই। খাটের উপরে বিছানাও আছে। বলল : বেশ থাকা যাবে।

তার পরেই তার ব্যাগ খুলে আমার স্লিপওভারটা বার করে দিয়ে বলল : খুব ভুল হয়ে গেছে।

দরকার হলেই মনে পড়ত।

বলে স্বাতির গায়ের চাদরটাও বার করে তার গায়ে জড়িয়ে দিলুম।

আমাদের গাইড বোধ হয় কুলিকে ডেকে আনবার জন্যে বেরিয়ে গিয়েছিল। স্বাতি একখানা তোয়ালে বার করে বলল : ওদের শীতবোধ একটু বেশি।

স্বাতি কাদের কথা বলছে তা বুঝতে পেরেছিলুম। বললুম : বাঙালী।

সত্যি!

বলে সে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল।

বললুম : আমাদের পাগল ভেবেছে।

কেন ?

এই শীতের দেশে—

বুঝেছি।

বলে স্বাতি সহাস্যে এগিয়ে এসে আমার মাথাটা মুছিয়ে দিল। তার পরে তার ভ্যানিটি ব্যাগের ছোট চিরুনি দিয়ে চুলও আঁচড়ে দিল।

আমি বললুম : নিজের মাথাও মুছে নাও।

মাথায় যে আমি আঁচল তুলে দিয়েছিলাম তা দেখতে পাও নি ?

ঠিক এই সময়েই কুলিকে নিয়ে গাইড এসে ঘরে ঢুকল। গুছিয়ে রাখল জিনিসপত্র। কুলিকে কত দিতে হবে জেনে নিয়ে পয়সা মিটিয়ে দিল স্বাতি। তার পরে, ঘড়ি দেখে বলল : একটু চা পাওয়া যাবে ?

চায়ের সময় হয় নি। কিন্তু 'না' বলা বোধ হয় এদের রীতি নয়। তাই বলল: আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি।

বলে চক্ষের নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

স্বাতি বলল: এসো, বাইরের বারান্দাতেই বসি।

বললুম: দুখানা কম্বল বার করে নিলে ভাল হত।

কেন বল তো?

বলে স্বাতি পরম বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: আমাদের সঙ্গে তো ওভারকোট নেই—

খিলখিল করে হেসে উঠল স্বাতি। তার পরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমিও তাকে অনুসরণ করে বাইরে এলুম।

ঘরের সামনেই একখানা ছোট চৌকো টেবিল, আর মুখোমুখি দুখানা চেয়ার। কোন দিকে না চেয়ে আমরা সেই চেয়ারে গিয়ে বসলুম।

এখন আর বৃষ্টি পড়ছে না, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পাহাড়ের মেঘ আকাশের চেয়ে মাটিকে বেশি ভালবাসে। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বারান্দায় আসে, গাছপালার সঙ্গে খেলা করে। আর বরফের পাহাড়কে আবৃত করে রাখে। কিন্তু মাথার উপরের আকাশ পরিষ্কার দেখি, রূপালি রোদ ঝিকমিক করে ওঠে। আবার এক সময় মেঘ এসে ঢেকে ফেলে সেই রোদ।

আমাদের গাইড ফিরে এসে বলল: আপনাদের চা আসছে।

তার পরেই বলল: অসময় বলে একটু দেরি হচ্ছে। তা না হলে—

বললুম: বুঝেছি।

গাইড বলল: রাতে যা খাবেন, ওকে বলে দেবেন। আপনাদের পছন্দ মতো খাবার—

কথার মাঝখানেই স্বাতি বলল : এই বারান্দায় বসেই বরফের পাহাড় দেখা যায় ?

বেশ গর্বিত ভাবে গাইড উত্তর দিল : ভোর বেলায় দেখবেন, সামনের দিগন্তে বরফের পাহাড় ছাড়া আর কিছু নেই।

কোনও নাম-করা গিরিশৃঙ্গ দেখা যাবে ?

একটা-দুটো !

তবে ?

পাঁচটা।

বলে হাত দিয়ে বাঁ দিকের আকাশ দেখিয়ে বলল : এইখানে নন্দাঘুন্টি, তার পরে ত্রিশূল আর ত্রিশূল ঈস্ট। নন্দাদেবী ত্রিশূল ঈস্টের ঠিক ডান পাশে, আর এই দিকে নন্দকোট।

বলে ডান দিকের আকাশ দেখিয়ে দিল। আর সেই সঙ্গেই বলল : ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবেন, নন্দকোটের বাঁ পাশে পিণ্ডারি গ্লেসিয়ারও দেখা যাবে। বায়নোকুলার এনেছেন তো ?

স্বাতি বলল : না।

তবে এক কাজ করুন।

বলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর পরক্ষণেই ম্যানেজারের ঘর থেকে একখানা ফটোগ্রাফ হাতে করে বেরিয়ে এল। কাছে এসে বলল : এই দেখুন ; এই বারান্দা থেকে তোলা ছবি।

ছবিখানা গাইড স্বাতির হাতে দিয়েছিল। স্বাতি তা আমার হাতে দিল। দেখলুম, লোকটা ঠিকই বলেছে। সমস্ত দিগন্তব্যাপী তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী রূপোর মতো ঝকমক করছে। দার্জিলিঙের কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। সে রকমের রূপ আর কোথাও দেখি নি। কিন্তু সে বরফের শেষ দেখতে পাওয়া যায়। আকাশের খানিকটা জায়গা জুড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা, তার বাঁ পাশে জালু, ছোট বড় কাব্রু। ডোম ও টালুং ; আর ডান দিকে পন্দিম, জুবালু,

স্বয়ম্ভু, নরসিংহ ও সিনিয়লচুম। কিন্তু এই বরফ পাহাড়ের শেষ নেই। সমস্ত পাহাড়টাই বুঝি বরফে ঢাকা।

স্বাতি বলল : এই পাহাড়ের একটা ছবি তুলতে পারব না!

বললুম : নিশ্চয়ই পারবে।

না। যত সহজ ভাবছ, তত সহজ এ কাজ নয়। বরফের পাহাড় মেঘের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। মনে হয়, দিগন্তে মেঘ করে আছে।

গাইড আমাদের কথা বুঝতে পারে নি। বলল : ইচ্ছা করলে এ ছবিখানা আপনারা রাখতে পারেন। ম্যানেজার আপনাদের বিলের সঙ্গে দাম নিয়ে নেবে।

আমি বললুম : সেই ভাল।

উৎসাহ পেয়ে বলল : আমি একখানা গাইড বইও আপনাদের কিনে দিতে পারি। তাতে এই সব পিকের নাম ও উচ্চতাও লেখা আছে। আর এই অঞ্চলে যত দেখবার জায়গা আছে, তার বর্ণনা।

স্বাতি তার ব্যাগ খুলে বলল : দাম কত ?

এক টাকা।

স্বাতি তখনই তার হাতে একটি টাকা দিয়ে দিল। আর চায়ের ট্রে নিয়ে বেয়ারাকে আসতে দেখে গাইড বলল : দেখছেন তো, এই হোটেলে আপনি যখন যা চাইবেন—

স্বাতি হেসে বলল : সেই জন্যেই তো এসেছি।

বইখানা আপনাদের এখুনি এনে দিচ্ছি।

বলে গাইড তৎপর ভাবে নিচে নেমে গেল।

চা খেতে খেতে স্বাতি বলল : ওদের টেবলের ওপরে কী একটা বিছানো ছিল দেখেছিলাম।

বুঝতে পারলুম যে তার সামনে উপবিষ্ট সেই দম্পতির কথা স্বাতি জিজ্ঞাসা করছে। মাঝখানে একটা টেবল ফাঁকা, তাই নিশ্চিন্ত মনে তাদের সম্বন্ধে মৃদু স্বরে আলোচনা করা চলে। বললুম : একখানা ম্যাপ।

ম্যাপ !

হ্যাঁ, ভারতবর্ষের রোড ম্যাপ একখানা, গুটিয়ে ছোট করা ছিল। তা না হলে ঐ ছোট টেবলে ওটা বিছানো যেত না।

স্বাতি বলল : আমার মনে হয়, ওরা কোনও দুর্গম পাহাড়ে হেঁটে উঠবে।

বললুম : আমার মনে হয়, ওরা কোথাও যাবে না, এইখানে বসেই হিমালয় দেখবে।

কেন ?

হিমালয় দেখতে বেরিয়ে মানুষ এমন জড়ভরত হয় না।

স্বাতি বলল : নিশ্চয়ই খুব আরাম পাচ্ছে।

তার পরেই বলে উঠল : অনেক কিছু টুকছে দেখছি। নিশ্চয়ই কোথাও যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

বললুম : তা হলে বোধ হয় পিণ্ডারি গ্লেসিয়ার দেখতে যাবে।

সত্যি !

স্বাতির চোখে মুখে এক রকমের অদ্ভুত আনন্দ আমি দেখতে পেলুম। তাই বললুম : জিজ্ঞেস করব ?

না না। গায়ে পড়ে কথা বলা ভাল নয়।

কিন্তু একজনকে তো এগিয়ে যেতেই হবে !

সে সুযোগ মতো।

বললুম : বেশ, তাহলে গাইডকেই জিজ্ঞেস করব, সে নিশ্চয়ই জানে।

সেই ভাল।

তার পরে আমরা নিজেরা কী করব, সেই কথা সে জানতে চাইল।

আমি গুণগুণ করে গাইবার চেষ্টা করলুম : শুধু প্রেম, আরও আরও আরও প্রেম—

অসভ্য।

বলে স্বাতি আমাকে থামিয়ে দিল।

আর আমি গম্ভীর ভাবে বললুম : অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে তো আসি নি। গান গাইব, আর গান শুনব। আর কোনও পরিশ্রম করব না।

বেড়াবেও না ?

অনেক বেড়িয়েছি। এবারে—

কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারলুম না। একখানা গাইড বই হাতে করে আমাদের গাইড ফিরে এসেছিল। একখানা পাতা খুলে বলল : এই দেখুন।

হিমালয়ের ছবি। উপরে তুষার শৃঙ্গগুলির নাম আর উচ্চতা লেখা। নন্দাঘুন্টি ২১২৮৬ ফুট, ত্রিশূল ২৩৪০৬, ত্রিশূল ঈস্ট ২১৮৫৮, নন্দাদেবী ২৫৬৬০ ও নন্দকোট ২২৫৩০ ফুট। এরা ঠিক পাশাপাশি নয়, দূরে দূরে। কিন্তু কত দূরে তা এত দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। আরও ছোট বড় কত শৃঙ্গ আছে, এই ছবিতে তার হিসাব নেই।

আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখছি দেখে গাইড বলল : এই জন্যেই রানীখেতের এমন আদর। ঘরে বসে এই সব পাহাড় দেখতেই এখানে সবাই আসে।

আমি বললুম : ওঁরা কি পাহাড় দেখতে এসেছেন নাকি ?

না। ওঁরা এখান থেকে কেদারনাথে যাবেন।

কেদারনাথ !

স্বাতি বুঝি চমকে উঠল।

গাইড বলল : শোনা যাচ্ছে, এ বছর রানীখেত থেকে বদ্রীনাথের বাস ছাড়বে। ভোর বেলায় বেরোলে সন্ধ্যে বেলাতেই বদ্রীনাথ পৌঁছনো যাবে। যোশীমঠ তো নিশ্চয়ই পৌঁছবে, আর পরদিন সকালে বদ্রীনাথ।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : সত্যি !

সত্যি বই কি। টুরিস্ট অফিস বলছে, আর কয়েকদিন পরেই বাস চলবে। ওঁরা পাকা খবরের অপেক্ষা করছেন।

স্বাতি আমার দিকে তাকাল বিহ্বল দৃষ্টিতে। তার মন বুঝি এতক্ষণে তার স্বপ্নের কেদারনাথে পেঁাছে গেছে। আমি আর কোন কথা বললুম না।

৫

মেঘ কেটে গেল। আরও পরিষ্কার হল আকাশ। কিন্তু দূরের পাহাড়ের গায়ে সেই কালো মেঘ যেন আরও ঘন হয়ে লেগে রইল।

স্বাতি বলল: হিমালয়ের নামে শিবের কথা আমার কেন মনে আসে?

বললুম: কৈলাসে হল শিবের বাস। কৈলাস তো হিমালয়েরই অংশ।

আর কোন দেবতা কি হিমালয়ে বাস করেন না?

কুবেরকেও শিব কৈলাসের নিকটে স্থান দিয়েছিলেন।

স্বাতি বলল: অন্য দেবতারা কোথায় থাকতেন?

বললুম: মঙ্গোলিয়ায়।

সে কি!

বলে স্বাতি কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

বললুম: এ আমার নিজের কথা নয়। কিন্তু এ কার কথা আর কোথায় পড়েছি, তা বলতে পারব না।

কিন্তু যা বলবে, যুক্তি দিয়ে বল।

দেবরাজ ইন্দ্রের রাজধানী হল অমরাবতী, স্বর্গেরই এ আর এক নাম। পুরাণে এই অমরাবতীর অবস্থান হল সুমেরু পর্বতে। অথচ এই সুমেরু পর্বত উত্তরমেরু নয়। এর অন্য নাম সুবর্ণগিরি। সূর্য অস্তাচলে যাবার আগে এই সুবর্ণগিরি পাহাড়ে বিশ্বদেব ও মরুদ্‌গণের কাছে উপাসনা গ্রহণ করতেন। অনুমান করা হয় যে তিব্বতের উত্তরে ও চীন দেশের পশ্চিমে যে পর্বতশ্রেণী, তারই নাম ছিল সুমেরু। দেবতারা এই পাহাড়ে বাস করতেন।

এর কোন প্রমাণ আছে?

বললুম: আছে।

আছে!

স্বাতি আরও আশ্চর্য হল।

বললুম: পুরাণ ও মহাভারত ভাল করে পড়লেই এ কথা বিশ্বাস করা সহজ হবে।

স্বাতি বলল: তা যখন পড়ি নি, তখন তুমিই তোমার বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলো।

এরই উত্তরে স্বাতিকে আমি মহাভারতের বনপর্বের কথা বললুম। বনবাসী যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, ব্যাসদেবের কাছে আমি একটি মন্ত্র লাভ করেছি, সেই মন্ত্র শিখে তুমি উত্তর দিকে গিয়ে কঠোর তপস্যা কর। ইন্দ্রের কাছে সমস্ত দিব্যাস্ত্র আছে, তাঁর শরণাপন্ন হয়ে তুমি সেই অস্ত্র লাভ কর। আর দ্রৌপদী বললেন, পার্থ, আমাদের সুখ দুঃখ জীবন মরণ রাজ্য ঐশ্বর্য সবই তোমার ওপর নির্ভর করছে।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: উত্তর দিকে যাবার জন্যে মন্ত্র শিখবার দরকার কী?

হেসে বললুম: মন্ত্র হল মন্ত্রণা। হিমালয় অতিক্রম করবার বুদ্ধি। বেদব্যাস বদরিকাশ্রমের নিকট বাস করতেন। কী ভাবে হিমালয়ে বাস করতে হয় আর কী ভাবে অতিক্রম করতে হয় হিমালয়, সেই মন্ত্র তিনি জানতেন। আর তা শিখে নিয়ে অর্জুন হিমালয় ও গন্ধমাদন পার হয়ে ইন্দ্রকীল পর্বতে উপস্থিত হলেন।

সে আবার কোথায়?

বললুম: হিমালয়ের পরপারে কৈলাসের পথ আছে গুরেলা মান্ধাতা পাহাড়। গুরেলা মান্ধাতাকেই সেকালে গন্ধমাদন বলত কিনা জানি না।

আর ইন্দ্রকীল?

চেষ্টা করলে সে রকম নামেরও কোন পাহাড় খুঁজে বার করা সম্ভব। সেও নিশ্চয়ই কৈলাসের কাছে। তার কারণ এইখানে

এক গভীর বনে কিরাতবেশী শিবের সঙ্গে অর্জুনের সাক্ষাৎ হয়েছিল। প্রথমে অর্জুন এখানে এক গাছের তলায় পিঙ্গলবর্ণ কৃশকায় জটাধারী এক তপস্বী রূপে ইন্দ্রকে দেখেছিলেন। ইন্দ্র বলেছিলেন, শিবের দর্শন পাবার পর তোমাকে দিব্যাস্ত্র দেব। কঠোর তপস্যা করে অর্জুন শিবের দর্শন পেয়েছিলেন। শিব তাঁকে পাশুপত অস্ত্র দিয়ে তার প্রয়োগ ও প্রত্যাহারের বিধি শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

তার পর ইন্দ্রের রথ এসেছিল আকাশ আলোকিত ও মেঘ বিদীর্ণ করে গম্ভীর নাদে। মাতলি সেই রথের সারথি। বায়ুগতি দশ সহস্র অশ্ব সেই মায়াময় দিব্যরথ বহন করে।

এ কি এরোপ্লেন ?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : এরোপ্লেন না হেলিকপ্টার, তা বলতে পারব না। কিন্তু তার ইঞ্জিনের দশ হাজার হর্স্ পাওয়ার। ভয় পেয়ে অর্জুন মাতলিকে বলেছিলেন, তুমি আগে ওঠ, তার পরে আমি উঠব। অর্জুন গঙ্গায় স্নান করে মন্ত্র জপ করে রথে উঠেছিলেন।

স্বাতি বলল : গঙ্গা সেখানে কোথায় ?

বললুম : পাহাড়ের নদী বা ঝর্ণাকেই বোধ হয় সেকালে গঙ্গা বলত। কিংবা এ কালের কোন পণ্ডিত এই সব শ্লোক জুড়ে দিয়ে থাকবেন।

তার পর বল।

বললুম : সেই আশ্চর্য রথ আকাশে উঠে মানুষের অদৃশ্যলোকে এল। যেখানে চন্দ্র সূর্য বা অগ্নির আলোক নেই, তারকা দেখা গেল অনেক বড় আকারের ; কিন্তু তবু তারা দূরত্বের জন্যে দীপের মতো ক্ষুদ্র। এই রথ এসে নেমেছিল অমরাবতীতে।

এর পরে কী বলব ভাবছিলুম। স্বাতি বলল : থামলে কেন ?

বললুম : এর পরে বনপর্বের আরেক জায়গায় পাণ্ডবদের হিমালয় ভ্রমণের কথা আছে। তারা সপ্তধারা গঙ্গার নিকট উপস্থিত হলে

লোমশ মুনি বললেন, এবারে আমরা মণিভদ্র ও যক্ষরাজ কুবেরের স্থান কৈলাসে যাব। সেই দুর্গম প্রদেশ গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ ও রাক্ষসরা রক্ষা করছে। সবাইকে সতর্ক হয়ে চলতে হবে। এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, তুমি দ্রৌপদী ও অন্য সবাইকে নিয়ে এই গঙ্গাদ্বারে থাকো, আমি নকুলকে নিয়ে লোমশ মুনির সঙ্গে সংযত হয়ে ও লঘু আহার করে এই দুর্গম পথে যাত্রা করি। ভীম বললেন, অর্জুনকে দেখবার জন্যে দ্রৌপদী ও আমরা সবাই উৎসুক হয়ে আছি। আর তা ছাড়া সেই রাক্ষসের দেশে আপনাদের ছেড়ে দিতেও পারি না। দরকার হলে দ্রৌপদীকে বা নকুল ও সহদেবকে আমি বহন করে নিয়ে যেতে পারব। দ্রৌপদী সহাস্যে বললেন, আমার জন্যে ভাবতে হবে না, আমি হেঁটেই যেতে পারব।

স্বাতি বলল : এই সপ্তধারা আর গঙ্গাদ্বার কোথায় ?

বললুম : হরিদ্বারের পুরনো নাম গঙ্গাদ্বার। আর সেখানে এই সপ্তধারা এখনও আছে। হরিদ্বার থেকেই তাঁরা হিমালয় যাত্রা শুরু করলেন। আর গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হবার পর প্রবল ঝড় বৃষ্টি শুরু হল।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : গন্ধমাদন পর্বত তো তুমি তিব্বতে বললে !

তার কথা আমি মেনে নিলুম, বললুম : মনে হয়, এ অন্য কোন পর্বত। তার কারণ, কিছু পরেই দেখি যে ভীম একা সেখানে গিয়েছিলেন।

তার পরে বল।

দুর্যোগ থামবার পরে আবার তাঁরা চলতে লাগলেন। কিন্তু ক্রোশ খানেক যেতে না যেতেই দ্রৌপদী শ্রান্ত ও অবশ হয়ে বসে পড়লেন। ভীম তখন তাঁর রাক্ষস পুত্র ঘটোৎকচকে ডেকে এনে বললেন, তোমার মাকে কাঁধে করে নিয়ে চল। ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে কাঁধে নিল, আর তার অনুচর রাক্ষসেরা কাঁধে নিল

পাণ্ডব ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের। লোমশ মুনি শুধু নিজের পায়ে চলতে লাগলেন। এবং এক সময়ে বিশালা বদরীতে পৌঁছে ভাগীরথীর পুণ্য জলে তর্পণ করলেন।

স্বাতি বলল : বদ্রীনাথে ভাগীরথী আছে নাকি ?

বললুম : না। বদ্রীনাথের অলকনন্দা দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলে গঙ্গা হয়েছে। আর এই জন্যেই বলেছি যে গন্ধমাদন পেরিয়ে তাঁরা বদ্রীনাথে আসেন নি। বদ্রীনাথ থেকেই ভীম গন্ধমাদনে গিয়েছিলেন সহস্রদল পদ্ম সংগ্রহে।

স্বাতি বলল : এই পথের গল্প আমার মনে পড়ছে না।

বললুম : উত্তর-পূর্ব দিক থেকে একটি পদ্ম বাতাসে উড়ে এসে দ্রৌপদীর কাছে পড়েছিল। পদ্মটি যেমন সুন্দর তেমনি তার সৌরভ। দ্রৌপদী ভীমের কাছে আব্দার করলেন, এই রকম অনেকগুলি পদ্ম তাঁর চাই। আর ভীমও তখনই ধনুর্বাণ হাতে পদ্মবনের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন আর উপস্থিত হলেন গন্ধমাদন পর্বতে। এই পদ্মের গল্প অনেক বড়। ভীম যে পথে যাচ্ছিলেন, সে স্বর্গের পথ। তাই হনুমান তাঁকে পদ্মবনের পথ দেখিয়ে দিলেন। কৈলাস শিখর ও কুবের ভবনের নিকটে এক নদী, সেই নদীতে এই পদ্ম ফোটে।

স্বাতি বলল : মানস সরোবরে নয় তো ?

বললুম : এই পথে একটি বিশাল সরোবরের উল্লেখও আছে। সে যদি মানস সরোবর হয় তো নদী হল শতদ্রু। মানস সরোবর থেকে তার উৎপত্তি হয়েছে।

তার পরে বললুম : ভীমের বিলম্ব দেখে পাণ্ডবরাও সেখানে এসে পৌঁছেছিলেন। গন্ধমাদনের সানুদেশে কিছুকাল বাস করবার পরে কুবের ভবনে যেতে চাইলেন। খবর পাওয়া গেল যে এ পথে সেখানে যাওয়া যায় না, বদরিকাশ্রম থেকে বৃষপর্বার আশ্রম ও আর্ষ্টিষেণের আশ্রম হয়ে সেখানে যেতে হয়।

স্বাতি বলল : এই সব আশ্রম কোথায় !

হেসে বললুম : খুঁজতে যাবে নাকি ?

এখন কি এ সব খুঁজে পাওয়া যাবে !

কেন যাবে না !

স্বাতি বলল : কেউ কি এ সব খুঁজে বার করার চেষ্টা করে নি !

বললুম : হিমালয়ের নানা স্থানে আছে প্রাচীন মুনি ঋষিদের আশ্রম। স্থানীয় অধিবাসীরা সব জানে, বলেও সবাইকে। কিন্তু দেবতাদের বাসস্থান নিয়ে কোন গবেষণা হয়েছে বলে জানি না।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বললুম : শুনেছি, হিন্দুকুশ পাহাড়ের উত্তরে ইন্দরালয় নামে একটি জায়গা আছে। জনস্টন সাহেবের মানচিত্রেও এই জায়গা আছে, অমরকোষ ও শব্দরত্নাবলীতেও আছে এর উল্লেখ। এই জায়গাই নাকি আর্যদের আদি বাসস্থান। এর আগে তাঁরা দুশো ক্রোশ উত্তরে প্রাচীন ইন্দ্রালয়ে ছিলেন। সে অত্যন্ত হিমপ্রধান দেশ। বেদেও এ কথা আছে। ইন্দ্রালয়ে তাদের ভাষা ছিল ব্রহ্মভাষা। ব্রহ্মভাষা ও ব্রহ্মবিদ্যার কথা উপনিষদের অনেক জায়গায় আছে। পণ্ডিতরা গবেষণা করলে আমরা দেবতা ও স্বর্গ সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা জানতে পারব। পুরাণকে ইতিহাস বলে মেনে নিতেও আর আমাদের দ্বিধা হবে না।

স্বাতি বলল : এ নিয়ে কেউ গবেষণা করে না কেন ?

কারও আগ্রহ নেই বলে।

আশ্চর্য কথা ! এমন একটা বিষয়ে দুনিয়ার কারও আগ্রহ নেই !

বললুম : এ কোনও কেচ্ছা কেলেঙ্কারির কথা নয়, রহস্য কাহিনীও নয়। আর এ নিয়ে গবেষণা করে সফল হলে কারও কোনও লাভ ক্ষতিও হবে না। কাজেই কে করবে গবেষণা !

স্বাতি এ বিষয়ে কিছু বলবার আগেই আমাদের বিকেলের চা এসে গেল। বুঝতে পারি নি যে গল্প করেই আমরা সারা দুপুর

কাটিয়ে দিয়েছি। বাহিরে তখন বেলা শেষের রঙীন আলো দেখতে পেয়ে স্বাতি বলল: না না, বারান্দায় বসে সময় কাটাতে এখানে আসি নি। চল এবারে বেরিয়ে পড়ি।

বেরিয়ে পড়তে আমাদের বেশি সময় লাগল না। আরও কয়েক-জন আমাদের সামনে দিয়েই নেমে গিয়েছিলেন, আমরাও নামলুম। কিন্তু সেই দম্পতিকে এবারে দেখতে পেলুম না। তাঁদের ঘরের দরজাতে এখন তালা ঝুলছে। স্বাতি বলল: কখন উঠে গেছে দেখতে পাই নি।

আমি হেসে বললুম: মহাভারতের গল্পে আমরা ডুবে গিয়েছিলুম।

স্বাতি বলল: এ যুগের উপযোগী করে বললে মহাভারত বোধ হয় আজও আমাদের মন জয় করবে।

বললুম: এর চেয়ে সার্থক উপন্যাস পৃথিবীতে আজও লেখা হয় নি।

সত্যি!

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় এই রকম ভাবতেন। শুনেছি, শেষ বয়সে তাঁর মহাভারত লেখবার ইচ্ছা হয়েছিল।

স্বাতি বলল: আমি এ কথা শুনি নি।

আমিও সঠিক জানি না। তবে এই মহাভারতকে যে নতুন করে লেখার প্রয়োজন আছে তা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। আধুনিক উপন্যাসের সমস্ত লক্ষণ এতে আছে।

আমরা তখন হোটেলের সামনের পথে নেমে দাঁড়িয়েছিলুম। মনে হল, রানীখেতের এইটেই সদর রাস্তা। এই পথ ধরেই চলছে বাস ও ট্যাক্সি। উপরের একটা পথ থেকেও গাড়ি নেমে এল দেখলুম।

স্বাতি বলল: দাঁড়ালে কেন?

বললুম : কোন্ দিকে যাওয়া যায় তাই ভাবছি।

স্বাতি বলল : একটা নিরিবিলি পথ বেছে নেওয়া যাক।

তবে আমাদের উপরের পথটাই ধরতে হবে।

বলে সেই দিকে পা বাড়ালুম।

একটু একটু করে আমাদের উপরে উঠতে হচ্ছে। পথে লোকজন নেই। দোকান পাট আর কোলাহল পড়ে রইল নিচের পথে। উপরে সমতল জায়গায় পৌঁছেই স্বাতি বলল : বেশ লাগছে।

বললুম : নতুন জায়গায় এলে ভালই লাগে।

স্বাতি বলল : আরও ভাল লাগে যদি পথ ঘাট অজানা হয়।

তার মানে নিরুদ্দেশের যাত্রা।

স্বাতি হাসল। আর যে পথটা ঘুরে অরণ্যময় পাহাড়ের দিকে গেছে, সেই দিকেই পা বাড়িয়ে দিল। বলল : তোমার হিমালয়ের গল্প এখনও শেষ হয় নি।

বললুম : কী করে হবে! হিমালয়েরই তো শেষ নেই!

স্বাতি অন্য কথা ভাবছিল, বলল : পুরাণে, পাহাড় পর্বত নদীকেও প্রাণী বলে কল্পনা করা হত না ?

এক সঙ্গে অনেকগুলো নাম আমার মনে পড়ে গেল—হিমালয়, বিন্ধ্য মৈনাক, আর গঙ্গা যমুনা সরস্বতী। পুরাণে এঁদের গল্প পড়ে মনে হয় যে এঁরা মানুষের মতো প্রাণী, সম্মানে দেবতার মতো। স্বাতির এই প্রশ্ন শুনে মনে হল যে এঁদের সম্বন্ধেও অনেক কিছু ভাববার আছে। নিঃশব্দে আমি পথ চলতে লাগলুম।

স্বাতি বলল : চুপ করে রইলে যে ?

বললুম : হিমালয়ের কথাই ভাবছি। পার্বতীর পিতার নাম হিমালয়, আর মা মেনকা। অপ্সরা মেনকা নয়, এই মেনকা পিতৃলোক-দুহিতা। এঁদের আরও দুটি সন্তান ছিল—মৈনাক ও গঙ্গা। মৈনাক পর্বত ও গঙ্গা নদী।

স্বাতি বলল : এ কি খুব অদ্ভুত কল্পনা নয় ?

বললুম : এদের পাহাড় ও নদী ভাবলে অদ্ভুত মনে হবে, কিন্তু মানুষ ভাবলে তা মনে হবে না।

কিন্তু মানুষ ভাবব কেমন করে ?

কেন ভাবতে পারব না ! হিমালয়ের রাজা যিনি ছিলেন, তাঁকে সবাই হিমালয় বলত। যেমন ভারতবর্ষের রাজা ভরত। মৈনাক একটি ছোট পাহাড়, তাই ছেলের নাম রাখা হল মৈনাক। আর দুই মেয়ে, নাম গঙ্গা আর উমা। নদীর নামে এক মেয়ের নাম। আর পাহাড়ী মেয়ে বলে উমার নাম হল পার্বতী।

চলতে চলতেই স্বাতি আমার দিকে ফিরে তাকাল। বললুম : খুব আশ্চর্যের মনে হচ্ছে, তাই না ?

না।

পুরাণের সব গল্পকেই বিশ্বাসযোগ্য করে নেওয়া যায়। এই পার্বতীর জন্মকেও। দক্ষ প্রজাপতির মেয়ে সতী ছিলেন শিবের স্ত্রী। হরিদ্বারের কনখলে দক্ষ যে যজ্ঞ করেন, সেইখানে সতী প্রাণত্যাগ করেন। যক্ষযজ্ঞের গল্প তোমার জানা।

স্বাতি মাথা নাড়ল।

বললুম : সতীকে হারাবার পর শিব আবার কঠোর তপস্যায় বসলেন। আর সতীর পুনর্জন্ম হল হিমালয়ের গৃহে। মেনকা সতীর সখী ছিলেন, আর সতীর দেহত্যাগের পর মেনকা তাঁকে কন্যারূপে পাবার জন্যে তপস্যা করেছিলেন। এই মেয়েই পার্বতী। পার্বতী বড় হল, শিবের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখার গল্প কালিদাসের কুমারসম্ভবে অমর হয়ে আছে।

হঠাৎ স্বাতি আমার হাত টেনে ধরে আমাকে থামিয়ে দিল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলুম যে খানিকটা দূরে একটা বাঁক ঘুরে দুজন মানুষ এগিয়ে আসছে। অত্যন্ত মৃদু শব্দে স্বাতি বলল : চিনতে পারছ ?

ঘোড়ার উপরে ব্রিচেস পরা দুটি মানুষ, গায়ে পুরো হাতের দুটি পুলোভার আর চোখে কালো চশমা। একজনের মাথায় উলের টুপি, আর একজনের মাথায় একটা স্কার্ফ ভাঁজ করে বাঁধা। পাশে পাশে দুজন পাহাড়ী দুটো মোটা ওভারকোট হাতে নিয়ে আসছে। স্বাতি নিজেই বলল : সেই দম্পতি।

আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম। আবার হাঁটতে শুরু করলুম। গায়ে আমাদের ভারি গরম কাপড় নেই। শীতের আমেজে এখন আমাদের ভালই লাগছে। কিন্তু অন্ধকার নামবার আগে ফিরতে হবে।

দুজনে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। আমরাও এগিয়ে গেলুম। অনেকটা যাবার পরে স্বাতি বলল : ঘোড়ায় চড়া শিখছে, কেদারনাথের পথে কাজে লাগবে।

আমি বললুম : বাজারের পথে তো ঘোড়া দেখতে পাই নি, বোধ হয় দূর থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে।

সামনের বাঁকটা পেরিয়ে দেখলুম যে পথের শেষ নেই। সমতল পথ সমস্ত পাহাড়টা বেষ্টন করে অন্য ধারে ঘুরে গেছে। ছায়াশীতল নির্জন পথ। এক ধারে দূরে দূরে স্ট্যাণ্ডের উপর থেকে ফুল পাতার বাস্কেট ঝুলছে, অন্য ধারে পাহাড়। ঝাউ আর দেবদারুর বন। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। তাই দেখে হেসে বললুম : আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী!

স্বাতি রাগ করল না, কিন্তু রাগের ভান করে বলল : বুঝবে পরে।

বলে ফেরার পথ ধরল।

দিনের আলো তখন পাহাড়ের আড়ালে অন্তর্হিত হচ্ছে।

৬

ঘুম যখন ভাঙল, ঘরের ভিতর অন্ধকার তখনও ঘন হয়ে ছিল। পরক্ষণেই বুঝতে পারলুম যে ঘুম আমার ভাঙে নি, স্বাতি জাগিয়েছে আমাকে। পাশে দাঁড়িয়ে চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, তার ঠাণ্ডা হাতের স্নেহ স্পর্শেই আমার ঘুম ভেঙেছে। আমাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে হেসে বলল: তোমাকে না জাগালে হয়তো অনুতাপ করতে হত, তাই জাগালাম।

কম্বল ফেলে দিয়ে আমি উঠে পড়লুম, স্বাতি আমাকে সোয়েটার পরিয়ে একখানা গরম চাদর জড়িয়ে দিল। বলল: বাইরে এসো।

ঘরের দরজা খোলা ছিল, আর তার গায়েও চাদর জড়ানো ছিল। বুঝতে পারলুম যে সে আগেই বাইরে গিয়েছিল এবং দেখবার মতো কিছু দেখতে পেয়েই আমাকে জাগাবার জন্যে ভিতরে এসেছিল।

তার সঙ্গে বারান্দায় বেরিয়ে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলুম। সামনের দিগন্তে বরফের পাহাড় জেগে উঠেছে অন্ধকার থেকে। উপরে নীল আকাশ এখন নির্মেঘ, নিচের পৃথিবীতে রাতের অন্ধকার আছে জড়িয়ে। আর পূর্বাকাশে দেখছি সূর্যোদয়ের সূচনা। দিনের আলো স্পষ্ট হলেই হিমালয়ের সমস্ত তুষারশৃঙ্গ ঝলমল করে উঠবে।

বারান্দায় আর কেউ নেই, আর কোন ঘরের দরজা এখনও খোলা দেখছি না। বললুম: তুমি কি সারা রাত আজ জেগে ছিলে?

স্বাতি হাসল, কোন উত্তর দিল না।

আমি বিশ্বাস করি যে গভীর ভাবে কিছু চাইলে তা পাওয়া যায়ই। কোন বিশেষ সময়ে জাগবার সংকল্প নিয়ে শুলে সময় মতোই ঘুম ভেঙে যায়। স্বাতি এই দৃশ্য দেখবার জন্যে আকুল

হয়েছিল, তাই তাকে বিফল হতে হয় নি। সে নিজে জেগেছে, আমাকেও জাগিয়েছে।

বরফের পাহাড় ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তাই দেখে আমি বললুম : তোমার ক্যামেরা বার করবে না ?

না।

সে কি !

আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম। কিন্তু স্বাতি শান্ত ভাবে জবাব দিল : আজ নিশ্চিন্ত মনে পাহাড়ের রূপ দেখব।

মনে মনে বললুম, সেই ভাল। প্রকৃতির নগ্ন রূপ বুঝি ক্যামেরায় ধরা যায় না, মনের আয়নাতেই তার রূপটি ধরে রাখা সম্ভব। দেখতে দেখতেই তুষারশৃঙ্গগুলি চোখের সামনে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। নন্দাঘুন্টি থেকে নন্দকোট। ত্রিশূল থেকে ত্রিশূল ঈস্ট অনেক তফাতে। কিন্তু তার বিশাল বপু এক সঙ্গে যুক্ত। আর নন্দাদেবী সবচেয়ে উঁচু হয়েও কিছু নিষ্প্রভ। দার্জিলিঙের কাঞ্চনজঙ্ঘা যেমন মাউন্ট এভারেস্টকে আড়াল করে রেখেছে, কতকটা তেমনি। এ অঞ্চলে কামেটও খুব উঁচু শৃঙ্গ, নন্দাদেবীর কাছাকাছি। কিন্তু তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। চৌখাম্বা শিখরও দেখতে পাচ্ছি না,—দেখছি না কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের শৃঙ্গ। আরও কত শৃঙ্গ আছে, তার নামই আমরা জানি না।

বারান্দার রেলিঙ ধরে আমরা দেখছিলুম। স্বাতি অভিভূত ভাবে বলল : এরই নাম দেবতাত্মা হিমালয়।

বললুম : শুধু হিমালয় নয়, হিমালয়ের নাম নগাধিরাজঃ।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : কবি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব কাব্যের সূচনায় লিখেছিলেন—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।

পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥

স্বাতি বলল : মানে বুঝতে পারলাম না।

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের কথা আমার মনে পড়ে গেল। কুমার-সম্ভবের তৃতীয় সর্গের মদন দহন অংশটি তিনি অনুবাদ' করেছিলেন। এক সময় খুব ভাল লেগেছিল। বার বার পড়ে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল কতকগুলি শ্লোক। বললুম : রবীন্দ্রনাথ এই শ্লোকের অনুবাদ করেছিলেন—

উত্তর দিগন্ত ব্যাপি
দেবতাত্মা হিমাদ্রি বিরাজে—
দুই প্রান্তে দুই সিন্ধু,
মানদণ্ড যেন তারি মাঝে ॥

স্বাতি বলল : দুই সিন্ধু কি আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর ?

বললুম : বোধ হয় তাই।

হঠাৎ গত সন্ধ্যার কথা স্বাতির মনে পড়ে গেল। বলল : কাল তুমি পার্বতীর সঙ্গে শিবের প্রথম দেখার কথা বলতে চেয়েছিলে।

বললুম : সংস্কৃত শ্লোক সব মনে নেই, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ কিছু কিছু মনে আছে।

স্বাতি নিঃশব্দে সেই গল্প শোনাবার অনুরোধ জানাল।

বললুম : নন্দীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে মদন এসেছে শিবের তপস্যা ভঙ্গ করতে।—

দেখিল সে—মহাদেব শার্দুল-আসনে
দেবদারু বেদী-'পরে আছেন বসিয়া ॥

উন্নত প্রশস্ত অতি স্থির বক্ষ তাঁর,
শোভিতেছে সন্নমিত দৃঢ় স্কন্ধ দেশ,

কোলে তাঁর হাত দুটি রয়েছে অর্পিত
প্রফুল্ল পদ্মের মতো শোভিছে কেমন ॥

বদ্ধ তাঁর জটাজাল ভুজঙ্গ বন্ধনে।
কর্ণে তাঁর অক্ষসূত্র রয়েছে জড়িত—
গ্রন্থিবদ্ধ কৃষ্ণসার হরিণ-অজিন
ধরিয়াছে নীল বর্ণ কণ্ঠের প্রভায় ॥

এই সময়ে পার্বতী এলেন সেইখানে—

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥

থেকে থেকে খুলে পড়ে বকুল মেখলা,
বার বার হাতে করে রাখেন আটকি ॥

নন্দী এসে শিবকে পার্বতীর আগমন সংবাদ দিলে শিব তাঁকে লতাগৃহে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

উমার স্বহস্তে তুলা পল্লবে-জড়িত
হিমসিক্ত ফুলগুলি অর্পি পদতলে
সখীগণ মহাদেবে করিল প্রণাম ॥

উমাও সে পদতলে হইলেন নত—
চঞ্চল অলক হতে পড়িল খসিয়া
নবকর্ণিকার ফুল মহেশ চরণে ॥

শিব তাঁকে কী আশীর্বাদ করলেন জানো ?
বলে আমি স্বাতির দিকে তাকালুম।
স্বাতি কোন উত্তর দিল না।
বললুম : অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহীতি—

[অন্য] নারী-অনুরক্ত নহে যেই জন
[হেন] পতি লাভ করো আশীষিলা দেব।

এও বলেছিলেন যে তাঁর কথার কভু হয় না অন্যথা। আর পার্বতী যখন পদ্মবীজের মালা শিবের হাতে দিলেন, সেই সময়েই

সম্মোহন পুষ্পধনু করিয়া যোজনা
অমনি শিবের প্রতি হানিলা মদন॥

শিব অধীর হয়ে পার্বতীর মুখের দিকে চাইলেন। আর

অমনি উমার দেহ উঠিল শিহরি,
সরম বিভ্রান্ত নেত্রে লাজনম্র মুখে
পার্বতী মাটির পানে রহিলা চাহিয়া॥

আর শিবও তাঁর এই চিত্তচাঞ্চল্য দমন করে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন মদনের দিকে। মদন ভস্ম হয়ে গেল।

একটু থেমে বললুম: হর-পার্বতীর বিবাহ হয়েছিল কেদার-নাথের পথে ত্রিযুগীনারায়ণে। সেই বিবাহের হোমকুণ্ড এখনও জ্বলছে। বিষ্ণু এই বিবাহ দিয়েছিলেন। ত্রিযুগীনারায়ণে তাঁরই মন্দির।

স্বাতি প্রশ্ন করল: তুমি এই গল্প বিশ্বাস কর?

বললুম: কেন করব না! এর মধ্যে তো অবাস্তব কিছু নেই! বিশ্বাস দিয়েই আমরা ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছি। বিশ্বাসই ধর্ম।

স্বাতি বলল: সত্যি কথা। কিন্তু এত পুরনো কথা যে সত্যি বলে ভাবতে কেমন আশ্চর্য লাগে।

সত্যিই খুব পুরনো কথা। শিব আমাদের প্রাচীনতম দেবতা। পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থ ঋগ্বেদ লেখা হয়েছিল ভারতবর্ষে। বিদেশীদের মতে তার কাল হল খৃষ্টের জন্মের দেড় হাজার থেকে দু হাজার বছর আগে। আর সিন্ধু উপত্যকায় আমাদের যে সভ্যতা ছিল তার বয়স আরও বেশি। মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার কাল খৃষ্টপূর্ব আড়াই থেকে সাড়ে তিন হাজার বলে নির্ণয় হয়েছে। সেখানকার মাটি খুঁড়ে

জানা গেছে যে সে সময়েও এ দেশে শিবপূজার প্রচলন ছিল। আরও কোন দেব দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল বলে জানা যায় নি।

ঋগ্বেদের পর আমাদের অন্যান্য বেদ ও উপনিষদগুলি রচিত হয়েছে। এ সবের পর রামায়ণ ও মহাভারত। এদের বয়সও খৃষ্টের চেয়ে বেশি। বুদ্ধ ও মহাবীরের কালে রামায়ণ ও মহাভারত প্রচলিত ছিল। কাজেই আমাদের রাম ও কৃষ্ণ আরও পুরাকালের মানুষ।

মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে। পৌরাণিক প্রমাণে এই যুদ্ধ হয়েছিল খৃষ্টের জন্মের চোদ্দ শো তিরিশ বছর পূর্বে। তার মানে বুদ্ধ ও মহাবীরের প্রায় হাজার বছর আগে। সেকালে উত্তরপ্রদেশের নৈমিষারণ্যে বাস করতেন মুনি ঋষিরা, আর সূত নামে এক সম্প্রদায় মহাভারতের গল্প শোনাত তাঁদের। মহাভাবতের আদি পর্বেই আছে যে সৌতি উগ্রশ্রবা রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারতের কাহিনী শুনে নৈমিষারণ্যের ঋষিদের তা শুনিয়েছিলেন। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতের জন্ম হয়েছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়, জনমেজয় তাঁরই পুত্র। আর বৈশম্পায়ন মহাভারতের গল্প শুনিয়েছিলেন উগ্রশ্রবার পিতা লোমহর্ষণকে। আমরা বিশ্বাস করি যে বেদব্যাস মহাভারত রচনা করেন ও তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন সেই মহাভারত পাঠ করেছিলেন।

এর থেকে এ কথাও প্রমাণ হয় যে মূল মহাভারতের আখ্যান লেখা হয়েছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরেই। খৃষ্টের জন্মের তেরো চোদ্দ শো বছর পূর্বেই মহাভারত পাঠ এ দেশে প্রচলিত ছিল। তার পরে কত জন কত শ্লোক এতে যোগ করেন, তা বলা যায় না। মনে হয় যে বর্তমান রূপ পেতে এর আরও কয়েক শো বছর সময় লেগেছিল।

স্বাতি বলল : কী ভাবছ বল তো !

বললুম : বিষ্ণুর জন্ম কবে হল, তাই ভাবছি।

সে আবার কী ?

বললুম : রামকে আমরা বিষ্ণুর অবতার বলি। বলি কৃষ্ণকেও। কিন্তু মূল রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ করলে তা মনে হয় না। রামায়ণ মহাভারতের আগের রচনা। সে সময়ের অনেক মুনি ঋষিকে আমরা মহাভারতের কালে দেখতে পাই। তাঁরা তখন বৃদ্ধ হয়েছেন। সমাজ থেকে সবে গিয়ে নির্জনে বাস করছেন। হিমালয়ে ও অন্যান্য রমণীয় স্থানে তাঁদের আশ্রমের কথা আমরা মহাভারতেই দেখতে পাই।

স্বাতি বলল : তাতে বিষ্ণুর জন্মের সময় জানবে কী করে ?

ঋগ্বেদে বিষ্ণু একজন নগণ্য দেবতা। গোটা পাঁচ ছয় সূক্তে তাঁর যে স্তুতি আছে, তা পড়ে মনে হয় বিষ্ণু সূর্যেরই নামান্তর। পুরাণে তিনি কশ্যপ মুনির পুত্র। এবং পুরাণ রচয়িতা পণ্ডিতরাই বিষ্ণুকে ত্রিমূর্তির অন্যতম করেছেন বলে মনে হয়। এমনি করে রাম ও কৃষ্ণও দেবতার আসনে বসেছেন। শঙ্করাচার্যের সময়েও এ দেশ শৈব ছিল। এ দেশের লোক বৈষ্ণব হতে শুরু করেছে অনেক পরে। বদ্রীনাথে বিষ্ণুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা নাকি শঙ্করাচার্যই করেছিলেন।

রেলিঙের ধার থেকে সরে এসে আমরা অনেকক্ষণ আগেই চেয়ারে বসেছিলুম। স্বাতি বলল : তুমি কি বলতে চাইছ, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বললুম : সত্যিই আমার ভাবনা কিছু এলোমেলো হয়ে গেছে।

তা হোক।

আমি ইতিহাসের কথা ভাবতে চেষ্টা করছিলুম। মেগাস্থিনিসের সময় থেকে আমাদের লিখিত ইতিহাস আছে। বুদ্ধ ও মহাবীরের জন্ম মৃত্যুর তারিখ আমরা জানি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ও আমরা পৌরাণিক প্রমাণে বার করেছি।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : সেই প্রমাণের কথা তো আমাকে বল নি !

বললুম : আমাদের লিখিত ইতিহাসে নন্দ নামে এক রাজার উল্লেখ আছে। বিষ্ণু পুরাণে এই নন্দের নাম পাওয়া যায়। পরীক্ষিতের জন্মের এক হাজার পনর বছর পরে এই নন্দের অভিষেক হয়েছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে এক শো বছর বেশি। পুরাণকার বলেছিলেন যে নন্দের বংশধররা এক শো বছর রাজত্ব করবেন। আর চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল খৃষ্টের জন্মের তিন শো পনর বছর আগে। কাজেই যোগ দিয়ে দেখ, যে পরীক্ষিতের জন্ম খৃষ্টের জন্মের চোদ্দ শো তিরিশ বছর আগে। সেই বছরেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল।

স্বাতি বলল : ভারি মজার হিসেব তো !

আমি বললুম : এই হিসেব মেনে নিলে কৃষ্ণের জন্ম ও রামের জন্ম তারিখও বার করা সম্ভব। তার পরে বিষ্ণুর বয়স।

স্বাতি হেসে বলল : তার পরে শিবের বয়সও বুঝি বার করবে ?

আমিও হেসে বললুম : অন্তত শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিয়ের তারিখ। ত্রিযুগীনারায়ণে তাঁদের বিয়ের হোমের আগুন কত দিন ধরে জ্বলছে অঙ্ক কষে তা বার করতে পারলে তোমাদের বিশ্বাস হবে।

স্বাতি বলল : বুঝলাম।

কী বুঝলে ?

হিমালয়ের নামে শিবের কথা আমার এই জন্যেই মনে হয়। হিমালয়ও শিবের মতো প্রাচীন।

বললুম : হিমালয়কে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের অস্তিত্ব যেমন ভাবতে পারি না তেমনি ভারতের প্রথম সভ্যতার যুগেও শিবের পূজা প্রচলিত ছিল।

প্রত্যুষের আলোয় রানীখেত যে জেগে উঠেছিল, এতক্ষণ আমরা তা লক্ষ্য করি নি। হোটেলের বেয়ারা এসে ভোর বেলার চা আমাদের টেবিলের উপরে রেখে গেল।

৭

মুখ হাত ধুয়ে স্বাতি শাড়ি বদলে এল। বলল: নাও, এবারে তৈরি হয়ে নাও।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম: সে কি, কোথাও বেরোবে নাকি!

স্বাতিও বিস্মিত হবার ভান করে বলল: এমনি করে বসে থাকবে নাকি!

এর উত্তরে আমি তাকে পুরনো কথা মনে করিয়ে দিলুম, বললুম: সেইজন্যেই তো এসেছি।

স্বাতি তার হাতের ঘড়ি দেখল, তার পরে নিচে পথের দিকে চেয়েই হেসে বলল: সেই ভাল।

বলে সামনের চেয়ারে বসে পড়ল।

একটু পরেই আমি তার হাসির অর্থ বুঝতে পারলুম। বারান্দার খোলা দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে এল এক ভদ্রলোক। বলল: ইস্, আপনি এখনও বসে আছেন গোপালদা!

ভদ্রলোকের আপাদমস্তক আমি তাকিয়ে দেখলুম। না, চিনি বলে মনে হল না অথচ অত্যন্ত পরিচিতের মতো কথা বলছে, আর আমার নামও জানে দেখছি। বলল: গোপালদার কাণ্ড দেখুন স্বাতিদি, যেন আকাশ থেকে পড়ছেন! আমাদের যে বেরোতে হবে একটু পরেই, সে কথা দেখছি মনেই নেই!

আমি স্বাতির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সে বেশ উপভোগ করছে এই পরিবেশ। আর দুষ্টুমির হাসি লেগে আছে তার মুখে। বুঝতে বিলম্ব হল না যে এর পিছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে।

ভদ্রলোক আমার হাত ধরে টেনে তুলে বলল: নিন, উঠুন তো এবারে। বলে আমাকে ঘরের দরজার দিকে ঠেলে দিল। শুনতে পেলুম স্বাতিকে সে বলছে: তিতি বউদিও এই রকম গোঁতো।

লেপের তলা থেকে বেরোতেই চাইছিল না। তাই লেপটাই সরিয়ে দিয়ে এসেছি।

স্বাতি আমাকে বলল: সব গুছিয়ে রেখে এসেছি। চটপট তৈরি হয়ে নাও।

রানীখেতে পৌঁছবার পর থেকে সব ঘটনা আমি মনে করবার চেষ্টা করলুম। হাত মুখ ধোবার সরঞ্জাম নিয়ে বাথরূমে ঢুকেও ভাবলুম অনেকক্ষণ। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে রানীখেতে আমার পরিচয় হয় নি, পুরনো পরিচয়ও নয়। তবে! তবে কি স্বাতির পরিচিত কেউ খবর পেয়ে এসেছে! না স্বাতিই খবর দিয়েছে চিঠি লিখে! কিন্তু চিঠি লিখলে তো এই হোটেলের ঠিকানা দিতে পার'ত না!

তার পরে, কোথায় বেরোবে এরা! কোথায় বেরোবার জন্যে চট্‌পট্‌ তৈরি হয়ে নিতে বলছে! স্বাতির সঙ্গে চুক্তি করে আমি রানীখেতে এসেছি—নির্জনে থাকব, নিশ্চিন্ত আরামে কয়েকটা দিন কাটিয়ে ফিরব কলকাতায়। কিন্তু এখন তো অন্য রকম মনে হচ্ছে। আর এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে স্বাতিও যে যুক্ত আছে তাতে আর আমার সন্দেহ রইল না।

জামা কাপড় পরে বাহিরে বেরিয়ে দেখলুম যে স্বাতি এখন একাই বসে আছে। তার ক্যামেরাও বার করেছে বাক্স থেকে।

কিসের ষড়যন্ত্র বল তো!

বলে আমি তার সামনের চেয়ারে এসে বসলুম।

স্বাতি হেসে বলল: তোমাকে ঠিক আগের মতো মনে হচ্ছে না।

সে কি!

আগে তোমার দৃষ্টি অনেক সজাগ ছিল, আর প্রখর ছিল বুদ্ধি।

বললুম: দৃষ্টিশক্তি কমে বয়সের সঙ্গে, কিন্তু বুদ্ধি সাধারণত ভোঁতা হয় না।

সেই জন্যেই আশ্চর্য হচ্ছি।

বলে স্বাতি হাসল।

বললুম : দৃষ্টি সজাগ রাখতে হলে নিজেকে সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকতে হয়। বিশ্রামের জন্যে এসেও কি কাজ করব ভেবেছ!

স্বাতি বলল : কাল সন্ধ্যার কথা মনে কর। সদর রাস্তার উপরে শাক সবজির বাজার দেখে আমি একবার ভেতরে ঢুকেছিলাম, আর তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে বাইরে। সন্তুর সঙ্গে সেইখানেই পরিচয় হয়েছিল।

সন্তু কে?

যে ছেলেটি এসেছিল, তার নাম।

ভদ্রলোক বল।

স্বাতি হেসে বলল : সন্তুকে ভদ্রলোক বলব! বয়সে তো আমার চেয়ে ছোট।

আশ্চর্য যুক্তি! কিন্তু ও আমাদের নাম ধাম জানল কী করে?

ভেবেছ, আমি পরিচয় দিয়েছি! কিন্তু তা নয়। ওর ক্ষমতার কথা শুনলে তুমি আরও আশ্চর্য হবে।

বল।

দূর থেকে হঠাৎ স্বাতিদি বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল, আর আমি চমকে ফিরে তাকাতেই হাতে তালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল।

তুমি চিনতে না আগে?

কস্মিনকালেও না। ও বলছে, তোমার বইএর কোন্ পাতায় নাকি আমার ছবি দেখেছে। পেছন ফেরা ছবি, মুখ চোখ নেই, একটা প্রাকৃতিক দৃশ্যকে প্রাণ দেবার প্রয়োজনে নাকি এক পাশে মিলিয়ে আছি। ও বলছে, আমার দাঁড়াবার ভঙ্গিটি দেখে ও আমাকে সন্দেহ করেছে। আর চট্ করে বাইরে গিয়ে তোমাকে দেখে এসেই চেঁচিয়ে উঠেছিল।

বললুম : এ তোমার তৈরি করা গল্প।

স্বাতি বলল : কিন্তু আমি তো অবিশ্বাস করতে পারি নি, তাই ওর বুদ্ধির তারিফ করেছি।

মানে ধরা দিয়েছ ওদের কাছে।

উপায় ছিল না। ও একাই এক শো। ওর দলবলকে নিরস্ত্র করতে পারলেও ওকে পারি নি।

কিন্তু আমাকে তো কিছুই বলে নি !

আমি বারণ করেছিলাম।

বলে স্বাতি হাসল।

গত সন্ধ্যার কথা আমার মনে পড়ে গেল। রানীখেতের এই সব্জি বাজারটি খোলা আকাশের নিচে নয়, পাকা দোকানের মতো ব্যবস্থা। আমি ঠিক বাজারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলুম না। একটু পিছিয়ে এসে একটি বাড়ির বারান্দায় বিগোনিয়ার ফুল দেখছিলুম। কলকাতায় এ রকমের বিগোনিয়া দেখা যায় না। মোটা পাতার এই গাছগুলোতে ছোট ছোট লাল ও গোলাপি ফুল হয়। টবের গাছ। কিন্তু এখানে এই ফুল ঠিক গোলাপ ফুলের মতো দেখছি। পুরু পাপড়ি, যেন মাঝারি আকারের গোলাপ। জিরেনিয়ামও দেখছিলুম। তার নানান রঙ—সাদা গোলাপি লাল। এও টবে ফুটেছে। আমাদের হোটেলেও এই ফুল আছে, তাকে ঝুলিয়ে রেখেছে। গাছগুলোও যেন লতানো জাতের। আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে বাজার দেখে বেরোতে স্বাতির দেরি হচ্ছে, কিন্তু এই ফুল দেখতে ব্যস্ত ছিলুম বলে অধীর হয়ে পড়ি নি। শুধু বলেছিলুম, অনেক সময় লাগল !

আর স্বাতি শুধু বলেছিল : হ্যাঁ।

মিথ্যে কথা সে আমাকে বলে নি, মিথ্যা সে ঘৃণা করে। কিন্তু সত্য কথাও সে গোপন করেছিল। এই বারে বলল : অত ভাবছ কেন ! তোমার ভাল লাগবে না এমন কাজ করতে তোমাকে বলব না।

বললুম : ভাল লাগবে, তা বুঝলে কী করে ?

তোমাকে চিনেছি যে !

বলে পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাল আমার দিকে। গভীর সহানুভূতিতে সমাচ্ছন্ন সেই দৃষ্টি। গম্ভীর, প্রসন্ন, অপরিমেয় আনন্দ যেন স্থির হয়ে আছে। আমি কোন কথা বলতে পারলুম না।

আমাদের হোটেলের প্রায় সব ঘরের দরজা এখন খোলা। কেউ ড্রেসিং গাউন গায়ে, কেউ বা গরম চাদর জড়িয়ে বাইরে এসে বসেছেন। সামনে বরফের পাহাড় দেখে নানা রকম মন্তব্য করছেন তাঁরা। বেয়ারারা ভোরের চা প্রায় শেষ করেছে। এইবার এক-জন এসে স্বাতিকে জিজ্ঞাসা করল : ব্রেকফাস্ট আনব ?

হাতের ঘড়ি দেখে স্বাতি বলল : আনো।

তার পরে আমার দিকে চেয়ে বলল : আটটায় বেরোতে হবে বলে আজ একটু তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট দিতে বলেছিলাম।

কোথায় বেরুতে হবে ?

স্বাতি হেসে বলল : নৈনিতাল।

নৈনিতাল !

সে কি, রানীখেতে এসে নৈনিতাল আলমোড়া দেখবে না !

এ কি তোমার ব্যবস্থা ?

স্বাতি বলল : না। ব্যবস্থা সন্তু করেছে। ওদের বাসে জায়গা আছে বলে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে।

তার পরেই বলল : ওদের বাস মানে ওরা একটা ছোট প্রাইভেট বাস ভাড়া করেছে। নৈনিতাল দেখাবার পরে সময় থাকলে ভীমতাল দেখে ফিরবে। কাল নিয়ে যাবে আলমোড়া।

তার পর ?

তার পর ছুটি।

কাশ্মীরের কথা আমার মনে পড়ল। শ্রীনগরের মতো সুন্দর

জায়গায় গিয়েও আমরা স্থির হয়ে সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারি নি। সেখানেও আমরা ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছিলুম। টুরিস্ট অফিস থেকে এক গোছা টিকিট কেটে নানা জায়গায় গিয়েছিলুম— গুলমার্গে, পহলগামে, উলার লেক দেখতে। সোনমার্গে আর যুশমার্গে আমাদের যাওয়া হয় নি। শিকারায় চেপে ঝিলমের ছু ধারে শ্রীনগর শহর দেখেছিলুম, দেখেছিলুম মোগল উদ্যান, ডাল লেক আর নাগিন লেক। আরও কত জায়গা দেখেছিলুম, ভাবলে তা সবই মনে পড়বে।

সেও হিমালয়। সেখানে তার নাম পীরপাঞ্জাল গিরিশ্রেণী। গুলমার্গ তার উত্তর সীমায়। গুলমার্গ থেকে হরমুখ গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়, ১৬০১৫ ফুট। আরও অনেক উত্তরে নঙ্গ পর্বতও দেখা যায়। পৃথিবীতে উচ্চতায় তার পঞ্চম স্থান, ২৬৬৬০ ফুট। হিমালয়ের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত এই সুন্দর গিরিশৃঙ্গ দেখতে হলে কাশ্মীরের গুলমার্গে যেতে হবে। কিংবা আরও উপরে খিলেনমার্গে উঠতে হবে।

কাশ্মীর রাজ্যের উত্তর সীমায় কারাকোরাম পর্বত বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম গিরিশৃঙ্গের জন্য গঠিত। মাউন্ট গডউইন অস্টেন বা সংক্ষেপে মাউন্ট কে-টু তার নাম। উচ্চতায় ২৮২৫০ ফুট। হিমালয়ের মাউন্ট এভারেস্ট ২৯০০২ ফুট উঁচু। নেপালে তা অবস্থিত। হিন্দুকুশ পর্বত কাশ্মীরে নয়, আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত, কারাকোরামের পশ্চিম প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত।

বেয়ারা আমাদের ব্রেকফাস্টের ট্রে নিয়ে এসেছিল। জিজ্ঞাসা করল ঃ এইখানেই দেব ?

স্বাতি আমার দিকে তাকাল দেখে বললুম ঃ দাও।

ঘরের ভিতরে অন্ধকার এখনও ঘন হয়ে আছে। অন্য দিক থেকে আলো আসে না। জানালাও নেই। ঘরের পিছনে বাথ-রুম, তার পরে কী আছে দেখি নি। বোধ হয় পাহাড়।

রুটিতে মাখন মাখিয়ে স্বাতি আমার দিকে এগিয়ে দিল, আর ডিমের পোচ। বলল : কী ভাবছিলে বল তো ?

বললুম : হিমালয় কত বড়, তাই ভাবছি। ভাবছি, কত জায়গায় না তাকে দেখেছি। কাশ্মীরে, কুলু কাঙ্গড়ায়, গাড়োয়ালে-কুমায়ুনে—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : উত্তরাখণ্ডে তাকে দেখি নি। হিমালয়ের সব চেয়ে পবিত্র এলাকা হল উত্তরাখণ্ড।

বললুম : হিমালয়ে পবিত্র এলাকা আরো আছে। কাশ্মীরে অমরনাথ, কাঙ্গড়া উপত্যকায় জ্বালামুখী, নেপালে মুক্তিনাথ ও পশুপতিনাথ। আসাম-অরুণাচলের পূর্ব প্রান্তে পরশুরাম কুণ্ডও অতি পবিত্র স্থান।

স্বাতি বলল : এক সঙ্গে অনেক তীর্থ সেখানে নেই, আর—

নেই তুষারতীর্থ কেদারনাথ।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কোন কথা বলতে পারল না। আমি জানি, স্বপ্নে সেই তীর্থ দেখবার পরে এক অদ্ভুত ভাবে মন তার আচ্ছন্ন হয়ে আছে। হঠাৎ কী মনে হতেই বলল : সেই দম্পতিকে তো দেখতে পাচ্ছি না !

আমি ফিরে তাকিয়ে দেখলুম যে তাদের দরজা এখনও বন্ধ। বাইরে তালা ঝুলছে না দেখেই বুঝতে পারলুম যে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তাদের ঘুম এখনও ভাঙে নি। বললুম : ওদের সকাল এখনও হয় নি।

আশ্চর্য !

আশ্চর্য কেন !

যারা কেদারনাথে যাবে, তারা—

কিন্তু কথাটা স্বাতি শেষ করবার সুযোগ পেল না। সন্তু ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে উপস্থিত হল, বলল : আপনারা রেডি আছেন তো ?

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে স্বাতি বলল : একদম রেডি।

খুব ভাল। আমাদের বাস আসছে এখুনি।

স্বাতি সকৌতুকে বলল : আসে নি এখনও ?

বলে ঘরের ভিতর থেকে একটা ব্যাগ বয়ে আনল।

সন্তু বলল : ওতে কী নিয়েছেন ?

স্বাতি বলল : টুকিটাকি জিনিসপত্র। নৈনিতালের জলে যদি স্নান করতে ইচ্ছে করে, সে ব্যবস্থাও আছে।

ভীমতালে মাছ ধরবেন না তো ?

বললুম : মাছ ভাজা খাব। ভীমতালের ধরা তাজা মাছ।

সন্তু বিব্রত ভাবে বলল : তা হলে কি স্টোভ নিতে হবে নাকি ?

আমি আশ্বাস দিয়ে বললুম : না। ভীমতালের তীরে রেস্তোরাঁ আছে। মাছ ধরে দিলে তারাই ভেজে খাওয়াবে।

স্বাতি বলল : আর তা না দিলে—

নিজেদের ধরা মাছ।

স্বাতির ব্যাগটা সন্তু কেড়ে নিল, বলল : আর দেরি করবেন না, চলুন এবারে।

বেরোবার সময় বেয়ারাকে স্বাতি বলে গেল : আজ দুপুরে আমরা খাব না।

৮

অন্য একটি হোটেলের সামনে থেকে এই বাস ছাড়ছিল। সরকারি বাস নয়, সে রকম বড় কিছুও নয়। পুরনো আমলের ছোট বাস, স্টেশন ওয়াগনের চেয়ে কিছু বড়। তাতে সন্তুদের সবার জায়গা হয়েছে, আমাদেরও হল। সন্তু পরিচয় করিয়ে দিল সবার সঙ্গে। কেউ খুশী হলেন, কিন্তু কারও কোন ভাবান্তর হল না। তিতি বৌদির বয়স বেশি নয়, শৌখিন মহিলা। গায়ে একটা বিলিতি কার্ডিগান আর চোখে বড় কাচের কালো চশমা। হাতের ব্যাগটা দুলিয়ে দুলিয়ে আমাকে বললেন: সন্তুর কাছে শুনেছি, আপনি একখানা মজার বই লিখেছেন!

সন্তু কাছে ছিল না, তাই তার কথা আর শুনতে পেলুম না। স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে গেলুম। এ যাত্রায় লাঞ্ছনা আমার হবে না।

বাসে ওঠবার আগে সন্তু এসে বলল: আপনারা ড্রাইভারের পাশে উঠে বসুন গোপালদা। আরামও পাবেন, দেখবেনও ভাল।

বলে আমাদের এক রকম ঠেলেই উপরে তুলে দিল।

স্বাতি বলল: কোথায় কতক্ষণ দাঁড়াবে, সেটা আগেভাগেই জানিয়ে দিও ভাই।

তার জন্যে ভাববেন না স্বাতিদি। ও কি রাজেনদা, ও কি করছেন! হাতের সিগারেটটা ফেলে ওপরে উঠুন। এইটুকু বাসের মধ্যে—

সন্তুর তৎপরতার শেষ নেই। সেই যেন বাসের কণ্ডাক্টর, পার্টির গাইডও সে-ই। কাজেই তার সব দিকে সমান নজর।

এক সময়ে তার সুনিয়ন্ত্রণে বাস ছাড়ল। আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

খানিকটা এগোবার পরেই বুঝতে পারলুম যে পরিচিত পথ ধরেই আমরা চলেছি। কাল আমরা এই পথেই রানীখেতে এসেছিলুম। মনে পড়ে গেল যে কোশী নদীর পুল পেরিয়ে ভাওয়ালি পর্যন্ত আমরা একই পথে যাব, তার পরে অন্য পথ ধরব নৈনিতালের দিকে।

স্বাতি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল : কী ভাবছ বলতো?

বললুম : কী ভাবব, সেই কথাই ভাবছি।

স্বাতি বলল : আমার মনে হয়, তুমি পুরনো দিনের কথা ভাববে। ভাবতে যা ভাল লাগে, মানুষ তাই ভাবে। আর বেদনার কথা এড়িয়ে যায় সন্তর্পণে। তোমার কী মনে পড়ছে বল তো!

স্বাতি বলল : কয়েক মাস আগে ভাবতে পারি নি যে আবার আমরা এমনি করে পাহাড়ে বেড়াতে আসব। কাশ্মীরের কথা মনে পড়ে? শ্রীনগরের বাস স্ট্যাণ্ডের কথা?

বললুম : তোমার সে দিনের কথা আমি কোন দিন ভুলব না।

নিঃশব্দে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : আমি যখন আমার টিকিটের খোঁজে যাচ্ছিলুম, তুমি বলেছিলে, ভিড়ের ভেতরে হারিয়ে যেও না যেন!

স্বাতি সকৌতুকে বলল : ঠিকই তো বলেছিলাম।

কিন্তু আমার কী মনে হয়েছিল জানো? তুমি শ্রীনগরের বাস স্ট্যাণ্ডের ভিড়ের কথা বলছ না। বলছ এই বিরাট পৃথিবীর বহু মানুষের ভিড়ের কথা। সেই ভিড়ে আমার হারিয়ে যাওয়া চলবে না।

স্বাতি হেসে বলল : মনে পড়েছে। হালদার মশাই এই কথার উত্তর দিয়েছিলেন, ভিড়ের ভেতর হারিয়ে যাবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু তা পারবেন না। লক্ষ লোকের ভিড়েও আমি আপনাদের ঠিক খুঁজে পাব।

আমিও হেসে বললুম : তিনি তোমাকে আরও একটা কথা বলেছিলেন।

বলেছিলেন নাকি !

বলেছিলেন, এর পরে আমি আর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসব না। তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার দরকার কি আর হবে ?

স্বাতি এ কথার উত্তর না দিয়ে বলল : কাশ্মীরে যাতায়াতের ঝামেলা এখন অনেক কমে গেছে শুনেছি।

আমি জানি এ তার প্রসঙ্গ পাল্টাবার চেষ্টা। তাই চুপ করে গেলুম।

স্বাতি বলল : কলকাতা থেকে রওনা হলে পাঠানকোটে আর নামতে হয় না। সরাসরি জম্মুতে গিয়ে নামা যায়। নতুন স্টেশনের নাম হয়েছে বোধ হয় জম্মু তাওই। তাওই সেই নদীটার নাম নয় ?

বল্লুম ঃ হ্যাঁ।

তাওই নামের সেই ছোট নদীটির কথা আমার মনে পড়ে গেল। চন্দ্রভাগার উপনদী, শহরের ধার দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে। সমুদ্র সমতল থেকে মাত্র এক হাজার ফুট উঁচু হলেও জম্মু একটি সুন্দর পার্বত্য শহর। মহাভারতের বনপর্বে এর উল্লেখ আছে তীর্থস্থান বলে। জম্মুমার্গ দেবতা ঋষি ও পিতৃসেবিত, সেই তীর্থে গেলে সমস্ত কামনা পূর্ণ হয় ও ফললাভ হয় অশ্বমেধ যজ্ঞের। জম্মুতে এখন লোকে রঘুনাথজীর মন্দির দেখে। এক সঙ্গে অনেকগুলো মন্দির অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে।

জম্মু হল ডোগরাদের দেশ। এরা এক বলিষ্ঠ জাত। অনেক দুর্গ নির্মাণ করেছে। যুদ্ধও করেছে অনেক। এদের নাচও বলিষ্ঠ, আবার চারুশিল্পেও এদের খ্যাতি আছে। দেশ স্বাধীন হবার সময় কাশ্মীরের মহারাজা ছিলেন ডোগরা জাতের।

কিন্তু মহাভারতের সময় বোধ হয় জম্মুর রঘুনাথ মন্দির ছিল না। এই অঞ্চলে আর একটি প্রাচীন তীর্থস্থান আছে। তার নাম বৈষ্ণোদেবী। জম্মু থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে পাঁচ হাজার তিন শো ফুট উঁচুতে একটি গুহার মধ্যে আছেন দেবী। এক শো ফুট লম্বা

একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরে এগোতে হয়। আর দেবীর পায়ের নিচে থেকে বেরিয়ে এসেছে চরণ গঙ্গা নদী। প্রথম নবরাত্রি থেকে শুরু করে দু মাস ধরে যাত্রীরা আজও এই তীর্থ যাত্রা করে।

কাশ্মীরও অতি প্রাচীন দেশ। প্রবাদ আছে যে পুরাকালে কাশ্মীর উপত্যকা এক বিশাল জলাশয়ে নিমজ্জিত ছিল। তার নাম সতীসর, শিবানী সতীর নামে নাম। সতীসরে নাকি দৈত্যরা বাস করত এবং এ অঞ্চলের নরনারীর প্রাণনাশ করত। তার পর মানুষের এই দুঃখ দেখে ব্রহ্মার পৌত্র কশ্যপ এসে জলোদ্ভব নামে এক দৈত্য বধ করে এই জলমগ্ন দেশকে সুন্দর বাসস্থানে পরিণত করেন। কশ্যপ মীর বা কশ্যপ মার থেকে কাশ্মীর নাম হয়েছে।

কাশ্মীরের এক ইতিহাস লেখক দাবী করেছেন যে রাম লক্ষ্মণ যখন বনবাসে তখন ভরত ও শত্রুঘ্ন অবকাশ যাপনে এসেছিলেন কাশ্মীরে। মহাভারতের কালে গোনর্দ ছিলেন কাশ্মীরের রাজা। উনি বন্ধু ছিলেন মগধরাজ জরাসন্ধের। জরাসন্ধ যখন মথুরা আক্রমণ করেছিলেন, তখন তিনি যমুনার তীরে শিবির স্থাপন করে যদু বংশীয়দের পলায়নের পথ রুদ্ধ করেন। কৃষ্ণ জরাসন্ধের নিকট পরাজিত হন, কিন্তু গোনর্দ নিহত হন বলরামের হাতে। রাজ-তরঙ্গিনীর কবি কহ্লন বলেন যে গোনর্দের পুত্র দামোদর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। কৃষ্ণ বলরাম যখন কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে গান্ধার রাজ্যে যাচ্ছিলেন এক রাজকন্যার স্বয়ম্বর সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে, তখন পথে দামোদর তাঁদের আক্রমণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। দামোদরের রানী যশোমতী তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কৃষ্ণ এই রানীকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকের রাজ্য শাসন তখন বোধ হয় প্রচলিত ছিল না। কাশ্মীরের অমাত্যরা তাই প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কৃষ্ণ সেদিন নারীর সমান অধিকারের কথা বলেন নি, বলেছিলেন কাশ্মীরের নারী হরপার্বতীর অংশ।

দ্বিতীয় গোনর্দ এই যশোমতীর পুত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে তিনি নিতান্ত শিশু ছিলেন বলে কোন পক্ষে যোগদান করেন নি। তবে মহাভারতের সভাপর্বে আছে যে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় অর্জুন কাশ্মীর রাজ্য জয় করেন। তখন বোধ হয় দামোদর কাশ্মীরের রাজা।

মহাভারতের বনপর্বে আরও একটি কথা আছে। কাশ্মীরেই নাকি তক্ষক নাগের ভবন ছিল। বাসুকি নাগের নামে মন্দির ও কুণ্ড আছে এই কাশ্মীরে। শ্রীনগরে যাবার পথে বাসে সংসার চাঁদ নামে এক ভদ্রলোকের কাছে এই গল্প শুনেছিলুম। বাটোট নামে একটি জায়গা থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে ভাদরওয়া নামে একটা জায়গা আছে। সেদিকটার নাম লিট্‌ল্ কাশ্মীর। কেউ সুইজার-ল্যাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে, কেউ করে জার্মানীর ব্ল্যাক ফরেস্টের সঙ্গে তুলনা। পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে এই শহর, আর শহরেই বাসুকি নাগের মন্দির। এখানকার লোক বাসুকি বলে না, বলে বাসিক বা ওয়াসিক। খুব প্রাচীন এক কাঠের মন্দিরে দুটি কালো পাথরের মূর্তি আছে। তাদের মানুষের আকার।

এখান থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে বাসুকি কুণ্ড বা বাসিক কুণ্ড হল জম্মু প্রদেশের সব চেয়ে বড় তীর্থ। চৌদ্দ হাজার চার শো ফুট উঁচুতে কৈলাস লেক, তারই নাম বাসিক কুণ্ড। রাখী পূর্ণিমার পরের অমাবস্যায় এই তীর্থ দর্শনের নিয়ম। তার জন্যে 'ছড়ি' যাত্রা করে বাসিক নাগের মন্দিরের সামনে থেকে। তার সঙ্গে যারা থাকে, তাদের হাতে লোহার পাত থাকে সাপের আকৃতির। নানা রকমের বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে তারা চলে। কুণ্ডের ধারে চার পাঁচ হাজার লোক সমবেত হয়। ছাগল বলি হয় অনেকগুলি। আর রাতে আগুন জ্বেলে তার চারি দিক ঘিরে নাচ গান। লোকের ধারণা যে সেই অমাবস্যা রাতে স্বর্পরাজ বাসুকি নাগ কুণ্ডের জলে দেখা দিয়ে ভক্তদের প্রার্থনা পূরণ করেন।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে গেল যে কেদারনাথের নিকটেও বাস্থকিতাল নামে একটি সুন্দর জলাশয় আছে।

কাশ্মীরে শেষনাগের সম্বন্ধেও একটি গল্প প্রচলিত আছে। অর্জুন পাতাল জয়ের জন্যে পৃথিবীর বুকে তীর নিক্ষেপ করে একটি পথ করেছিলেন, আর দ্বিতীয় পথ করেছিলেন বেরিয়ে আসবার জন্যে। এই দুটি পথ এখন দুটি সরোবরে পরিণত হয়েছে, তাদের নাম মানসর ও সরুঁইসর। দুটি সরোবরই জম্মুর কাছে। পাতালে শেষনাগ তাঁর কন্যা উলূপীকে অর্জুনের হাতে সম্প্রদান করেন। কিন্তু এ মহাভারতের কাহিনী নয়। মহাভারতে উলূপী কৌরব্য নাগের বিধবা কন্যা, তার পতি গরুড়ের হাতে নিহত হয়েছিল। আর উলপী নিজেই এসেছিল অর্জুনের কাছে, গঙ্গাদ্বারে স্নানরত অর্জুনকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, আমাকে তুমি ভজনা কর। অর্জুন উলূপীকে বিবাহ করেন, তাঁদের পুত্রের নাম ইরাবাল।

এখন আমরা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছি। কোশী নদীর তীর পর্যন্ত আমরা এমনি নেমে যাব। তার পরে আবার উঠব। পাহাড়ের গায়ে ওঠা-নামাও আছে, বাঁক আছে। কিন্তু আজ আর পথের বৈচিত্র্য দেখতে পাচ্ছি না।

স্বাতিও বোধ হয় কাশ্মীরের কথাই ভাবছিল। জিজ্ঞাসা করল: জম্মু থেকে কাশ্মীর কত দূর মনে আছে?

বললুম: কাশ্মীর উপত্যকার দূরত্ব মনে পড়ছে একশো তিরিশ মাইল।

পথের কথা কি মনে নেই?

কিছু মনে আছে বৈকি।

জম্মুর পরে পীরপাঞ্জাল পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা ক্রমেই উপরে উঠেছিলুম। প্রথমে উধমপুর, তার পর কুড। পাট্‌লি টপ নামে একটা জায়গা সব চেয়ে উঁচু, তার পরে নিচে নেমে বাটোট। বাসে বসেই দেখেছিলুম এই সব জায়গা। ছোট ছোট পাহাড়ী

শহর বা গ্রাম। হোটেল রেস্তোরাঁ আছে, ডাক বাংলো আছে। রাত কাটাবার জায়গার কোনও অভাব নেই।

বাটোট থেকেই একটা পথ গেছে লিট্‌ল্ কাশ্মীরে। আমরা অন্য পথে নেমে এসেছিলুম চন্দ্রভাগার তীরে রামবাণে। পুল পেরিয়ে আবার চড়াই বানিহাল পর্যন্ত। এক সময় এই পাহাড়টা টপকাতে হত, সে ছিল ভারি কষ্টের কথা। এখন একটা দেড় মাইল লম্বা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের ওপারে পোঁছতে হয়। ওপার থেকেই কাশ্মীরের উপত্যকা শুরু হয়েছে।

স্বাতি বলল: এক এক জায়গায় খুব ভয় করেছিল।

বোধ হয় শিপশিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

মনে নেই।

আমি বললুম: বানিহালের সুড়ঙ্গ পেরোবার পরেই অন্ধকার নেমেছিল মনে আছে। পাহাড়ের গা বেয়ে আমাদের নামতে হয় নি। মনে হয়েছে, পাহাড়ে পিঠ বেয়ে আমরা গড়গড়িয়ে নেমে এসেছি।

স্বাতি বলল: অন্ধকারে আমরা অনেকটা পথ এসেছিলুম।

বললুম: পঞ্চাশ ষাট মাইল হবে। ডান দিকে ফিরে ভেরিনাগে আমরা ঝিলমের উৎস দেখি নি। অন্ধকারেই ছাড়িয়ে গিয়েছিলুম কাজিগুণ্ড খানাবল আর বিজবিহার। পথের ডান ধারে অবন্তীপুরের ধ্বংসাবশেষ আর পামপুরের জাফরানের ক্ষেত আমরা পরে দেখেছিলুম। শ্রীনগর পোঁছবার আগে পাণ্ড্রেথান কখন ছাড়িয়ে গিয়েছিলুম, তাও টের পাই নি।

স্বাতি বলল: কিন্তু শ্রীনগর দেখেছিলুম ভাল করে।

তা হয় তো দেখেছিলুম।

তোমার সব-চেয়ে ভাল লেগেছিল কী?

কিছু না ভেবেই উত্তর দিলুম: ঝিলম নদী।

আমার উত্তর শুনে স্বাতি বোধ হয় খুব আশ্চর্য হল।

বললুম: এই নদীটি তোমার ভাল লাগে নি? পীরপাঞ্জালের

পাদদেশে ভেরিনাগে তার উৎস। ভেরিনাগ হল স্ফটিক জলের একটি কুণ্ড। সেই কুণ্ড থেকে বেরিয়ে উত্তরবাহী ঝিলম পৌঁছেছে শ্রীনগরে। শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়ে উলার হ্রদে পড়েছে। আবার সেখান থেকে বেরিয়ে বারামূলার পরে কাশ্মীর ও পাকিস্তানের সীমানায় পার্বত্য এলাকা দিয়ে খরস্রোতে প্রবাহিত হয়ে চন্দ্রভাগার সঙ্গে মিলেছে পাকিস্তানে।

স্বাতি বলল : সব নদীরই তো এই রকমের গতি।

বললুম : ঠিক তা নয়। খানাবল থেকে বারামূলা পর্যন্ত পঁয়ষট্টি মাইল এই নদীর জল বেয়েই কাশ্মীরের সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য চলেছে অব্যাহত ভাবে। কাশ্মীরের প্রাণ এই নদী, এই নদী না থাকলে কাশ্মীর বাঁচত না।

স্বাতি ভাবল খানিকক্ষণ, তার পরে বলল : নদীর দু তীরে এমন সুন্দর শহর বোধ হয় আমরা আর দেখি নি।

বললুম : এ দেশের আরও অনেক শহরের মাঝখান দিয়ে নদী বয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক এমনটি বোধ হয় আর কোথাও নেই।

ঝিলমকে আমরা বিতস্তা বলি। আর এই বিতস্তা শ্রীনগরে উত্তরবাহী। দু ধারের সমৃদ্ধ শহর সাতটি সেতু দিয়ে সংযুক্ত। সেতুকে তারা কদল বলে। আমিরা কদল হল প্রথম পুল, তার পর হাওয়া কদল ও ফতে কদল পর্যন্ত ঘন বসতি। নতুন যে পুল তৈরি হয়েছে, তার নাম বাদশাহ ব্রিজ। আর এরই ধারে পুরনো রাজ-প্রাসাদে বসেছে নতুন সরকারী অফিস।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : ডাল লেক থেকে ঝিলমে যাবার কথা তোমার মনে আছে ?

আছে।

নিজের চোখে দেখেছি বলেই মনে আছে। ঝিলম নদী থেকে একটা সরু খাল বেরিয়ে শ্রীনগর শহরটাকে বেষ্টন করে আবার ঝিলমে পড়েছে। ডাল লেক থেকে আর একটা খাল এসেছে

এই দিকে। এরই উপরে ডাল গেট, দু পাল্লার লক গেট। দু তিন-খানা শিকারা এসে পৌঁছবার পরে একটা গেট ওঠে। শিকারা-গুলো ভিতরে ঢুকে পড়ে, কিন্তু বেরোতে পারে না। অন্য ধারে আর একটা গেট আছে। আর এ ধারের গেটটাও যায় বন্ধ হয়ে। তার পর মনে হবে যে শিকারা নেমে যাচ্ছে নিচে। শিকারা নয়, জলই যেন নেমে যায়। তার পরে গেট খুললে পৌঁছনো যায় ঝিলমের খালে।

আমার মনে হয়েছিল যে ঝিলম নদী প্রবাহিত হচ্ছে খাদের মতো নিচু জমি দিয়ে, আর ডাল লেক উঁচু মালভূমির উপরে। আগে এদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ ছিল না, অথচ দরকার ছিল। খাল কেটে সরাসরি যুক্ত করে দিলে ডাল লেকের সমস্ত জল হয়-তো ঝিলম দিয়ে বয়ে চলে যেত। এই আশঙ্কাতেই হয়তো আগে এই গেট তৈরি হয়েছে।

স্বাতি বলল : সে এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমাদের।

বললুম : এ রকম অজ্ঞিজ্ঞতা আর কোথাও আমাদের হয় নি।

এর পরেই স্বাতি প্রশ্ন করে বসল : ঝিলমকে রবীন্দ্রনাথ ঝিলম বলেছেন কেন?

তাহলে কী বলবেন?

কেন, তার আসল নাম তো বিতস্তা!

হেসে বললুম : মিলের খাতিরে। 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি' যেমন শুনতে লাগে 'বিতস্তার স্রোত' বললে তেমন লাগত না।

স্বাতি বলল : বিতস্তা নাম ব্যবহারের ইচ্ছা থাকলে তিনি ঝিলিমিলি না লিখে অন্য কিছু লিখতেন। তার পরে 'বিতস্তার স্রোতখানি বাঁকা' বেমানান হত না।

বললুম : আর্যদের এই সব কবিত্বময় নাম নতুন ভারতে হারিয়ে যাচ্ছে। পাঠানকোট ও জম্মুর মাঝখানে ইরাবতী হয়েছে রাভি।

কুলু উপত্যকায় বিপাশার নাম বিয়াস। আর শতদ্রু এখন শতলেজ নামে পরিচিত।

স্বাতি বলল: চন্দ্রভাগা নামটি বেঁচে আছে।

আর সরস্বতী হারিয়ে গেছে রাজস্থানের মরুভূমিতে।

গল্প করতে করতে আমরা কোশী নদীর পুলের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলুম। স্বাতি বলল: এই নদীর নাম তো কোশী!

বললুম: ভূগোলে আমরা যে কোশীর নাম পেয়েছি, এ সে কোশী নয়।

কী রকম?

কোশী বিহারের নদী। হিমালয়ের পরপারে তিব্বতে উৎপন্ন হয়ে নেপালের মধ্য দিয়ে নেমেছে বিহারে। কোশী গঙ্গার উপনদী।

এখন আমরা লোহার পুলের উপর দিয়ে কুমায়ুনের কোশী নদী পার হচ্ছি।

৯

নদীর ওপারে গিয়ে বাস একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়াল। ড্রাইভার নেমে পড়ল তার সঙ্গীকে নিয়ে। চা খাবে, সিগারেট খাবে, তার পর আবার যাত্রা করবে। নৈনিতালে পৌঁছবার আগে ভাওয়ালির বাজারেও বোধ হয় একবার দাঁড়াবে। বাসের অনেক যাত্রীই নামলেন, কিন্তু আমরা নামলুম না। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আমি বলেছিলুমঃ চা নয়, ভাওয়ালিতে আপেলের রস খাব।

স্বাস্থ্য ভাল করবে বুঝি!

বলে স্বাতি হাসল।

আমি বললুমঃ কাশ্মীরেও তো আমরা অনেক আপেল খেয়েছি। কিন্তু আপেলের রস খাই নি। আপেলের রস যে বোতলে ভরে বিক্রি হয়, সে কথাই শুনি নি।

কাশ্মীরের কথা স্বাতির মনে পড়ে গেল। বললঃ মোগল উদ্যানগুলি তোমার ভাল লাগে নি ?

ফুলের বাগান কার না ভাল লাগে! কিন্তু এগুলির পরিকল্পনায় বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নেই। পাহাড়ের গায়ে কোন ঝর্ণা দেখে স্থান নির্বাচন হয়েছে। দুই তিন বা ততোধিক স্তরে সাজানো হয়েছে বাগান। আর ঝর্ণার ধারাকে নানা ভাবে বাগানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়েছে। পিছনে বড় বড় গাছ, আর সামনে নানা জাতের মরশুমি ফুল। আর কোনও ছায়াশীতল স্থানে একটি পাথরের বিশ্রামাগার। ডাল লেকের ধারে চশমাশাহী শালিমার নিশাতবাগ সবই কতকটা এক রকম নয় কি ?

স্বাতি বললঃ আচ্ছাবলের বাগানও তো এই রকম।

বললুমঃ নাগিন লেকে যাবার পথে আকবর বাদশাহর নাসিম-বাগে আমরা নামি নি। সেখানে শুনেছি শুধু চিনার গাছ।

ড্রাইভার ফিরে এসে বাস চালাতে শুরু করেছিল। আবার আমরা উপরে উঠছি। কিন্তু কাশ্মীরের কথা আমরা ভুলতে পারছিলুম না। সমগ্র উপত্যকার কথাই মনে পড়ছিল।

শ্রীনগর শহরটাকে আমাদের পার্বত্য শহর বলে মনে হয় নি। পথ ঘাট সমতল, সোজা সরল রাজপথ, ঘরবাড়ি সমতল ভূমির মতো পাকা। পাহাড় আছে শহরের মাঝখানে—শঙ্করাচার্য পাহাড়। খানিকটা দূরে হরি পর্বত। ডাল লেক, নাগিন লেক, ঝিলম নদী। মনে হবে, পাহাড়ে ঘেরা সমতলের একটি শহর।

এই শহর থেকে বেরোলেই কাশ্মীরের উপত্যকা দেখা যাবে। পশ্চিমে আটাশ মাইল দূরে গুলমার্গ সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচু। শ্রীনগরের উচ্চতা হল পাঁচ হাজার ছ শো ফুট। বারামূলার পথে ন দশ মাইল যাবার পরে বাঁ হাতে গুলমার্গের রাস্তা। টেঙ্গমার্গ নামে একটা জায়গায় নেমে চার মাইল চড়াই পথ আমরা ঘোড়ায় চেপে উঠেছিলুম। ডাণ্ডিও পাওয়া যায়। অনেকে হেঁটেও ওঠে। এখন শুনছি গুলমার্গেও জীপ গাড়ি যাচ্ছে। খিলেনমার্গ আরও চার মাইল উপরে। সেখান থেকে চারি ধারের দৃশ্য মনোরম। পরিষ্কার দিনে গুলমার্গ থেকেও বরফের পাহাড় দেখা যায়। হরমুখ আর নঙ্গ পর্বত। গুলমার্গ মানে ফুলের উপত্যকা। কিন্তু ফুল আমরা কোথাও দেখি নি। একটি বিরাট ময়দান আর কয়েকটি ছোট বড় বাড়ি দেখেছিলুম—কয়েকটি হোটেল আর টুরিস্ট অফিস। আর চারি দিকের পাহাড়ের কোল ঘেঁষে অসংখ্য ঝাউ গাছ আকাশের নীল মেঘ আটকে রেখেছে। একটি নদী প্রবাহিত হচ্ছে উপত্যকার মাঝখান দিয়ে।

মনে পড়ছে, এক দিন আমরা উলার লেক দেখতেও বেরিয়েছিলুম। সেদিন এই গুলমার্গের পথেই মাইল আষ্টেক আসবার পরে বাঁ হাতে না বেঁকে সোজা বারামূলার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলুম আরও সাত আট মাইল। পাটন নামে একটা প্রাচীন

ঐতিহাসিক জায়গা দেখে উলার হ্রদে গিয়েছিলুম। বাসে বসেই সমস্ত হ্রদটা প্রদক্ষিণ করে এক জায়গায় নেমে জলের ধারে গিয়েছিলুম। উত্তর দক্ষিণে বারো মাইল আর ছ মাইল পূর্ব পশ্চিমে। সুস্বাদু জলের এত বড় হ্রদ পৃথিবীতে আর নেই। ঝিলম নদী এই হ্রদের এক প্রান্তে পড়ে আর এক প্রান্ত দিয়ে বেরিয়েছে।

কাশ্মীরের এই বিস্তৃত উপত্যকায় আরও অনেক হ্রদ আছে। শ্রীনগরের কাছে আনচার লেক, হোকারসর লেক। গুলমার্গের কাছে আফারওয়াট লেক। কোঁসরনাগ লেক বানিহালের পশ্চিমে উত্তর কাশ্মীরে বিষ্ণুসর ও কৃষ্ণসর সোনমার্গ থেকে তেরো মাইল দূরে। গঙ্গাবন হরমুখ শৃঙ্গের নিচে। মারসর ও তারসর লেক পহলগাম থেকে যেতে হয়। অমরনাথের পথে শেষনাগ। উলার দেখে ফেরার পথে আমরা মানসবল লেক দেখেছিলুম।

কুমায়ুন পাহাড়ে উলারের মতো বড় হ্রদ নেই। ছোট ছোট জলাশয় আছে। এদের মধ্যে নৈনিতাল আর ভীমতালের লেকই বোধ হয় বড়। এই দুটি দেখতেই আজ আমরা এসেছি। শ্রীনগরের ডাল লেক ও নাগিন লেকের সঙ্গে এদের তুলনা করতে পারব বলে মনে হয়।

উলার আর মানসবল দেখে ফেরার পথে আমরা ক্ষীরভবানীর মন্দির দেখতে নেমেছিলুম। মন্দিরের ভিতরে লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল মূর্তি। আর সামনে একটি জলের কুণ্ড। জলের রঙ ঘন ঘন পরিবর্তন হয় গোলাপী থেকে সবুজ হলদে ও সাদা। ঘুরে ঘুরে আমরা দুর্গা বুদ্ধ ও মহাবীরের মন্দিরও দেখেছিলুম।

সোনমার্গে বরফের হিমবাহ দেখতে আমরা যাই নি। লাদাখে যাবার এই পথ। লাদাখ কাশ্মীর রাজ্যের একটি জেলা। সংস্কৃতির বিচারে এটি একটি স্বতন্ত্র রাজ্য হওয়া উচিত ছিল। লাদাখীদের ধরনধারণ অনেক পরিমাণে তিব্বতীদের মতো। লে আর কার্গিল এই অঞ্চলের দুটি প্রধান শহর।

অন্য দিকে পহলগম পর্যন্ত আমরা বাসে গিয়েছিলুম। পামপুরের জাফরানের ক্ষেত ছাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলুম অবন্তীপুরের ধ্বংসাবশেষের সামনে। মন্দির গাত্রে অপরূপ শিল্পকর্ম দেখে চলে গিয়েছিলুম কোকরনাগের ঝর্ণাধারা দেখতে। তার পরে আচ্ছাবলে ফিরে দুপুরের আহার করেছিলুম ডাক বাঙলোয়। টুরিস্ট বাসে গেলে এই সব দেখিয়ে পহলগামে নিয়ে যায়। পথে অনন্তনাগের মন্দির ও ভাবন নামের একটি জায়গায় দাঁড়ায়। কিন্তু মার্তণ্ড মন্দির দেখা সম্ভব হয় না। দু মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে এই সূর্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। অপরূপ তার দৃশ্য।

এর পর লীডার নদীর তীর ধরে আমরা পহলগামে পৌঁছে গিয়েছিলুম। লীডার নদীর জন্ম কোলাহাই হিমবাহ থেকে। আর এই পহলগাম শহরটি শ্রীনগর থেকে ষাট মাইল দূরে সাত হাজার দু শো ফুট উঁচুতে।

পহলগাম থেকে পায়ে-হাঁটা পথ বেরিয়েছে দুটো। একটি উত্তর মুখে গেছে লীডার নদীর তীরে তীরে কোলাহাই হিমবাহের দিকে। অন্য পথ পূর্ব মুখে অমরনাথের দিকে গেছে। অমরনাথ দর্শনে আমরা যাই নি। অমরনাথের গল্প আমরা হালদার মশায়ের কাছে শুনেছিলুম।

সত্য যুগে এই স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গের দর্শন পেয়েছিলেন হিমালয় ভ্রমণরত মহর্ষি ভৃগু। কাশ্মীরে তখন তক্ষকনাগের রাজত্ব। মহর্ষি কশ্যপ তার আগে জলদৈত্য ধ্বংস করে এই উপত্যকাকে বাসোপযোগী করে গিয়েছিলেন। ভৃগু একটি দণ্ড তক্ষকের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, অমরনাথের দুর্গম পথে যাত্রার জন্য এই অভয়দণ্ড রাখো। এই দণ্ড নিয়ে যাত্রা করলে পথে কোন বিপদ হবে না।

বর্তমানে কাশ্মীরের ধর্মার্থ সঙ্ঘের মোহান্ত একটি রৌপ্যদণ্ডের অধিকারী, তার প্রচলিত নাম ছড়ি। প্রতি বছর শ্রাবণের শুক্ল-পঞ্চমীতে এই ছড়ি সামনে নিয়ে অমরনাথ যাত্রা আরম্ভ হয়।

অমরনাথের আসল দর্শন হল শ্রাবণের রাখীপূর্ণিমায়। তুষারলিঙ্গের তখন পূর্ণ অবয়ব। প্রায় আট দশ ফুট উঁচু। ১২৭০০ ফুট উঁচুতে পাহাড়ের গুহার ভিতরে চন্দ্রকলার সঙ্গে শিবলিঙ্গের ক্ষয় বৃদ্ধি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

অমরনাথের যাত্রা শুরু হয় পহলগাম থেকে। সবই ভাড়া পাওয়া যায়—তাঁবু, রান্নার সরঞ্জাম, আর সে সব বইবার জন্য কুলি ও ঘোড়া। যাত্রী বইবার জন্য ডাণ্ডিও পাওয়া যায়। পহলগামে যে শেষনাগ নদী লীডার নদীর সঙ্গে মিলেছে, তারই ধারে ধারে পথ। এখন মোটর পথ হয়েছে চন্দনবাড়ি পর্যন্ত। লোকে আইসব্রিজ দেখতে যায় সেখানে।

পহলগাম থেকে চন্দনবাড়ির দূরত্ব দশ মাইল। শেষনাগ নদীর পুল পেরিয়ে এই লোকালয় সাড়ে ছ হাজার ফুট উঁচুতে। তার পর বিষ্ণু ঘাঁটির চড়াই। খাড়া দেড় হাজার ফুট উঠতে হয়। এ রকম কষ্টকর চড়াই পথ নাকি আর কোথাও নেই। তার পরে জোজপাল উপত্যকা আর কুট্টি ঘাঁটির চড়াই পার হয়ে শেষনাগ হ্রদ চন্দনবাড়ি থেকে আট মাইল দূরে। পাহাড়ে ঘেরা ছোট জলাশয় ; কিন্তু তার রূপ নাকি অপরূপ। তিন দিকে তুষারশৃঙ্গ। বরফের নদী নেমেছে জলে। আর এই জলাশয় থেকেই জন্ম নিয়েছে শেষনাগ নদী। অমরনাথের পথে প্রথম রাত্রিবাস এই শেষনাগে।

শেষনাগ থেকে বায়ুজান বা ভাওজান দেড় মাইল দূরে। একখানা খোলা মাঠের মধ্যে যাত্রীদের জন্য ঘর আছে একটি। পাহাড় দূরে বলে সারাক্ষণ প্রচণ্ড বাতাস বয়। ভাওজান থেকে পঞ্চতরণীর পথে মহাগুনস বা মহাগণেশের কঠিন চড়াই চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু। কেউ বলে ষোল হাজার ফুট। তেমনি নিচু মাটির চড়াইও অনেকে সাড়ে তিন হাজার ফুট বলে। শেষনাগ থেকে মহাগুনস পাঁচ মাইল, আর তিন মাইল উৎরায়ের পরে পঞ্চতরণী। ছোট ছোট পাঁচটি ধারার সঙ্গম এইখানে। অমরনাথের পথে পঞ্চতরণী হল

এই পথের শেষ পড়াও। পহলগাম থেকে পঞ্চতরণী ছাব্বিশ মাইল পথ। চন্দনবাড়ি থেকে পদযাত্রা শুরু করলে ষোল মাইল হাঁটতে হয়। ঘোড়ায় চেপে বিদেশীরা এক দিনেই আসে, তীর্থযাত্রীরা আসে তিন দিনে।

অমরনাথে যাত্রীরা রাত্রিবাস করতে পারে না। তাই পঞ্চতরণী থেকে অমরনাথ দর্শন করে যাত্রীরা পঞ্চতরণী ফিরে আসে। যাতায়াতে আট মাইল পথ। অমরাবতী নদী পেরিয়ে অমরনাথের বিরাট গুহা। পঞ্চাশ ফুট চওড়া আর উঁচু পঁচিশ ফুট। গুহামুখ থেকে কুড়ি পঁচিশ ফুট তফাতে অমরনাথের বিরাটকায় তুষারলিঙ্গ। তার দু ধারে আরও দুটি তুষার স্তূপ আছে, পার্বতী ও গণেশ রূপে তা পূজিত হচ্ছে।

আমি আমার নিজের ভাবনার মধ্যেই ডুবে গিয়েছিলুম। নৈনিতালের পথে কত দূর এসেছি, তার খেয়াল ছিল না। স্বাতিও অনেকক্ষণ কথা বলে নি। এইবারে প্রশ্ন করল: তুমি কি এখনও কাশ্মীরের কথা ভাবছ?

হেসে বললুম: অমরনাথে পৌঁছে গেছি।

সকৌতুকে স্বাতি বলল: কী রকম?

বললুম: পহলগাম থেকেই পুরনো পথে গেলুম। এক একে পাঁচটি নদীর বালি ও জলের উপর দিয়ে পঞ্চতরণীর প্রশস্ত মাঠের উপর দিয়ে।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল: আরও কোন পথ আছে নাকি?

বললুম: অমরনাথের অমরাবতী নদী মিলেছে অমরগঙ্গার সঙ্গে। অমরগঙ্গার তীরে তীরে আট ন মাইল এগিয়ে গেলে লাদাখের সীমান্তে বালতাল গ্রামে পৌঁছনো যায়। জোজিলা পাসের নিচে এই বালতাল গ্রাম সোনমার্গ থেকে দূরে নয়। কাশ্মীর থেকে লাদাখ যেতে হলে এই পথেই যাত্রীদের যেতে হয়। আগে

সোনমার্গ, পরে বালতাল। তার পরে জোজিলা পাস পেরিয়ে কার্গিল, কার্গিল থেকে লে।

স্বাতি বলল : এ পথের কথা তো শুনি নি।

বললুম : এ পথ তো তীর্থযাত্রীদের জন্য নয়। তবে শুনতে পাচ্ছি, কাশ্মীর সরকার এই পথের উন্নতিসাধন করছেন। পুরনো পথে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে, ঘটছেও। কোন্ বছর কত যাত্রীকে প্রাণ হারাতে হবে, তার কোন ঠিক নেই। জীবন পণ করে যাত্রীদের যাত্রা করতে হয়। পিষুঘাঁটির দুঃসাধ্য চড়াই ভাঙতে না পেরেও অনেকে ফিরে আসে। অদূর ভবিষ্যতে নতুন পথ খুলে গেলে যাত্রীরা হয়তো নির্ভয়ে অমরনাথ দর্শন করতে পারবে।

স্বাতি আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল। কিন্তু কোনও মন্তব্য করল না, বলল না যে আমরাও একবার যাব। এ তার চিরকালের অভ্যাস। কিন্তু তার আজকের আচরণ আমার দৃষ্টি এড়াল না। কেদারনাথ তাকে ডেকেছেন স্বপ্নে, কিন্তু অমরনাথের ডাক তার কানে এখনও পৌঁছয় নি। সে পথ নিরাপদ ভাবলে সে নিশ্চয়ই বলত, আমরাও সেখানে যাব।

কেন জানি না, তার এই ভয় আজ আমার ভাল লাগল। স্বাতি আমার দিকে একবার ফিরে তাকাল। তার পরে নিঃশব্দে মুখ ফিরিয়ে নিল।

বাসের গতি এখন মন্থর হচ্ছে। আমরা বোধ হয় ভাওয়ালি পৌঁছচ্ছি।

ঠিকই বুঝেছিলুম। ভাওয়ালির বাজারে এসে আমরা উপস্থিত হলুম। স্বাতি বলল : এ জায়গার নাম কুমায়ুনের শ্যামবাজার রাখলে ভাল হত।

বললুম : তাহলে কলকাতার লোক ছাড়া আর কেউ এর মানে বুঝত না।

বাসের ড্রাইভার নামল না দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম ঃ এখানে কি বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না ?

ড্রাইভার বলল ঃ আপনাদের দরকার না থাকলে—

কথাটা শেষ হবার আগেই পিছন থেকে সন্তুর গলা শোনা গেল। বাসের গায়ে থাবা মেরে চেঁচিয়ে উঠল ঃ বল ঠিক হ্যায়।

ড্রাইভার আর দেরি করল না। এগিয়ে চলল। খানিকটা এগিয়ে পথের ধারে দেখতে পেলাম ভাওয়ালির বিখ্যাত যক্ষ্মা হাসপাতাল। সদর রাস্তার ধারেই বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে তার নাম। ছোট শহর। দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ঘর বাড়ি দেখতে না দেখতেই শেষ হয়ে গেল।

স্বাতি বলল ঃ নৈনিতাল পৌঁছতে বোধ হয় আর সময় লাগবে না।

এ কথার উত্তর আমার জানা ছিল না। স্বাতি নিজেই আবার বলল ঃ নৈনিতাল সম্বন্ধে আমার একটা কৌতূহল আছে।

কী রকম ?

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল ঃ নৈনিতালের লেকের প্রশংসা শুনেছি তো, শ্রীনগরের সঙ্গে তার কতটা মিল আছে তাই আমার জানবার ইচ্ছা।

বললুম ঃ মিলের চেয়ে গড়মিলই বেশি।

কেন ?

নৈনিতালে কোনও ঝিলম নদী নেই।

হাউসবোটও বোধ হয় নেই।

বললুম ঃ জলের উপরে কোনও জীবনযাত্রা নিশ্চয়ই নেই।

সত্যিই শ্রীনগরের সে এক বিচিত্র রূপ। শুধু ঝিলমের তীরে নয়। ডাল লেকে নাগিন লেকে সর্বত্র নানা আকারের হাউসবোট আছে বাঁধা। রাজপথ থেকে ঘাটে নেমে শিকারায় চেপে ডাল লেকের হাউসবোটে গিয়ে উঠতে হয়। টুরিস্টরা শৌখিন হাউস-

বোটে থাকে, আর স্থানীয় লোকেরা পুরাতন জীর্ণ হাউসবোটে বাস করে জলের আনাচে-কানাচে। শিকারায় পণ্যদ্রব্যের কেনাবেচা। শুধু ফুল ফল সব্জি নয়, শালদোশালা থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিস। পোস্ট অফিসও চলেছে শিকারায়। নিশ্চিন্ত অবসর যাপনের জন্য হাউসবোট থেকে মাটিতে নামবার প্রয়োজন হবে না। শ্রীনগরের বাহিরে আর কোথাও এরকম জীবনযাত্রার কথা শুনি নি।

নৈনিতাল পৌঁছতে আমাদের আরও অনেকটা সময় লাগল। কিছুক্ষণ থেকেই পথের ধারে ঘর বাড়ি দেখতে পাচ্ছিলুম। এইবারে একটা জনবহুল জায়গায় এসে বাস দাঁড়াল। শহরের এক প্রান্তে বাস স্ট্যাণ্ড এটা। নাম তল্লিতাল।

বাস থেকে নেমেই স্বাতি এগিয়ে গেল। বাজারের দিকে নয়, শহরের দিকেও নয়। সে এগিয়ে গেল লেকের দিকে। সুদূর প্রসারিত লেকটি আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলুম। আমি তার কাছে এগিয়ে আসতেই বলল: না, কাশ্মীরের সঙ্গে নৈনিতালের কোনও তুলনা হয় না।

তার কারণ সে নিজেই বলল: নৈনিতালকে একটা শৌখিন পাহাড়ী শহর বলে মনে হচ্ছে। শ্রীনগরের মতো কবিত্বময় নয়।

এক নজরে চারি ধারটা আমি দেখে নিলুম। এখানকার এই প্রশস্ত জলাশয় ঘিরে উঁচু পাহাড়, লেকের গা থেকেই যেন ঠেলে উপরে উঠেছে। বাঁ দিকটা অন্ধকার অরণ্যময়। দূরে দূরে দু একটা ঘর বাড়ি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পথের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে। ডান দিকে প্রশস্ত রাজপথ রৌদ্রোজ্জ্বল, বড় বড় বাড়ি, হোটেল দোকান পাট। লেকের অপর প্রান্তে ঘন বসতি দেখতে পাচ্ছি। পরে জেনেছিলুম, ও দিকটার নাম মল্লিতাল। শহরের শৌখিন বাজার আর ভাল হোটেলগুলি সব ঐ ধারেই।

এ ধারটায় সাধারণ লোকের বাস, সস্তার হাট বাজার। ট্রান্সপোর্ট অফিসও এই দিকে।

মনে হল. স্বাতি ঠিকই বলেছে। নৈনিতালের লেকে বিরাট মরালের মতো হাউসবোট নেই। রঙবেরঙের পর্দা ঝোলানো শিকারাও যাচ্ছে না সামনে দিয়ে। লেকের জলে চলমান জীবন দেখতে পাচ্ছি না। পারের কাছে কিছু নৌকো বাঁধা আছে, আর সাদা পাল তোলা কয়েকটি নৌকো দেখছি লেকের মাঝখানে। এ রকম দৃশ্যও আর কোথাও আমরা দেখি নি।

আমি কোনও উত্তর দিলুম না দেখে স্বাতি বলল : ঠিক বলি নি?

বললুম : সেইজন্যেই তো কাশ্মীরের নাম ভূস্বর্গ।

১০

পিছনে হঠাৎ সন্তুর চিৎকার শুনে চমকে উঠলুম। ফিরে দেখি, সে এই দিকেই ছুটে আসছে। বলল : গাড়ি থেকে নেমেই হারিয়ে যাচ্ছিলেন গোপালদা, কী মুস্কিল বলুন তো!

আমি কোন উত্তর দিলুম না, আর স্বাতি হাসল।

সন্তু বলল : হাসি নয় স্বাতিদি, এ একটা সীরিয়াস ব্যাপার। এত লোক এক সঙ্গে এসেছি, কেউ হারিয়ে গেলে তো চলবে না, ফিরতেও হবে সময় মতো। আবার সবারই সমান স্বাধীনতা দরকার, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে টেনে নিয়ে গেলে চলবে না।

স্বাতি বলল : ঠিক কথা।

তবেই দেখুন। ফেরার সময়টা সবার জানা থাকা দরকার কিনা!

আমি বললুম : খুব দরকার।

খুশী হয়ে সন্তু বলল : এই দেখুন, আপনি কত চট্ করে ব্যাপারটা বুঝে গেলেন। অথচ আর সবাই বলছে, এ শহরটা যখন দেখা হয়ে যাবে তখন ফিরবে। তার মানে দেখা শেষ না হলে হয়-তো ফিরবেই না।

স্বাতি বলল : সে কি কথা!

সন্তু বলল : ভয় নেই, আমরা দুটোয় ফিরব ঠিক করেছি ঠিক এইখান থেকেই। তার আগেই আমাদের খেয়ে নিতে হবে।

বললুম : ঠিক আছে, দুটোর সময় আমাদের ঠিক এইখানেই পাবেন।

স্বাতি বলল : আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

সন্তু বলল : বেশির ভাগই উঠবেন চীনা পিকে বরফের পাহাড় দেখতে। আর—

সন্তু দেরি করছ কেন ?

ও ধার থেকে সন্তুকে কে ডাকল তা বোঝবার আগেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর খানকয়েক সাইকেল রিক্সায় চেপে দলের কয়েকজনকে দেখলুম ওধারের বড় রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে। জলের দিকে কেউ এল না।

স্বাতি বলল : ভালই হল।

কেন ?

একটু নিরিবিলিতে এই শহরটাকে আবিষ্কার করা যাবে।

হঠাৎ মনে হল যে একটা লোক আমার হাতের ব্যাগটা ধরে টানাটানি করছে। তার দিকে ফিরে তাকাতেই বলল : আইয়ে সাব।

ব্যাপারটা আকস্মিক হলেও বুঝতে পারলুম যে এক নৌকোওয়ালা আক্রমণ করেছে। আরও কয়েকজন স্বাতিকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার আগেই আমার মুঠো একটু আলগা হয়ে গেল, আর পরমুহূর্তেই আমাদের ব্যাগ উঠে পড়ল একটা নৌকোয়। অন্য নৌকোওয়ালারা হতাশ হয়ে সরে গেল।

পরে জেনেছিলুম যে কুলিদের ব্যাপারেও এই নিয়ম। কুলিরা নিজেদের নম্বরের চাকৃতি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যাত্রীবাহী বাস এসে দাঁড়াবার আগেই চাকৃতিগুলি যাত্রীদের হাতে জানালা দিয়ে গুঁজে দেয়। তার মানে, এই যাত্রীর মাল বইবার অধিকার তার। মালপত্র চিনিয়ে দিয়েই যাত্রী নিশ্চিন্ত, যেখানে পৌঁছতে হবে সেইখানে পৌঁছে দিয়ে তার চাকৃতি ও মজুরি নেবে।

আমাদের আর আপত্তি করবার উপায় ছিল না। নিঃশব্দে গিয়ে নৌকোয় উঠতে হল।

ইচ্ছা করলে আমরা মুখোমুখি বসতে পারতুম, কিন্তু স্বাতি এসে আমার পাশে বসল। বলল : একটু সরে বোসো।

তাকে ব্যাগ হাতে নিয়ে এ দিকে আসতে দেখে আমি আগেই সরে বসেছিলুম। বললুম : মুখোমুখি বসলেই তো ভাল লাগত!

দরকার আছে বলেই এ দিকে বসছি।

বলে ব্যাগের ভিতর থেকে সেই পুরনো নক্সাটা বার করল।

অন্য দিক থেকে মাঝি বলল : কোন্ ধার দিয়ে এগোব ?

এই ধার দিয়ে।

বলে স্বাতি শহরের উল্টো দিকে নির্জন ধারটাই দেখিয়ে দিল। লেকের পশ্চিম দিক এটি। গাছে গাছে আচ্ছন্ন হয়ে আছে পাহাড়। একটুখানি এগিয়ে যেতেই শীতার্ত বাতাস শির শির করে গায়ে লাগল। ঘন নীল জল ছায়ায় ও অন্ধকারে এখানে কালো দেখাচ্ছে। কিন্তু স্বাতির মন এ দিকে ছিল না। নক্সাটা নিজের চোখের নিচে মেলে ধরে বলল : দেখো।

হেসে বললুম : গোলকধাঁধার মতো মনে হচ্ছে।

আমার কথা শুনে স্বাতিও হাসল। বলল : সত্যিই তাই। নক্সা দেখে পাহাড়ী শহর সম্বন্ধে কোন ধারণা হয় না।

নক্সাটা নিজের দিকে একটু টেনে নিয়ে বললুম : কিছু বোঝা যায় কিনা দেখি।

রাজ্য সরকারের টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্টের নক্সা। কিন্তু অসম্পূর্ণ। উপরের দিকটা উত্তর ধরে নিলে আমরা এখন পূর্ব দিকে চলেছি। দি ফ্ল্যাট্‌স্ বলে একটা ময়দান ঐ দিকে। সেখানে সব রকমের খেলাধুলো হয়। বড় বড় হোটেল, মিউনিসিপাল মার্কেট, সেক্রেটারিয়েট অফিস আর সুখাতাল নামে একটি জলাশয়। বাস স্ট্যাণ্ডের উত্তরে কমিশনারের অফিস, আদলত আর রাজভবন। এই দিকের পাহাড়েই টিফিন টপ আর ল্যাণ্ডস্ এণ্ড নামে দুটি বেড়াবার জায়গা। নক্সা দেখে মনে হয় তল্লিতাল ও মল্লিতাল দু ধার থেকেই সেখানে যাওয়া যায়।

পাশে আরও একটি নক্সা আছে। এটি আমরা রানীখেতের পথে দেখেছিলুম। নৈনিতালের কাছাকাছি আরও কয়েকটি দর্শনীয় স্থান আছে। লারিয়াকাঁণ্টা যাবার পথ বোধ হয় তল্লিতালের

কোনখান থেকে বেরিয়েছে ; আর স্নো ভিউ-এ যেতে হয় শহরের মাঝখান থেকে। মনে হচ্ছে যে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত একটি পাহাড়ের দু জায়গায় এই দুটি স্থান অবস্থিত। চীনা পীক উত্তর দিকের একটি পাহাড়ে, মল্লিতাল থেকে তার পথ। অন্য একটি পথ গেছে খুরপাতালের দিকে। টিফিন টপ আর ল্যাণ্ডস্ এণ্ড দক্ষিণের পাহাড়ে।

ইতিমধ্যে স্বাতি একখানি সরকারী পুস্তিকাও বার করে ফেলেছিল তার ব্যাগ থেকে। বলল : ম্যাপে যে সব জায়গার নাম আছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাবে এতে।

বলে বইখানি আমার হাতেই দিল।

আমরা খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছিলুম। মনে হচ্ছিল যে এই নৌকোয় বেড়ানো ছাড়া আর আমাদের কোনও কাজ নেই। বললুম : একটা শহরে বেড়াতে এসে কি আমরা বই পড়েই সব জানব ?

স্বাতি বলল : সময় পেলে রানীখেতেই জেনে আসতাম।

কিন্তু ফিরে গিয়ে তো শহর দেখার সুযোগ পাব না !

কিছু না জেনে দেখবই বা কী !

তাহলে এই বইপত্র খুব তাড়াতাড়ি দেখে নেওয়া দরকার।

বইএর পাতা উল্টে দেখলুম যে খুব সংক্ষিপ্ত বই। নক্সায় যে সব জায়গা আছে তার বর্ণনা খুবই সংক্ষেপে। সাড়ে তিন মাইল দূরে লারিয়াকাঁণ্টা আট হাজার ফুট উঁচু। এখান থেকে কুমায়ুন পাহাড়ের অনেকগুলি লেক দেখা যায়। স্নো ভিউএর উচ্চতা সাড়ে সাত হাজার ফুটের কম, দূরত্বও মাইল দুয়েক কম। এই পাহাড়ের নাম শের-কা ডাণ্ডা। হিমালয়ের বরফ দেখা যায় এইখান থেকে। চীনা পীক হল নৈনিতালের সব চেয়ে উঁচু পাহাড়, ৮৫৬৮ ফুট। সাড়ে তিন মাইল পথ অতিক্রম করে কোনও রকমে এই চূড়ায় উঠলে শরীর ও মন নাকি জুড়িয়ে যায়। এক দিকে হিমালয়ের তুষার-

শৃঙ্গ, অন্য দিকে নিচের সমতল ভূমি। নৈনিতাল শহরটিও দেখা যাবে উপর থেকে। টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্ট সেখানে একটি লগ কেবিন ও রেস্তোরাঁ স্থাপন করেছে। স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : বরফের পাহাড় কি রোজই দেখা যায় ?

আমি বললুম : এ প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় আমাদের মাঝি দিতে পারবে।

বলে তাকেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

সে বলল : আজ দেখা যাবে না।

কেন ?

চীনা পীকের ওপর থেকে আজ পতাকা উড়ছে না।

তার মানে যেদিন বরফ দেখা যায় সেদিন টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্টের লোক একটি পতাকা উড়িয়ে দেয়। স্বাতি এই কথা বুঝতে পেরে বলল : আহা, সন্তুরা তাহলে নিরাশ হয়ে ফিরবে !

আমি বললুম : এই কথাটি তোমার সরকারী বইএ লেখা নেই কেন !

স্বাতি বলল : সরকারী বই বলেই নেই।

তার পরে আরও দুটি জায়গার নাম দেখলুম। হনুমানগড়ি ও কিলবেরি। ফ্ল্যাট্‌স্ থেকে দু মাইল দূরে হনুমানগডি থেকে সূর্যাস্ত দেখা যায়। হনুমানের একটি মন্দির থেকে নাম হয়েছে হনুমান-গড়ি। উত্তরপ্রদেশের অ্যাস্ট্রনমিকাল অবজারভেটরি এর নিকটে। পাঁচ মাইল দূরে কিলবেরিতে লোকে পিকনিক করতে যায়। ফরেস্ট রেস্ট হাউসে রাত কাটানোও চলে। ৮৩০০ ফুট উঁচুতে এ একটি মনোরম জায়গা। আর তিন মাইল দূরে খুরপাতাল মাছ ধরার জন্যে বিখ্যাত।

স্বাতি হঠাৎ বলে উঠল : সামনে ঐ মন্দিরটি কোন্ দেবতার ?

এই প্রশ্ন সে আমাকে করে নি, হিন্দী ভাষায় এই প্রশ্ন করেছে মাঝিকে। মাঝি সংক্ষেপে বলল : নৈনি দেবীর।

বই আর নক্সার উপরেই আমার দৃষ্টি এতক্ষণ নিবদ্ধ ছিল। এইবারে চোখ তুলে দেখলুম যে পাশাপাশি দুটি মন্দির অদূরে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তাদের গড়ন ঠিক সাধারণ মন্দিরের মতো নয়। একটি চার কোণা এবং অপরটি আট কোণা মনে হচ্ছে। একটির উপরে আর একটি ছাদ নানা রঙে রঙীন দেখাচ্ছে।

আমার দিকে চেয়ে স্বাতি প্রশ্ন করল: নৈনি কোন্ দেবী?

বললুম: বোধ হয় নন্দা দেবী। সমগ্র কুমায়ুনে আমরা যে নন্দাদেবীর শিখর দেখে বিস্ময়ে মুগ্ধ হই, এ বোধ হয় তাঁরই মন্দির।

স্বাতি বলল: কিন্তু এই মন্দির খুব প্রাচীন নয়, আবার নতুনও মনে হচ্ছে না।

বললুম: মনে হচ্ছে, এই দেবীর নামেই এই লেক আর শহরের নাম হয়েছে নৈনিতাল।

নৈনিতালের ইতিহাসও জেনেছিলুম পরে। সওয়া শো বছর আগে এক ইংরেজ শ্যালক ও ভগিনীপতি এই অঞ্চলে শিকারে এসে এই সুন্দর স্থানটি আবিষ্কার করেছিলেন। মিস্টার ব্যাটেন ও মিস্টার ব্যারন। মিস্টার ব্যারন শাজাহানপুরে ব্যবসা করতেন। তিনি পিল্‌গ্রিম ছদ্মনামে আগ্রা আখবারে একটি প্রবন্ধ লিখে নৈনিতালের সৌন্দর্যের খবর এ দেশে প্রচার করেছিলেন।

মাঝি নিজে থেকেই আমাদের বলল যে এখানে আরও একটি মন্দির আছে। সে হল পাষাণ দেবীর মন্দির। সে জায়গা আমরা ছাড়িয়ে এসেছি। লেকের জল সেখানে প্রায় পাঁচ শো ফুট গভীর।

স্বাতি একটা অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি কোন কথা বললুম না।

মাঝির কাছে আমরা একটা পুরনো গল্প শুনলুম। ১৮৮০ সনের গল্প। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাকি দু দিনে এখানে তেত্রিশ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে। তার ফলে সকালের দিকে এই লেকের উত্তর কোণায় খানিকটা পাহাড় ভেঙে পড়ে কিছু লোকজন চাপা পড়ে। তাদের

উদ্ধার করতে আসে সেনাদল। সেই সময় উপরের সমস্ত পাহাড়টা ভেঙে পড়ে সবাইকে চাপা দেয়। লোকজন ও সেনাদলের সঙ্গে একটা গোটা হোটেল ও লাইব্রেরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

তখন আমরা মন্দিরের ঘাটে পৌঁছে গিয়েছিলুম। স্বাতি নৌকো ঘাটে লাগাতে বলল। তার পরে আমার দিকে চেয়ে বলল : নৌকোর আর দরকার আছে কি ? এখান থেকে তো আমরা হেঁটেই মল্লিতালে যেতে পারব !

বললুম : সবই তো কাছেই দেখছি।

নৌকো থেকে নেমে স্বাতি মাঝির পয়সা মিটিয়ে দিল। এখানে দু রকমে নৌকো ভাড়া হয়। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গার ভাড়া ঠিক করা আছে, আবার ঘণ্টা হিসেবেও নৌকো নেওয়া যায়। স্বাতি কিছু বেশি মজুরি দিল বলেই বোধ হয় মাঝি অপেক্ষা করতে চাইল। তার উত্তরে স্বাতি বলল : এখান থেকে আমরা হেঁটে ফিরব।

মন্দিরে আমরা নৈনি দেবীর দর্শন পেলুম। শুনলুম যে শরৎকালে এখানে দুর্গাপূজো হয় ধূমধাম করে। বাঙালীরাই উদ্যোগী। রানীখেতেও তারা দুর্গোৎসব করে।

হঠাৎ স্বাতি আমার হাত টেনে ধরল। চমকে তার মুখের দিকে তাকাতেই সে তার ঠোঁটের উপরে তর্জনি চেপে ধরল, মুখে কিছুই বলল না। আমি তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে নিজেও কৌতূহলী হয়ে উঠলুম। আমার কৌতূহল লক্ষ্য করে স্বাতি চাপা গলায় বলল : একটু সরে এসো।

বলে আমাকে খানিকটা আড়ালে টেনে নিয়ে এল।

এই অন্তরালে অদৃশ্য থেকে আমরা সবই লক্ষ্য করতে পারব, আর আমাদের কথাবার্তাও বোধ হয় শোনা যাবে না। তাই আমি স্বাতির মতো চাপা গলায় প্রশ্ন করলুম : মেয়েটা কে বল তো ?

স্বাতি বলল : কাল রাতে রানীখেতের সব্জি বাজারে দেখেছিলাম তিতি বৌদির সঙ্গে। আজ আমাদের সঙ্গেই এসেছে।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম : আমি একে লক্ষ্য করি নি তো!

স্বাতি বলল : সামনে এগোচ্ছিল না।

ভাল করে লক্ষ্য করে বললুম : সন্তুকে কেমন বোকা-বোকা দেখাচ্ছে দেখছ!

আমার মন্তব্য শুনে স্বাতি হাসল।

হাসলে যে?

হাসি মুখেই স্বাতি উত্তর দিল : ছেলেরা প্রেমে পড়লে ঐ রকমই দেখায়।

আর মেয়েদের কী রকম দেখায়?

দেখছ না মেয়েটাকে?

দেখছি।

কী দেখছ?

বললুম : কথক নাচ তো নয়, যেন কথাকলির নাচ নাচছে।

স্বাতি বলল : একেবারে বাজে কথা। খুব স্বাভাবিক দেখাচ্ছে মেয়েটাকে।

মানে সন্তুর ভাবগতিক এখনও বুঝতে পারে নি মনে করছ! তা মোটেই নয়। বুঝতে পেরেই স্বাভাবিক আছে দেখাবার ভান করছে। এরই নাম অভিনয়। ভদ্র ভাষায় একেই বলে কথাকলি। মুখোস-পরা নাচ।

স্বাতি বলল : তুমি খুব সেকেলে লোক। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় যে কালিদাসের কাল তুমি এখনও অতিক্রম করতে পারো নি।

মানে?

মানে এই যে তোমার নিজের কালটা এখনও তোমার কাছে অজ্ঞাত আছে। তোমার সঙ্গী সাথীদের দিকে মনোযোগ না দিয়ে তুমি পুরনো পুঁথি পত্তরের পাতাতেই তোমার দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেছিলে।

বললুম ঃ এ কথার প্রতিবাদ করব না।

সত্যি কথা তো, প্রতিবাদের কিছু নেই। আর সেই জন্যে এ যুগের ছেলেমেয়েদের আচার আচরণ তোমার অজ্ঞাত। অথচ—

বল।

সন্তু তোমার চেয়ে কি খুব বেশি ছোট? না ঐ মেয়েটা—

থামো থামো।

বলে আমি তাকে থামিয়ে দিলুম।

স্বাতি প্রথমে চারি ধারটা দেখে নিল। কোনও দিকে কিছু দেখতে না পেয়ে বলল ঃ কী হল?

বললুম ঃ তোমার কথা মেনে নিলে এ কথাও মানতে হয় যে এ যুগের ছেলেরা প্রেমে পড়লে ঐ রকম বোকা-বোকা দেখায়।

স্বাতি প্রথমটায় আশ্চর্য হল, তার পরে হেসে বলল ঃ আমাকে প্যাঁচে ফেলে জিততে চাইছ। তার উত্তরে বলব যে সন্তুও ঠিক এ কালের ছেলে নয়। ও তোমারই মতো সেকেলে। তা না হলে এই সুন্দর শহরে এত নিরিবিলি জায়গা থাকতে তোমার মতো মন্দিরে এসে ঢুকত না।

আমি বললুম ঃ ও এই জায়গাটাই নিরাপদ ভাবছে। কেউ এসে পড়লেও ওরা লজ্জা পাবে না।

লজ্জা পায় কিনা দেখবে?

সে কি, তুমি ওদের বিব্রত করবে ভাবছ!

স্বাতি হেসে বলল ঃ না।

বললুম ঃ তবে পরে ওকে একটা কথা জিজ্ঞেস কোরো।

কী কথা?

ভোর বেলায় ও লেপ ধরে টানাটানি করেছিল কার? তিতি বৌদির, না ঐ মেয়েটার?

এমন অসভ্যের মতো—

সন্তুই তো এ কথা বলেছে।

ওদের দিকেও আমরা নজর রেখেছিলুম। নৈনি দেবীকে প্রণাম করে ওরা লেকের দিকে এগিয়ে গেল। ঘাটের গেট পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নিচে জলের ধারে। বোধ হয় ঐখেনে তারা বসবে। সুন্দর জায়গা। নিরিবিলিও। সামনে সুদূর বিস্তৃত জলরাশি। সূর্য এখন মাথার উপরে উঠছে। তার রৌদ্র কিরণ পড়েছে জলের উপরে, ঝিকমিক করছে ছোট ছোট ঢেউএর মাথায়। ঘাটে যারা স্নান করছে, তারা লক্ষ্য করছে না কাউকে। শুধু আমরাই তাদের লক্ষ্য করছি।

স্বাতি বলল ঃ এসো।

সন্তদের কাছে নয়। আমরা বেরিয়ে এলুম মন্দির থেকে।

১১

মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা ফ্ল্যাট্‌স্‌এ এলুম। ফ্ল্যাট্‌স্‌ হল নৈনিতালের খেলার মাঠ। সব রকমের খেলা হয় এইখানে। এরই নিকটে দেখলুম ঘোড়ার আড্ডা। বড় বড় ঘোড়া নিয়ে ঘোড়াওয়ালারা দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীর অপেক্ষায়। চীনা পীকে উঠতে হলে ঘোড়া চাই। টিফিন টপে যেতে হলেও ঘোড়ার দরকার। টিফিন টপেই আছে ডরোথি'স সীট, সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচুতে। সেখান থেকে শের-কা ডাণ্ডা পাহাড়ের সব ঘর বাড়ি দেখা যায়। আরও খানিকটা এগিয়ে পথের শেষ হয়েছে ল্যাণ্ডস্‌ এণ্ডে। সেখান থেকে খুরপাতাল আর পাহাড়ের গায়ে চাষের দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়। কিন্তু আমরা এ সব দিকে গেলুম না। স্বাতি বলল : এই দিকটায় খানিকটা ঘুরে শহরের সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করে নেওয়া যাক।

আমরা তাই উপরের দিকে কিছুটা উঠলুম। বড় বড় দোকান পাট ও বাজার দেখলুম। মিউনিসিপাল মার্কেট এই দিকে। সিনেমা হাউস আছে। রয়াল ও মেট্রোপোল নামে দুটি বিলিতি হোটেল। গ্র্যাণ্ড হোটেল ফ্ল্যাট্‌স্‌ থেকে তল্লিতালে যাবার পথে। এই পথে আরও কয়েকটি বড় হোটেল আছে, দুটো সিনেমা হাউস, লাইব্রেরি, নৈনিতাল বোটহাউস ফ্ল্যাট্‌স্‌এর পাশে।

আমাদের দলের দু একজনকে আমরা দোকানের ভিতরে দেখেছিলুম। কেউ উল দেখছিলেন, কেউ মেয়েদের গরম স্টোল। পাহাড়ী শহরে গরম কাপড় সস্তা কিনা, এই বোধ হয় যাচাই করে দেখছিলেন। আমরা তাঁদের বিরক্ত করি নি।

এক সময়ে স্বাতি বলল : এই বারে ফেরার সময় হয়েছে।

পথে আর নিজের ছায়া দেখতে পাচ্ছি না, ছোট ছায়া পায়ের সঙ্গে যেন মিশে যাচ্ছে। তাই দেখে বললুম : চল।

স্বাতি বলল: এই দিকটা পরিচ্ছন্ন বেশি। এই দিকেই আমাদের খেয়ে নিতে হবে।

বললুম: তার পরে আর হাঁটতে পারব না।

স্বাতি বলল: ভয় নেই, রিক্সা পাওয়া যাবে।

নৈনিতালে দু রকম রিক্সাই আছে। পাহাড়ে ওঠার জন্যে মানুষ টানা রিক্সা, দুজনে টানে আর পেছন থেকে ঠেলে আর দুজনে। তল্লিতাল আর মল্লিতালের মধ্যে সমতল রাস্তায় প্রচুর সাইকেল রিক্সাও চলাচল করে দেখেছি। কাজেই স্বাতির কথা মেনে নিলুম।

একটা পছন্দমতো রেস্তোরাঁর সামনেই সে এই প্রস্তাব করেছিল। আমি রাজী হতেই থমকে দাঁড়াল, বলল: এসো।

খাবার ব্যাপারে আমি খুঁতখুঁতে নই। তবু স্বাতি বলল: ঝোল-ঝালেব চেয়ে তোমার বোধ হয় শুকনো খাবারই ভাল লাগবে।

তার কথায় আমি শুধু হাসলুম।

স্বাতি বলল: রুমালি রোটি বোধ হয় পাওয়া যাবে না!

বললুম: সে আবার কী বস্তু?

খাওনি কখনও? রুমালেব মতো পাতলা ভাঁজ-করা রুটি।

বেয়ারাকে স্বাতি রুটি আর রোস্ট দিতে বলল। রোস্ট মুরগির হলেই ভাল, আর রুটি তন্দুরি বা ম্যাড্রাসি না হলে ফুল্‌কা, চাপাতি নয়।

খেয়েদেয়ে একটা রিক্সা ধরে আমরা তল্লিতালে ফিরে এলুম। স্বাতি খানিকটা আগেই নেমে পড়ে বলল: এইখানে লুকিয়ে থেকে একটু মজা দেখা যাক।

বললুম: সন্তুদের কথা এখনও ভুলতে পারো নি দেখছি।

এ কথার উত্তর না দিয়ে স্বাতি বলল: ওরা ফিরেছে কিনা তুমি একবার এগিয়ে দেখে এসো।

বললুম: ওরা নিশ্চয়ই শেষ মুহূর্তে ফিরবে।

বলতে না বলতেই দেখলুম যে একখানা সাইকেল রিক্সায় চেপে সেই মেয়েটি ফিরছে। স্বাতি হাতের ইসারায় তাকে নামিয়ে নিল। বলল : এসো, এইটুকু পথ আমরা হেঁটেই ফিরব।

আমার দিকে চেয়ে বলল : তুমি এইখানেই থাক।

মেয়েটি নেমে রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে দিতেই স্বাতি তাকে জিজ্ঞাসা করল : তোমার নামটি কী ভাই ?

মিমি।

বেশ মিষ্টি নাম তো! তিতি বৌদি—

আমার দিদি।

দুজনে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। তবু আমি স্বাতির পরের প্রশ্ন শুনতে পেলুম। সে জিজ্ঞাসা করল : সন্তুকে কোথায় ফেলে এলে ?

কিন্তু মিমির উত্তর আমি শুনতে পেলুম না। পিছন থেকে তার কোনও ভাবান্তরও বুঝতে পারলুম না।

আমি বুঝতে পেরেছি যে স্বাতি আমাকে সন্তুর জন্যে অপেক্ষা করতে বলে গেছে। তাই আরও অনেককে রিক্সায় করে ফিরতে দেখেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। হঠাৎ তাকে অনেকটা দূরে দেখতে পেলুম। হন হন করে সে একা হেঁটে আসছে।

কাছে আসতেই বললুম : আরে সন্তু যে!

আর দাদা বলবেন না! এমন উঁচু জানলে —

চীনা পীক ?

হ্যাঁ দাদা, সব পণ্ডশ্রম! কী কুক্ষণে আজ বেরিয়েছিলুম!

তাই বুঝি চোখ মুখ এমন শুকনো ?

সন্তু আমার সঙ্গে এগোতে এগোতে বলল : এখন হাত পা ধুয়ে দুটো খেয়ে নিতে পারলে—

বললুম : মিমিকেও কিছু খেতে দাও নি নাকি ?

ভূত দেখার মতো সন্তু চমকে উঠল।

বললুম: ব্রাদার, আমার কাছে একাদশী বৈরাগী সেজে থেকো না, আমি তোমার সিনিয়ার। দরকার হলে সাহায্য নিও।

না, হ্যাঁ—

না কিছুই নয়, সব হ্যাঁ। সত্যিই যদি খাবার সময় পেয়ে না থাকো তো খালি পেটে বাসে উঠো না, গা ঘুলোবে। তোমার লজ্জা করে, মিমির ব্যবস্থা আমি করে দেব।

বাসেব কাছাকাছি আমরা পৌঁছে গিয়েছিলুম। সন্তু আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। বলল: আমরা খেয়ে নিয়েছি গোপালদা। কিন্তু এ সব কথা আর কাউকে বলবেন না।

হেসে বললুম: আচ্ছা।

সময়েব দিকে নজর সবার নেই, তাই দুটোয় বাস ছাড়ল না। সবাইকে খুঁজে পেতে বাসে তুলতে সন্তুব আরও কিছু সময় লেগে গেল। আমার দিকে একবার করুণ চোখে তাকিয়ে বলল: এইবারে সোজা ভীমতালে যাচ্ছি গোপালদা।

আগের মতো ড্রাইভারের পাশেই আমরা বসেছিলুম। বললুম: এখান থেকে চোদ্দ মাইল পথ, আবার রানীখেতেও ফিরতে হবে। কাজেই সময় নষ্ট করলে চলবে না।

না গোপালদা, আর সময় নষ্ট হবে না।

বলে সে নিজে এমন জায়গায় বসল যেখান থেকে মিমিকে সরাসরি দেখা যায়।

বাস ছাড়বার পরে স্বাতি আমাকে বলল: অনেক দিন থেকেই মেয়েটা ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে। অথচ আশ্চর্য, ওর দিদি এখনও কিছু জানে না।

সে কি!

ও নিজের বরকে নিয়েই ব্যস্ত আছে। বোনকে সবার সঙ্গে

চীনা পীকে উঠতে বলে ওরা স্নো ভিউএ নাকি বরফ দেখতে গিয়েছিল। বেশি হাঁটতে পারে না ওরা।

এখন আমরা ভাওয়ালির দিকে চলেছি। ভাওয়ালি এখান থেকে সাত মাইল পথ। আরও অনেক খবর সংগ্রহ করেছি মোটর ট্রান্সপোর্ট অফিস থেকে। সকালে বেরোলে আরও দুটো সুন্দর জায়গা আমরা এই পথেই দেখতে পারতুম। সাততাল আর নৌকুচিয়াতাল। ভাওয়ালি থেকে ভীমতালের পথে আড়াই মাইল যাবার পরে গাড়ি থেকে নামতে হয়। তার পরে হাঁটা পথে যেতে হয় সাড়ে তিন মাইল। অপরূপ পরিবেশের মাঝে সাতটি জলাশয়ের সমষ্টি এই সাততাল।

তার পবে ভীমতাল। আর নৌকুচিয়াতাল সেখান থেকে আড়াই মাইল দূরে। জলাশয় একটি, কিন্তু তার নটি কোণ। লোকে মাছ ধরতে আর হাঁস শিকার করতে যায় সেখানে।

রামগড় আর মুক্তেশ্বরের খবরও নিয়েছি। ভাওয়ালি থেকে রামগড় আট মাইল আর মুক্তেশ্বর আরও সতেরো মাইল দূরে।

কিন্তু আমার মনোযোগ তখন বাসের ভিতরের কলরবের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে যারা চীনা পীকে উঠেছিলেন, তাঁরা গালাগালি দিচ্ছিলেন সরকারী ব্যবস্থাকে। পাহাড়ের উপরে নিশান ওড়াবার ব্যবস্থাটা নিচে কেন জানানো হয় না, এই তাঁদের অভিযোগ। নিশান উড়তে দেখে উপরে উঠেও নাকি বিফল মনোরথ হতে হয়। সব কিছু মেঘে ঢেকে যেতে সময় অল্পই লাগে। আমি লক্ষ্য করলুম, সন্তু বা মিমি এ প্রসঙ্গে একটি কথাও বলল না।

আমরা একুই পথে ভাওয়ালি ফিরছি। আর পাহাড়ে বেড়াবার কথাই আমার মনে পড়ছে। কাশ্মীরে যাবার আগে আমরা কাঙড়া উপত্যকায় গিয়েছিলুম। কিন্তু চাম্বা উপত্যকায় যাবার সময় হয় নি। কাশ্মীরে যাবার জন্যে আমরা এমনি ব্যস্ত হয়েছিলুম যে কুলু

উপত্যকায়ও আমরা যেতে পারি নি। তা ছাড়া ভয়ও ছিল খানিকটা।

চাম্বা উপত্যকায় ডালহৌসি হল সব চেয়ে বড় শহর। পাঠানকোট থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। বাস ও ট্রাকের জন্য ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক, মানে এক সময়ে এক ধার থেকেই গাড়ি চলে। অবশ্য জীপ ট্যাক্সি বা প্রাইভেট কারের জন্যে এই নিষেধ নেই। এই পথে ডুনেরা একটি উল্লেখযোগ্য জায়গা। পাঠানকোট থেকে যে বাস ছাড়ে ভোর পৌনে পাঁচটায়, আটাশ মাইল পথ অতিক্রম করে সাড়ে ছটায় তা ডুনেরায় পৌছয়। আর উপরে ডালহৌসি থেকে যে বাস পাঁচটায় ছাড়ে, তাও ডুনেরা পৌছয় সাড়ে ছটায়। আধ ঘণ্টা দাঁড়াবার পর দু দিকের বাসই ছেড়ে যায়।

চাম্বার যাত্রীদের কাছে আর একটি জায়গা স্মরণীয়। তার নাম বানিখেত, কুমায়ুন পাহাড়ের রানীখেত নয়। ডালহৌসি পৌছতে পাঁচ মাইল বাকি থাকতেই এই বানিখেতে সব বাস দাঁড়ায়। ফেরার বাসও তাই। ডালহৌসি থেকে বানিখেত পৌছতে মাত্র পনর মিনিট সময় লাগে। এই বানিখেত থেকেই চাম্বার পথ শুরু হয়েছে।

চাম্বা যাবার আরও একটি পথ আছে, সে ডালহৌসি থেকে কালাটপ খাজিয়ার হয়ে। দেবপ্রসাদ বলেছিল, সে পথ আরও সুন্দর আরও রমণীয় ; এমন অপরূপ পথ জীবনে কম দেখা যায়।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল : ঘুম আসছে নাকি ?

বললুম : ডালহৌসির কথা মনে পড়ছে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : ডালহৌসি তো আমরা যাই নি !

বললুম : জ্বালামুখীর বাসে দেবপ্রসাদের কাছে যা শুনেছিলুম, সেই কথা।

ধবলাধারের উপর পাঁচটি পাহাড় নিয়ে ডালহৌসি শহর। পাহাড়গুলির নাম বালুন কাথলগ পোট্রেন টেহরা ও বাক্রোটা।

অন্যান্য শৈলাবাসের মতো এই শহরটিও গোরা সৈন্যের বিশ্রামের জন্য এক শো বছর আগে গড়ে উঠেছিল। বালুন পাহাড়ে এখনও একটি বড় ছাউনি আছে। পাঁচ থেকে সাত হাজার ফুট উঁচু এই পাহাড়গুলির মধ্যে বাক্রোটাই সব চেয়ে উঁচু। উত্তরে বরফ দেখা যায়, আবার দক্ষিণের সমতল ক্ষেত্রও দেখা যায়। লোকে বলে, পরিষ্কার দিনে নাকি ইরাবতী শতদ্রু ও বিপাশার ধারাও দেখা যায়। ইরাবতী এই উপত্যকার নদী। কিন্তু বিপাশা কুলু উপত্যকায়। আর শতদ্রু এই অঞ্চলের নদী কিনা আমার মনে পড়ছে না।

স্বাতি বলল: বালক রবীন্দ্রনাথ শুনেছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ডালহৌসিতে বেড়াতে এসেছিলেন।

বললুম: তাঁরা স্নোডন নামে একটি বাংলোয় ছিলেন। বাক্রোটা পাহাড়ের সব চেয়ে উঁচু জায়গায় এই বাংলোটি। তাঁদের নাম আজও সেখানে আছে। বেড়াবার সব চেয়ে ভাল রাস্তাটির নাম হল টেগোর রোড।

মনে পড়ল, পুত্র জওহরলালকে নিয়ে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুও এখানে এসেছিলেন। আর এসেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অল্প দিন আগে অসুস্থ নেতাজী স্বাস্থ্যোদ্ধারে এসেছিলেন এই পাহাড়ে। এখানকার সুভাষচক আড্ডার একটি মনোরম জায়গা। অনেকগুলি পথ এসে এখানে মিলেছে। এক পাশে রিডিং রুম কন্‌ভেন্ট দোকান হাট বাজার। বসবার জন্যে অনেক বেঞ্চ। কাথলগ পাহাড়ে কাছারি হাসপাতাল রামমন্দির ধর্মশালা শিখদের গুরুদ্বার। সুভাষচক থেকেই সেই পথ বেরিয়েছে।

এই অঞ্চলের আরও কয়েকটি জায়গার নাম আমি দেবপ্রসাদের কাছে শুনেছিলুম। কালাটপ মাইল পাঁচেক দূরে, ডাইন কুণ্ড আট মাইল এবং চাম্বার পথে খাজিয়ার বারো মাইল। ডালহৌসির লক্কর মণ্ডি থেকে তিনটি পথ বেরিয়েছে। একটি গেছে কালাটপ, আর

একটি খাজিয়ার হয়ে চাম্বা, আর তৃতীয়টি ডাইন কুণ্ডের পাকদণ্ডী পথ। ডাইন কুণ্ড মানে ডাইনির কুণ্ড, ইংরেজীতে বলে ম্যাজিক পুল। চারি দিকের সবুজের মাঝে এই কুণ্ডে নাকি পরীদের খেলাঘর।

খাজিয়ার একটি সবুজ উপত্যকার মাঝে স্বচ্ছ জলের ছোট জলাশয়। মাঝখানে দ্বীপ আছে একটি। আর তীরে একটি মন্দির। চারি দিকের পাহাড়ে চীর আর সিডার গাছের বন। খাজিয়ারকে অনেকে দ্বিতীয় গুলমার্গ বলে। কিন্তু কাশ্মীরের গুলমার্গে এমন সরোবর ও মন্দির নেই।

চাম্বা শহরের কথাও শুনেছিলুম দেবপ্রসাদের কাছে। যে পথে তিনি গিয়েছিলেন, সে পথে চার মাইলে চার হাজার ফুট নিচে নেমে চাম্বা। ইরাবতীর তীরে এই শহর। কাছি-টানা লোহার পুল পেরিয়ে শহরে ঢুকতে হয়। পাঠানকোট থেকে বাস বানিখেতের পথেই চাম্বা যায়।

ইরাবতীর পুল পেরিয়ে খাড়া চড়াই ভেঙে অতি প্রাচীন এক তোরণের নিচে দিয়ে হরিরায়ের মন্দির। আর ডাকঘরের পাশ কাটিয়ে চাম্বার প্রধান পৌর এলাকায় এসে পেঁছিতে হয়— চাম্বা দি চৌঘানের পাশে। এই প্রাচীন সিংহদ্বারের বর্তমান নাম গান্ধী ফাটক।

শুনেছি, এই রাজ্যের এক রাজকন্যার নাম ছিল চম্পাবতী। তাঁরই অনুরোধে রাজা তাঁর প্রাচীন রাজধানী ভ্রামর থেকে এইখানে সরিয়ে আনেন। চম্পাবতী ভালবেসেছিলেন একজন ভিন্‌দেশী যুবককে। বোধ হয় বিয়েও করেছিলেন। তার পরে সেই যুবকের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। চম্পাবতীর মন্দিরে এখন দুর্গার মূর্তি। আরও অনেক মন্দির আছে চাম্বায়। লোকে রাজাদের রঙমহল দেখে, দেখে আজবঘর।

স্বাতি অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। তার পরে বলল: ভারতবর্ষের অনেক জায়গা আমাদের এখনও দেখা হয় নি। আবার কখনও ও দিকে গেলে চাম্বা উপত্যকায় আমরা ঘুরে আসব।

আমি এ কথার উত্তর দিলুম না। চাম্বা উপত্যকার আর একটি তীর্থস্থানের কথা আমার মনে পড়ে গেল। মনি মহেশের কথা। ১৮৬৫৪ ফুট উঁচু একটি গিরিশৃঙ্গের নাম মনি মহেশ। তার আকৃতি ত্রিকোণ, যেন একটি তুষারের শিবলিঙ্গ। মাঝে মাঝে পাথর দেখা যায় বলে মনে হয় বেলপাতা লেগে আছে তার গায়ে। এই শিখরের পাদদেশেই মনি মহেশ হ্রদ প্রায় চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। তার চারি ধারে বরফের পাহাড়, হ্রদের জলেও বরফ দেখতে পাওয়া যায়। এই তীর্থে যাবার পথের কথাও শুনেছি। চাম্বার পুরনো রাজধানী ভ্রামর বা ভারমোর থেকে হাঁটাপথ। চাম্বা থেকে ইরাবতীর উপত্যকা ধরে যেতে হয় ভারমোরে। কতটা বাসে যাওয়া যায়, আর হাঁটতে হয় কতটা পথ, সে খবর আমার সঠিক জানা নেই।

আমাদের বাস তখন ভাওয়ালি ছাড়িয়ে ভীমতালের পথ ধরেছে। এ আমাদের কাছে নতুন পথ। কিন্তু পার্বত্য পথের বৈচিত্র্য আমি খুঁজে পাই নে। সব পথই আমার কাছে একই রকম মনে হয়। তবু আমি পথের দিকেই চেয়ে রইলুম।

স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করল: কুমায়ুনের লোকের মধ্যে তুমি কোন বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেছ?

বললুম: কুমায়ুনের লোক আর দেখলুম কোথায়?

স্বাতি বলল: বৈচিত্র্য থাকলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতে।

এ কথার প্রতিবাদ করবার আগেই পিছনে সন্তুর গলা শুনতে পেলুম: ডান দিকে নজর রাখুন।

কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন: কেন?

সন্তু বলল: এই, এই, এই হচ্ছে সাততালে যাবার পথ। হেঁটে যেতে হয় সাততালে।

আমরা থামলুম না, সোজা এগিয়ে গেলুম ভীমতালের দিকে।

এক সময় আমাদের বাস সদর রাস্তা ছেড়ে গড়িয়ে নিচে নামল।

প্রথমটা ভয় করেছিল, তার পরেই সে ভয় কেটে যেতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলুম। গাড়ি একেবারে ভীমতাল লেকের ধারে পৌঁছে গেছে। লেকের ধার দিয়ে যে সুন্দর প্রশস্ত পথ, আমরা তারই উপরে নেমে এসেছি। বাস থামতেই আমরা নেমে পড়লুম।

পথের এক ধারে অনেকগুলি দোকান পাট। ভীমতালের বাজার এটি। অন্য ধারে সুদূর বিস্তৃত লেক। নৈনিতালের চেয়েও বড়, আর মাঝখানে একটা দ্বীপ আছে বলে আরও আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। পারের কাছে অনেকগুলো নৌকো যাত্রীর অপেক্ষা করছে, দ্বীপেও কয়েকজন যাত্রীকে দেখতে পাচ্ছি। গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছে তারা। একটি নৌকোয় চেপে জন কয়েক যাত্রী ফিরেও আসছে দেখতে পেলুম।

কিছু স্থানীয় লোক এ পারের বাঁধানো রাস্তা ধরে একটা বাঁধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। স্বাতি মিমিকে ডেকে বলল: চল ঐ দিকে।

সন্তু আমার দিকে তাকাল করুণ ভাবে। বললুম: একটু অপেক্ষা কর।

তার পরে খোঁজ নিয়ে জানলুম যে ঐ বাঁধের কাছে আছে একটি শিব মন্দির। সবাই যখন নৌকোয় ওঠবার জন্যে এগিয়ে গেল, আমি সন্তুকে নিয়ে ঐ মন্দিরের দিকেই এগিয়ে গেলুম। সন্তুর চোখে দেখলুম অপরিসীম কৃতজ্ঞতা।

১২

শিবের মন্দিরে সন্তুকে পৌঁছে দিয়ে আমি স্বাতিকে ডাকলুম। স্বাতি বোধ হয় এরই অপেক্ষা করছিল। মিমিকে বলল: তোমরা থাকো, আমরা ঐ গাঁয়ের পথে একটু ঘুরে আসি।

বলে মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এল।

সন্তুকে আমি বললুম: আমরা আর আসব না, বুঝেছ!

সন্তু যেন বোকা হয়ে গেছে। একটি কথাও বলল না।

আমরা এগিয়ে না গিয়ে ফেরার পথ ধরলুম। দেখলুম যে লেকের এক ধার দিয়ে এই বাঁধ। তারই উপর দিয়ে পথ গাঁয়ের দিকে চলে গেছে। মনে হয়, এই লেকের জল চাষের কাজে লাগানো হয়। কিংবা পানীয় জল সরবরাহ হয় কোনখানে। শুনলুম যে একটা পায়ে চলা পথ এখান থেকে কাঠগোদামেও গেছে। সে পথে কাঠগোদাম খুব কাছে।

নৌকোর ঘাটে এসে স্বাতি বলল: এসো, আমরাও একটু ঘুরে আসি ঐ দ্বীপে।

বললুম: চল।

নৌকোয় বসে আমার চার চিনারের কথা মনে পড়ল। চার চিনার কাশ্মীরের ডাল লেকের মাঝখানে এই রকমেরই একটি দ্বীপ। ডাল লেকে এলে ঐ দ্বীপেও একবার যেতে হয়। এখানেও সেই রীতি। তবে এখানে দ্বীপ খুব কাছে, চার চিনারের মতো সুদূরে অবস্থিত নয়।

স্বাতি বলল: দ্বীপে তো কেউ মাছ ধরছে না?

বললুম: বোধ হয় পারমিটের দরকার। যারা এখানে থাকতে আসে, তাদের পক্ষেই মাছ ধরা সম্ভব।

মাঝি ঘাটে নৌকো ভেড়াতে যাচ্ছিল। স্বাতি বলল: না,

নৌকো থেকে আমরা নামব না। চারি ধারটা ভাল করে দেখে ফিরে যাব।

মাঝি তৎপর ভাবে নৌকোর মুখ ফিরিয়ে দ্বীপটি প্রদক্ষিণ করে অন্য ধারে গেল। স্বাতি বলল: কাশ্মীরের পরে কুমায়ুনেই এই রকমের লেক দেখতে পাচ্ছি।

বললুম: চাম্বা উপত্যকার খাজিয়ারেও এই রকম লেক আর দ্বীপ আছে।

কিন্তু কাঙ্গড়ায় নেই তো!

কাঙ্গড়া উপত্যকার কথা আমার মনে পড়ে গেল। পাঠানকোট থেকে কাঙ্গড়া জ্বালামুখী ধরমশালা পালমপুর বৈজনাথ যোগীন্দ্রনগর। সর্বত্রই পাহাড়, লেক কোনখানে দেখি নি। বললুম: আমরা দেখি নি।

স্বাতি বলল: থাকলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম।

পাঠানকোট থেকে আমরা বৈজনাথের বাসে উঠে কাঙ্গড়ায় নেমেছিলুম। কাঙ্গড়া উপত্যকায় এই নামের একটা ছোট শহরও আছে। আগে তার নাম ছিল নগরকোট। একটি মন্দিরের জন্যে ইতিহাসে এই স্থান বিখ্যাত হয়ে আছে। গজনীর সুলতান মামুদের ভারতে রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনা ছিল না। তিনি বারে বারে এ দেশে ধন সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য এসেছিলেন। এই নগরকোটও তাঁর হাত থেকে রক্ষা পায় নি। একাদশ শতাব্দীর প্রথমেই আনন্দপালকে যুদ্ধে পরাজিত করে সুলতান মামুদ কাঙ্গড়ার মন্দির লুঠ করেছিলেন। পেয়েছিলেন সাত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, সাত শো মন সোনা ও রূপার বাসন। বিশুদ্ধ সোনা দু শো মন ও রূপা দু হাজার মন, আর হীরা-মুক্তা মণি-মাণিক্য মাত্র কুড়ি মন। কাঙ্গড়ার সম্পদের লোভে এখানে ফিরোজ তুঘলক এসেছিলেন, এসেছিলেন খোঁড়া তৈমুরলঙ্গও।

এখন আর কাঙ্গড়ায় কোনও সম্পদ নেই। লোকে এখন শুধু

বজ্রেশ্বরীর মন্দির দেখে, আর সময় থাকলে দেখে কাঙ্গড়াকোট। কোট মানে দুর্গ। পাতাল ও বাণগঙ্গার মাঝখানে যে দোয়াব, তারই উপরে দুর্গ। দুর্গের ভিতরে যে সব সুন্দর বাড়ি ছিল, উনিশ শো পাঁচ সালের ভূমিকম্পে তার অনেকগুলিই ভেঙে পড়েছে। ভিতরের মন্দিরটি ধ্বংস করে গেছেন সুলতান মামুদ।' রাজার প্রাসাদ আর কোষাগারও ছিল ভিতরে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : তুমি কি কাঙ্গড়ার কথা ভাবছ ?

বললুম : কোনও জলাশয় না দেখলেও প্রকৃতির এমন শোভা আর কোথাও দেখি নি।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : সেই দৃশ্যটি তোমার মনে পড়ছে না! পাহাড়ের ওপর একটা জায়গা থেকে বজ্রেশ্বরীর মন্দির দেখেছিলুম—মনে হয়েছিল যেন মন্দির মিলিয়ে আছে ধবলাধারের কোলে, মন্দিরের পিছনেই যেন সেই বরফের পাহাড়।

ঠিক কেদারনাথের মতো ?

না। ধবলাধারের গায়ে তখন বরফ জমে ছিল না। সাদা নীল আর গৈরিকে যেন তপস্বীর বৈরাগ্য। লঘু মেঘ উত্তরীয়ের মতো জড়িয়ে ছিল।

মনে আছে, মন্দিরের দ্বার পেরিয়ে প্রথমে একটি চতুষ্কোণ মন্দির। উপরে গম্বুজ। তার পরে আর দুটি গম্বুজওয়ালা মন্দির, সূর্য কিরণে সাদা ধব ধব করছে। সকলের শেষের মন্দিরের উঁচু শিখর ধবলাধারের দেহের একাংশ আড়াল করেছে। কাঙ্গড়া উপত্যকার কিছু অংশ দেখা যাচ্ছিল দু পাশে।

কিন্তু কাঙ্গড়া আমরা প্রথমে দেখি নি। দেখেছিলুম জ্বালামুখী থেকে ফেরার পথে। অভিজ্ঞতার অভাবে আমরা অনেকবার বাস বদল করেছিলুম। তার জন্যে কিছু অসুবিধাও হয়েছিল। এ অঞ্চল দেখতে হলে প্রথমে ধর্মশালায় যাওয়া উচিত, ধর্মশালা থেকে

জ্বালামুখী, ফেরার পথে কাঙ্গড়া, আর কাঙ্গড়া থেকে বৈজনাথ। পাঠানকোট থেকে ধরমশালার বাস ছাড়ে। আর জ্বালামুখীর বাস পাওয়া যায় ধরমশালায়। আগে ভাগে এসে পছন্দ মতো জায়গা দখল করা যায় খালি বাসে।

পাঠানকোট থেকে বাস ছেড়ে উনিশ মাইল দূরে নূরপুরে প্রথম দাঁড়ায়। চলতি বাস থেকে একটা প্রাচীন দুর্গ দেখা যায় প্রায় হাজার বছর আগে রাজা বসুর তৈরি দুর্গ। প্রায় দু শো বছর আগে এক দুর্ভিক্ষের সময় কাশ্মীর থেকে অনেকে এখানে পালিয়ে এসে বসবাস করছে। তারা এখন উলের শাল তৈরি করে।

নূরপুর থেকে একুশ মাইল দূরে শাহপুর, আর এখান থেকে আরও আট মাইল এগিয়ে গগ্‌গল নামে আর একটি লোকালয়। এখান থেকে আট মাইল উত্তরে ধরমশালা, আর কাঙ্গড়া শহর মাত্র তিন মাইল দক্ষিণে। ধবলাধার শ্রেণীর দক্ষিণে কাঙ্গড়া উপত্যকার পথ। উত্তরে চাম্বা উপত্যকায় যেতে হলে প্রায় পাঠানকোট পর্যন্তই ফিরে যেতে হবে।

আমাদের নৌকো তখন দ্বীপ ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। স্বাতি মাঝিকে বলল: আর বেশি দূর এগিয়ো না, সময় মতো আমাদের ফিরতে হবে তো।

মাঝি কোনও উত্তর না দিয়ে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে নিল।

এতক্ষণ আমরা পাহাড়ের গায়ে একটি দুটি ঘর বাড়ি দেখতে পাচ্ছিলুম দূরে দূরে। এখন ভীমতালের সদর রাস্তার উপরে ঘন লোকালয় দেখতে পাচ্ছি দ্বীপের পরপারে। মাথার উপরে প্রসন্ন রৌদ্র, কিন্তু তাতে উত্তাপ নেই। লেকের স্নিগ্ধ বাতাসে শরীর ও মন জুড়িয়ে যাচ্ছে।

স্বাতি বলল: এক জায়গার সঙ্গে আর এক জায়গার তুলনা করা উচিত নয়।

কেন?

সব জায়গারই নিজস্ব একটা রূপ আছে, আকর্ষণও আছে। সব জায়গা যদি একই রকম হত, তা হলে এমন ভালোও লাগত না।

হেসে বললুম : খুব খাঁটি কথা। সব মেয়ে যদি স্বাতির মতো হত, তাহলে স্বাতিকেও এমন—

স্বাতির চোখের দিকে চেয়ে আমি থেমে গেলুম।

স্বাতি বলল : কথাটা সবার বেলাতেই খাটে।

তার পর অনেকক্ষণ আর কথা কইল না।

আমার মন এক সময় জ্বালামুখী পোঁছে গেল। জ্বালামুখীর পথ তত মসৃণ নয়, বাসও নয় আরামদায়ক। আর মন্দির পাহাড়ের উপরে, নিচে থেকে দেখা যায় না। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে বড় ধর্মশালা আছে, রাত্রিবাসের ব্যবস্থা ভাল।

জ্বালামুখী একটি পীঠস্থান। এই পাহাড়ের উপরে সতীর জিহ্বা পড়েছিল। দেবী জ্বালামুখী ও শিবের নাম উন্মত্ত ভৈরব। পাহাড় খুব উঁচু নয়, মন্দিরের শিখরও নয় উঁচু। তেমন প্রাচীন বলেও মনে হয় নি। মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরের চূড়া সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন। ভিতরে চারি দিকের দেওয়ালে অনেক জায়গায় আগুন জ্বলছে। নিবিয়ে দিলেও আবার জ্বলে উঠছে। মন্দিরের মাঝখানে একটা ছোট কুণ্ড। তারও চারি ধারে আগুন জ্বলছে। জলেও আগুন। কোনও মূর্তি নেই, কোনও চিত্র নেই, কোনও ঘট মঙ্গল কলসও নেই। এই অগ্নিশিখাই দেবী, এই অগ্নিশিখাকেই প্রণাম করছে যাত্রীরা। পাহাড়ের গায়ে ছায়াচ্ছন্ন নির্জন পরিবেশে একটা গম্ভীর ভাবে মন পূর্ণ হয়ে যায়।

দ্বীপের কাছাকাছি এসে দেখলুম যে দ্বীপে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও এখন ফিরবার জন্যে নৌকোয় উঠছেন। স্বাতি এতক্ষণ নিঃশব্দেই বসেছিল। হঠাৎ বলে উঠল : তোমার স্মৃতিশক্তি বোধ হয় কমে আসছে।

কোন দিন বেশি ছিল কি ?

স্বাতি এ কথার জবাব না দিয়ে বলল: ধরমশালার কাছেও একটা ডাল লেক আছে বলে শুনেছিলাম, সে কথা তোমার মনে পড়ছে না !

বললুম : সে লেক দেখি নি বলেই মনে পড়ে নি।

সত্যিই আমরা ধরমশালায় গিয়ে বিশেষ কিছুই দেখি নি। ধরমশালায় পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। ইলশেগুঁড়ির মতো ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছিল। এই বৃষ্টির মধ্যেই আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে নেমেছিলুম। বাজারের উপরেই বাস স্ট্যাণ্ড, নিকটেই সব দোকান পাট। রেস্ট হাউসে জায়গা না পেয়ে আমরা টুরিস্ট বাংলোয় উঠেছিলুম একটা ছোট পাহাড়ের উপরে।

এ জায়গার নাম লোয়ার ধরমশালা। বাজার হাট সরকারী দপ্তর সব এখানেই। সাড়ে পাঁচ মাইল উপরে আপার ধরমশালা। প্রথমে কোর্ট কাছারি, তার পরে ম্যাকলিওড গঞ্জ, ধরমশালা ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট। সকলের শেষে ডাল লেক।

এই ডাল লেকের কথা আমরা এক ভদ্রলোকের মুখে শুনেছিলুম। তিনি বলেছিলেন, নামেই ডাল লেক, আসলে একটা পুকুর, বর্ষায় জল জমে। তার চেয়ে ভগ্‌মুনাথ নাকি ভাল। সেটি একটি গরম জলের কুণ্ড, আর সেখানে ভগ্‌মুনাথের প্রাচীন মন্দির। ম্যাকলিওড গঞ্জের বাজার থেকেই হেঁটে যেতে হয়।

ধীরে ধীরে আমরা তীরের দিকে ফিরে আসছিলুম। স্বাতি বলল: বৈজনাথের নদীটি আমার খুব ভাল লেগেছিল। আর মন্দিরটিও।

বৈজনাথের কথা আমি ভুলি নি, ভুলব না। বৈজনাথেই আমাদের হিমাচল ভ্রমণ শেষ হয়েছিল। কাঙ্গড়ার বাস বদল করে আমরা বৈজনাথের বাস ধরেছিলুম। কাঙ্গড়া উপত্যকার প্রশস্ত পথ ধরে পাহাড়ী শহর পালমপুরের উপর দিয়ে বৈজনাথে গিয়েছিলুম। উত্তরে উত্তুঙ্গ ধবলাধার। পাহাড়ের গায়ে বরফ

নেই বলে দু ধারের শস্য ক্ষেত্রের শ্যামলিমার সঙ্গে অবাধে মিলে গেছে।

গগ্‌গলের চৌরাস্তা থেকে পালমপুর চব্বিশ মাইল দূরে, চার হাজার ফুট উঁচু। দু ধারে চা বাগান। পথের ধারে কখন ছোট লাইনের ট্রেন দেখা যেত, আর রেলের একটা রেস্ট হাউস। পরিচ্ছন্ন শহর। এই ছোট লাইন এখন নাকি উঠে গেছে।

বৈজনাথ এখান থেকে এগারো মাইল, উঁচুতে প্রায় সমান। বাস স্ট্যাণ্ডে নেমে আমরা একটা টিলার উপরে ডাক বাংলোয় আশ্রয় নিয়েছিলুম। তারই বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেঘের গর্জনের মতো একটা ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলুম। একটানা অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি। সামনে ধবলাধারের নগ্ন দেহ। বরফ গলে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু সৌন্দর্যের শেষ হয় নি। তরুলতা গুল্মহীন পাহাড়ের তপোমগ্ন সন্ন্যাসীর মতো রূপ। শীতে বরফ সাদা হয়ে গেলে আমরা অন্য রূপ দেখব।

ডাক বাংলোর সীমানায় গিয়ে দেখেছিলুম প্রকৃতির আর এক রূপ। এক চঞ্চল স্রোতস্বিনী কলধ্বনি তুলে খাদের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে। তারই শব্দ মেঘের গর্জনের মতো নিচে থেকে উপরে উঠে আসছে।

বৈজনাথ পাহাড় এখানে বৃত্তাকারে ঘুরে গেছে। শহরের পিছনটা আমরা দেখতে পেয়েছিলুম। মন্দিরের চূড়াও দেখা যাচ্ছিল। এ মন্দির খুব দূরে নয়। বাজারের বড় রাস্তা থেকে ধাপে ধাপে নিচে নেমে মন্দিরের দরজায় পৌঁছতে হয়। দরজার পাশেই গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি। মন্দিরের সামনে একটি মণ্ডপ। এক নজরে উড়িষ্যার মন্দির বলে মনে হয়েছিল। কারুকার্যময় মন্দির গাত্রে প্রাচীন যুগের গাম্ভীর্য লেগে আছে।

বৈজনাথ বৈদ্যনাথ শিব। ভারতের সর্বত্র তাঁর একই রূপ। একই রকম আকর্ষণ তাঁর। এই আকর্ষণেই স্বাতি অন্ধকার রাতে

ডাক বাংলো থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর আমি তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম।

মন্দিরের একটা থামে হেলান দিয়ে স্বাতি নিঃশব্দে বসেছিল। আর ব্রাহ্মণেরা ভিতরে আরতির আয়োজন করছিলেন। আমিও নিঃশব্দে তার পাশে এসে বসব ভেবেছিলুম, কিন্তু তার আগেই স্বাতি বলেছিল, তুমি কেন এলে গোপালদা ?

আমি তার অস্পষ্ট কথায় বিস্মিত হয়েছিলুম। সে কি আমার পদধ্বনিও চেনে! তা না হলে সে কী করে আমার আগমনের কথা জানল! অনুভব!

আমাকে সে তার পাশে বসতে দিয়েছিল। আর তার পরেই বেজে উঠেছিল মন্দিরের শঙ্খঘণ্টা। বৈজনাথের আরতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বাতি ওঠে নি, আমিও তার পাশে বসে ছিলুম।

কয়েক দিন আগের কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে আমি যখন মসুরি পাহাড় থেকে ফিরছিলুম, মিত্রা আমাকে স্বাতির কথা বলেছিল। সে নাকি মিত্রাকে স্বাধীন হবার পরামর্শ দিয়েছে। নিজেও চাকরি নিয়ে স্বাধীন হবার কথা ভাবছে। স্বাতি নাকি তাকে বলেছে যে মনের মিলনের জন্য তো কোনও উপঢৌকনের প্রয়োজন নেই, অর্থ প্রতিপত্তি কেন তার প্রতিবন্ধক হবে! মিত্রা আমাকে বলেছিল, স্বাতিকে আমি যেন কোন দিন ভুল না বুঝি।

কোন দিন কি আমি তাকে ভুল বুঝেছি! মনে পড়ে না।

স্বাতি হঠাৎ বলে উঠল : দেখো দেখো!

আমি চমকে উঠে সামনে চেয়ে দেখলুম। সন্তু ও মিমি আসছে বাঁধের দিক থেকে। মিমি অনেকটা এগিয়ে এসেছে, আর সন্তু যেন ইচ্ছা করেই দেরি করছে। বললুম : ওদের সাহস নেই।

ঠিক তোমার মতো।

বলে স্বাতি হাসল।

১৩

ভীমতালের রাজপথে উঠে স্বাতি বলল : এসো।

বলে একটা রেস্তোরাঁর দিকে এগিয়ে গেল। খোঁজ নিল মাছ ভাজা পাওয়া যাবে কিনা। সেখানে পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল পাশের আর একটা রেস্তোরাঁয়। গরম মাছ ভাজার অর্ডার দিয়ে আমরা মুখোমুখি বসে গেলুম।

স্বাতি বলল : এর সঙ্গে আপেলের জুস তো ভাল লাগবে না, চা-ই ভাল লাগবে।

তার পরেই বলল : অ্যাপ্‌ল্‌স জুস আজকাল প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যাচ্ছে। এ রকম পথে ঘাটে না পেলেও ডিনারে দিচ্ছে ছোট গেলাসে। সফ্‌ট্‌ ড্রিঙ্ক।

বললুম : শুনেছি তার দাম একটু বেশি।

ছ ডজন বোতলের একটা বাক্সের দাম সত্তর আশি টাকা।

তাহলে আর দাম বেশি বলছ কেন! রঙ-করা জলের দাম যদি এক এক টাকা হয় তো ফলের রসের দাম তিন টাকা তো হওয়াই উচিত।

স্বাতি বলল : কুলু গেলে আমরা জলের বদলে আপেলের রস খেয়েই থাকব।

বললুম : এ অঞ্চলও তো আপেলের চাষের জন্যে বিখ্যাত।

স্বাতি বলল : কুলুর মতো আপেল কোথাও নেই।

কিন্তু—

হ্যাঁ, যাই নি আগে। কিন্তু যেতে তো হবে!

কুলু উপত্যকার গল্প আমরা ধরমশালার টুরিস্ট বাংলোয় বসে মিস্টার ঘোষের কাছে শুনেছিলুম। লাহৌল ও স্পিতি উপত্যকায় যে উন্নয়ন কার্য চলছে, তারই একটা ধারণা করে নিয়ে তিনি দিল্লী ফিরছিলেন।

বৈজনাথ থেকে ঘাট্টা পর্যন্ত তিন মাইল পথ ক্রমাগত উপরে উঠেছে। পাহাড়ের অপর দিকে মণ্ডি রাজ্য হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত। বৈজনাথেই কাঙ্গড়া উপত্যকার শেষ। আর সেখান থেকে পনর মাইল দূরে যোগীন্দ্রনগরে লোকে একটা নতুন জিনিস দেখবার লোভে যায়। একটা হলেজ ওয়ে। পাহাড়ের এ পাশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পাওয়ার হাউস, ও পাশে জলের বিরাট আধার। একটা পনর হাজার ফুট টানেল দিয়ে সেই জল পাওয়ার হাউসে আসছে। হলেজ ওয়ে হল সেই আট হাজার ফুট পাহাড়টা অতিক্রম করবার জন্যে। লোহার রেলের উপর দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রলি চলাচল করে, টুরিস্টরাও চড়তে পারেন। বিপদের সম্ভাবনা নেই। আর পাহাড়ের মাথায় উঠে চারি দিকের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।

এই যোগীন্দ্রনগর থেকে মণ্ডি শহর পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণে বিপাশার তীরে। সমুদ্রতল থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে এই শহরটিই হিমাচল প্রদেশের একটি প্রধান শহর, পুরনো মণ্ডি রাজ্যের রাজধানী। দেখতে একটু যেন তিব্বত-ঘেষা। বিপাশার পুল পেরিয়ে শহরে ঢোকবার সময়েই এই কথা মনে হবে। শহরের ঘণ্টা ঘরের গড়ন ঠিক তিব্বতী ধরনের কোণা-তোলা।

স্বাতি বলল: আমরা কুলু গেলে আর অত ঘুরে যাব না।

তবে?

দিল্লীতে জেনে নেব, কোন্ পথে গেলে পথ সংক্ষেপ হবে, আবার নতুন পথেও যাওয়া যাবে।

বললুম: দিল্লী থেকে পাঠানকোট হয়ে কুলু মানালি প্রায় পাঁচ শো মাইল পথ, আর সিমলা হয়ে গেলে চার শো মাইলের কম। চণ্ডীগড় হয়ে গেলে নাকি আর পঞ্চাশ মাইল পথ সংক্ষেপ হয়। রূপাড় বিলাসপুর মণ্ডি হয়ে এই পথ কুলু মানালি গেছে।

স্বাতি বলল: সিমলার পথও তো বিলাসপুরের ওপর দিয়ে মণ্ডি গেছে!

বললুম : মণ্ডি হল কুলু উপত্যকার গেট। সেখানে এক রাত কাটিয়ে যাওয়াই উচিত।

মিস্টার ঘোষের কাছে শুনেছি যে মণ্ডি থেকে লারজি পর্যন্ত পঁচিশ মাইল বিপাশার দুই তীরেই কঠিন পাহাড় খাড়া উঠেছে হাজার ফুটেরও বেশি। এখানে কোনও পথ হতে পারে, এ কথা আগে কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। এখন যে সংকীর্ণ অসমতল পথ তৈরি হয়েছে, তার উপরেও স্থানে স্থানে পাহাড় আছে। বিপাশার তীরে তীরে এঁকেবেঁকে সেই পথ চলেছে। একটি গাড়ি চালাবার মতো পথ, তাই পাণ্ডো থেকে আউট বারো মাইল পথে ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক। এক দিক থেকে গাড়ি চলবে বলে গেট আছে। এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট লাগে এই গেট অতিক্রম করতে। ভোর সোয়া পাঁচটা থেকে বিকেল সোয়া পাঁচটা পর্যন্ত দু ঘণ্টা পর পর পাণ্ডোর গেট খোলা হয়। একটু অসাবধান হলে নাকি বিপাশার জলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

মিস্টার ঘোষ বলেছিলেন যে অনেক উঁচুতে পাহাড়ের মাথায় নাকি নতুন পথ তৈরি হচ্ছে। বিপাশার জল শতদ্রুতে পড়বে বিলাসপুর-সুন্দরনগর—মণ্ডি রোডের উপরে ডেহার নামে একটা জায়গায়। তার জন্যে পাণ্ডো থেকে আউট পর্যন্ত বর্তমান পথটি জলে ডুবে যাবে বলেই নতুন সড়ক তৈরির দরকার হয়েছে।

আউট থেকেই কুলু উপত্যকা প্রশস্ত হয়েছে। তবে কাঙড়ার মতো প্রশস্ত নয়। নদীর এধারে ওধারে এই উপত্যকা মাত্র এক থেকে দু মাইল। আউট থেকে আঠারো মাইল পথ এই উপত্যকার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে যাওয়া যায়। আপেলের বাগান আর মৌমাছির চাষ। কুলুর আপেল আর মধু। কিন্তু সাহেবরা চাম্বাকে বলে ভ্যালি অব মিল্ক অ্যাণ্ড হানি, আর কুলুকে বলে ভ্যালি অব গড্‌স্। আশ্বিন মাসে আপেল আর দশেরার সময় দেবতা। সত্যিই তখন কুলুকে ভ্যালি অব গড্‌স্ই বলতে হয়।

কুলু পৌঁছবার আগে বজৌরায় একটি মন্দির আছে। বশেশর মহাদেবের মন্দির। বোধ হয় বিশ্বেশ্বর মহাদেব। গাড়ি থেকে নেমে বিপাশা নদীর দিকে খানিকটা পথ যেতে হয়। লোকে এই সংরক্ষিত মন্দিরটির কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হয়।

তার পরেই কুলু। একটা ছোট সাবডিভিসনাল হেড কোয়ার্টারে যা থাকা দরকার, তা আছে সুলতানপুর নামে একটা জায়গায়—অফিস কাছারি হাসপাতাল রেস্ট হাউস। সেখান থেকে মাইল খানেক দূরে আখারা বাজার। আর একখানা মস্ত সবুজ মাঠ বিপাশার ধারে উঁচু পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐ ময়দানটিই হল কুলুর প্রাণ, সমুদ্র সমতল থেকে চার হাজার ফুট উঁচু। দশেরার উৎসব হয় এই মাঠে।

স্বাতি বলল : কুলুতে আমরা দশেরার সময়ে যাব।

মিস্টার ঘোষের কাছে এই উৎসবের গল্প আমরা শুনেছিলুম। তিনি বলেছিলেন, এই উৎসব না দেখলে এই অঞ্চলের সম্বন্ধে কোনও ধারণাই হয় না। শুধু কুলুর নয়, এ হল সমগ্র হিমালয়ের উৎসব। বিরাট মেলা। ক্রেতা ও বিক্রেতা আসে নানা দেশ থেকে। পশমের জিনিস আসে লাদাখ ও ইয়ারখন্দ থেকেও। আসে টুইড শাল আর কুলুর টুপি। আর আসে সমস্ত উপত্যকা থেকে গ্রামের দেবতা। সুসজ্জিত পাল্‌কিতে চেপে বিচিত্র সব দেবতার সমাবেশ। বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র। কথাবার্তা নৃত্যগীত— সবই বিচিত্র। এ দিকের মানুষকেও ভাল করে দেখা যায়। পুরুষদের সাদা পোশাক— চুড়িদার পায়জামার উপরে কোট, মাথায় টুপি ও কাঁধে কম্বল। মেয়েদের পোশাকে রঙের বৈচিত্র্য দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

ভদ্রলোক আমাদের গাইড বই থেকে একটা গল্প পড়ে শুনিয়েছিলেন। মেলার এক ধারে হয়তো দেখা যায় যে এক দেবতার পাল্‌কি ভীষণ ভাবে দুলছে, আর তার বাহকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও পাল্‌কিকে কাঁধের উপরে স্থির রাখতে পারছে না। সবাই

বুঝতে পারছে যে দেবতা রেগে গেছেন, অথবা কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করবেন। সেই দেবতার পুরোহিত অমনি কাছে এসে পাল্‌কির ঢাকা ছুঁতেই তার উপরে দেবতার ভর হবে। প্রথমে সে বিড়-বিড় করে কথা কইবে, তার পরে তার কথা বোঝা যাবে। দেশের লোকেরা খারাপ হয়ে গেছে বলে এবারে বৃষ্টি নামবে দেরিতে, কিংবা আগের চেয়ে বন্যা হবে ভয়াবহ। ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ হয়-তো চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করবে, বারে বারে আমার নতুন বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ছে কেন, কবে আমি বাড়িটা সম্পূর্ণ করতে পারব? পুরোহিতের কাছ থেকে তখনই উত্তর পাওয়া যাবে, মন্দির থেকে তোমার বাপ যে আধ সের পেরেক চুরি করেছিল তা ফিরিয়ে দিলেই পারবে।

লোকেরা সব বাড়িতে-তৈরি-করা মদ নিয়ে আসে। আর সেই মদ খেয়ে মেয়ে পুরুষের কী উল্লাস! কুলুর মেলায় তাদের নাচও দেখতে পাওয়া যায়। এরা যে শুধু দশেরায় নাচে তা নয়, নানান ঋতুতে এদের নানান রকমের নাচ। চাম্বায় এবং আরও উত্তরে লোকেরা নাচবার জন্যেই নাচে। শীতপ্রধান দেশের লোক নাকি শারীরিক প্রয়োজনে নাচে। তা না হলে শরীর আড়ষ্ট হয়ে যায়।

মিস্টার ঘোষের কাছে শুনেছিলুম যে ১৯৫৪ সালে এই অঞ্চলের এক দল গদ্দি মেয়ে পুরুষ দিল্লীতে নেচে ফোক গল্পের ন্যাশনাল ট্রফি নিয়ে গেছে। সেই মেয়েরা নাকি নিজেদের গ্রামের বাইরে কখনও কোথাও যায় নি।

কুলু উপত্যকায় আরও অনেক দেখবার জায়গা আছে—রায়সন কাট্‌রাইন নাগর চান্দের খনি মালানা কোটি মণিকরণ কামধার। আর সব জায়গাতেই কিছু না কিছু দেখবার জায়গা। রায়সন আর কাট্‌রাইনে আছে ফলের বাগান, কাট্‌রাইনে একটা ট্রাউট মাছের হ্যাচারিও আছে। সেখানেই নদীর পরপারে প্রায় হাজার ফুট উঁচুতে নাগর। নাগরে দু তিনটি মন্দির আছে। এক মন্দিরে প্রবাদ

আছে যে একটা সুড়ঙ্গপথে পার্বতী উপত্যকার মণিকরণের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। একজন সাধু রোজ মণিকরণের উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করতে যেতেন। ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে এই সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। নাগরে এক রাজপ্রাসাদ আছে। এখন সেখানে রেস্ট হাউস হয়েছে। এখানে জনশ্রুতি যে রাজার অবিশ্বাসের জন্যে তাঁর রানী নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। সেই রানী এখন ভূত হয়ে একটা ঘরে থাকেন।

নাগর থেকে একটা সরু পথ বনের ভিতর দিয়ে গুজরদের গ্রাম চান্দের খনি গেছে। তার পরে একটা গিরিপথ পেরিয়ে তিন হাজার ফুট নিচে মালানা। খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে নামতে হয়। এই পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন অপরূপ, মানুষও তেমনি আদিম। মাঠের মধ্যে একখানা পাথরকে তারা জমলু দেবতা বলে, আর নিজেদের বলে তাঁর প্রজা। জমলুর চেয়ে বড় দেবতা নাকি গোটা কুলু উপত্যকায় নেই। একটা দরজাহীন ঘরে তারা দেবতার নামে কত ধনরত্ন জমিয়েছে তার হিসেব নেই। ওদের জগৎটাই অন্য, জীবনযাত্রা গল্পের মতো। না দেখলে বিশ্বাস হবে না কারও।

তার পর মানালির কথা। স্বাতি বলল: মানালি তো কুলুর কাছেই।

বললুম: কাছে মানে তেইশ মাইল দূরে। আর কুলুর চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় বলে আমার ধারণা।

কেন?

দশেরা ছাড়া অন্য সময়ে কুলুর ময়দান হল গরু চরাবার মাঠ। আর মানালিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নাকি অপরূপ। উত্তরে বিপাশা আর অন্য দিকে মানালসু নদী, ফলের বাগান আর বরফের পাহাড়। হাসপাতাল পোস্ট অফিস আছে, রেস্ট হাউস বোর্ডিং হাউস আছে, আর দার্জিলিঙের মতো মাউণ্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট। হিড়িম্বার মন্দিরও আছে। কুলুতে রঘুনাথজীর পরেই হিড়িম্বার স্থান।

স্বাতি হেসে বলল : রাক্ষসীর মন্দির আছে জেনে ভারি আশ্চর্য হয়েছিলাম। আর কোন অসুর বা রাক্ষসের মন্দির বোধ হয় এ দেশে নেই!

আমিও শুনি নি।

বিপাশার ওপারে আছে বশিষ্ঠ কুণ্ড। গন্ধকের উষ্ণ প্রস্রবণ। বশিষ্ঠ ও বিপাশাকে নিয়ে পুরাণে একটি সুন্দর গল্প আছে। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের শতপুত্র বিনাশ করেছিলেন। শোকার্ত পিতা প্রাণ বিসর্জনের জন্য পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেন কিন্তু তাতে তাঁর মৃত্যু হয় না। পরে নিজেকে পাশবদ্ধ করে নদীতে ঝাঁপ দেন। নদী তাঁর পাশমুক্ত করে কূলে পৌঁছে দেয়। বশিষ্ঠ তাই নদীর নাম দেন বিপাশা। বিপাশাই এই কুলু উপত্যকার প্রাণ।

রামের গুরু ছিলেন বশিষ্ঠ। তাই বশিষ্ঠ কুণ্ডের কাছে রামচন্দ্রের মন্দিরও আছে। আর একটু উপরে লেক, যেখানে ভৃগু মুনি তপস্যা করেছিলেন। ঝিল্লা রাণার দুর্গ এগার হাজার ফুট উঁচুতে। রোটাং পাসের কাছে একটি পাহাড়ের নাম ব্যাস ঋষি, কাছেই কোথাও বিপাশা নদীর উৎপত্তি স্থল।

কুলুর কাছেই পার্বতী নদীর উপত্যকা। আর এই নদীর তীরেই মণিকরণ একটি উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য বিখ্যাত। এই প্রস্রবণের জলে নানারকমের রোগ সারে বলে বহু লোকে যাতায়াত করে। কিছু কৌতুকও হয়। যাত্রীরা গরম জলে ভাত রাঁধে, তরকারী রাঁধে, রুটিও সেঁকে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। স্থানীয় লোকেরা এই প্রস্রবণের উৎপত্তির সম্বন্ধে একটি গল্প বলে। একদা শিবের সঙ্গে পার্বতী এই উপত্যকায় যখন বেড়াচ্ছিলেন, তখন পার্বতীর কান থেকে একটি মণিকুণ্ডল খুলে পড়ে। শেষনাগ সেটি নিয়ে পাতালে পালায়। পার্বতী সেটি ফিরে চাইতেই শিব তপস্যায় বসেন। কঠিন তপস্যা। তাতে চরাচর কেঁপে উঠেছিল। ভয়ে শেষনাগ মণিকুণ্ডল ফেরত দিলেন। পাতাল ফুঁড়ে এই প্রস্রবণ উঠল,

তারই সঙ্গে এল মণি। আর এরই জন্যে এই জায়গার নাম হয়েছে মণিকরণ। কিছু দিন আগেও এই প্রস্রবণের জলে নানা রকম পাথর পাওয়া যেত।

মাছ ভাজা আর চা শেষ করে পথে নামতেই সন্তুর চিৎকার শুনতে পেলুম : এই যে আপনারা এইখানে!

বলতে বলতেই কাছে এসে উপস্থিত হল।

স্বাতি বলল: তোমাদের ফিরতে দেখেই আমরা চা খেতে ঢুকেছিলাম।

আর আমি আপনাদের চারি দিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি!

আমি বললুম : মিমিকে এগিয়ে দিয়ে তুমি যে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছিলে ভায়া!

লজ্জা এড়াবার জন্য সন্তু বলল : চলুন চলুন, বাসে উঠে বসুন। সবাইকে আমি ডেকে আনছি।

বলতে বলতেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিজেদের ব্যবস্থায় এ দিকে এলে লোকে আরও খানিকটা এগিয়ে যায়। সুন্দর পার্বত্য পরিবেশে নৌকুচিয়াতাল দেখে ফেরে। কিন্তু আমাদের আব সময় নেই। আকাশের সূর্য এখন পশ্চিমের দিকে হেলেছে। এখনই যাত্রা করতে না পারলে পথেই অন্ধকার গভীর হয়ে যাবে। সন্তুর তৎপরতায় আমরা অল্পক্ষণেই রানীখেতের দিকে অগ্রসর হলুম।

পিছনের যাত্রীদের কোলাহল একটু কমতেই আবার আমার মিস্টার ঘোষের কথা মনে পড়ল। তিনি মানালি ছাড়িয়ে উত্তরে লাহৌল ও স্পিতি উপত্যকায় গিয়েছিলেন। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের দক্ষিণে লাহৌল উপত্যকা, আর তার দক্ষিণে স্পিতি মণ্ডির উত্তরে অবস্থিত। মানালি থেকে রাহালা ন মাইল পথ তৈরি হয়ে গেছে। রাহালা থেকে রোটাং পাসের কঠিন চড়াই প্রায় সাড়ে তের হাজার ফুট। এক মাইল প্রশস্ত এই পাস পেরিয়ে যাওয়া কিছু দুঃসাধ্য

নয়। তার পরে লাহৌলের প্রধান শহর কাইলং পর্যন্ত আটাশ মাইল জীপের রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। মানালির বশিষ্ঠ মন্দিরের নিচে থেকে লাদাখের লে পর্যন্ত যে হাই ওয়ে তৈরি হবে, তাই হবে পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু পার্বত্য পথ।

মিস্টার ঘোষের কাছে শুনেছিলুম যে এক দিন একখানা জীপ যখন ভেঙেচুরে ওপারে নিয়ে গিয়ে জোড়া দিয়ে চালানো হয়েছিল, ওধারের সমস্ত উপত্যকার লোক সেই দিন এই দৈত্যটি দেখবার জন্য জড়ো হয়েছিল। লাহৌল হল চন্দ্রা ও ভাগা নদীর উপত্যকা, দুইএ মিলে চন্দ্রভাগা হয়েছে।

স্পিতি উপত্যকার পথ খুবই দুর্গম। রোটাং পাস থেকে কুনজুম পাস পর্যন্ত পথ তৈরি হচ্ছে। পনর হাজার ফুট উঁচু এই গিরিপথ পেরিয়ে স্পিতি উপত্যকা। এ যেন সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা দেশ। ইয়াকের দুধ মাখন আর বার্লির ছাতু খেয়ে এরা বেঁচে আছে। লোক সংখ্যা খুবই কম, এবং যাতে লোক না বাড়ে তার জন্যে সমাজে নিয়ম কানুন আছে। বাপের বড় ছেলেই জমিজমা পাবে এবং বিয়ে করে সংসারী হবার অধিকার পাবে। অন্য ছেলেরা যাবে মঠে লামা হতে। বড় ভাই না মরলে ফিরে এসে সংসারী হবার অধিকার তাদের নেই। সব মেয়েরও বিয়ে হয় না। অবিবাহিত মেয়েরা কনভেণ্টে থাকে। কিন্তু সব সময়েই যে তাদের একটি পুরুষের একটি স্ত্রী তা নয়। একটি পুরুষের একাধিক স্ত্রী আছে, আবার একটি স্ত্রীর একাধিক স্বামীও আছে।

পুরনো পথ ধরেই আমরা ফিরে যাচ্ছি। ভীমতাল থেকে ভাওয়ালি, তার পরে খৈরনায় কোশী নদী পেরিয়ে রানীখেত। বাসের যাত্রীরা এখন ক্লান্ত, বাহিরে আসন্ন অন্ধকারের আশঙ্কায় কিছু ভীতও মনে হচ্ছে। স্বাতির দিকে চেয়ে দেখলুম, সে আমাকে লক্ষ্য করছে। প্রসন্ন তার দৃষ্টি, নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়।

অতীতের কথা আমার আর ভাবতে ভাল লাগছে না।

১৪

রানীখেতে আজ আমাদের জন্যে বেশ খানিকটা বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ গভীর হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল রাত অনেক হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টি পডছিল না বলে মেজাজ আমাদের প্রসন্ন ছিল। লঘু পায়ে তরতর করে উপরের বারান্দায় এসে পৌঁছতেই সেই শীত-কাতুরে দম্পতিকে দেখতে পেলুম। আমাদের দেখতে পেয়েই ভদ্রলোক বললেন: আসুন আসুন!

সত্যিই আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম।

ভদ্রমহিলা বললেন: আপনাদের আমরা চিনতে পারি নি, কিন্তু সন্দেহ করেছিলাম।

স্বাতিও নির্বাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

ভদ্রলোক দু হাতে দুখানা চেয়ার টেনে এনে আমাকে বললেন: বসুন আপনারা।

বলে বেয়ারাকে ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন।

ভদ্রমহিলা বললেন: খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি তো! বাইরেই একটু বিশ্রাম করে নিন।

হোটেলের বেয়ারা ছুটে এসেছিল। তাকে দেখে ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: চা না কফি?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ভদ্রমহিলা বললেন: কফি।

বেয়ারা চলে গেল। তার পরে ভদ্রলোক বললেন: হোটেলের গাইডের কাছে আপনাদের পরিচয় পেলুম আজ সকাল বেলায়। হতভাগা কাল আমাদের কিছু বলে নি।

আমার খানিকটা আতঙ্ক উপস্থিত হল। আমাদের কী পরিচয় পেয়েছেন জানি না। নিশ্চয়ই সে ঠিক পরিচয় নয়। আমাদের

দেখে এমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠার কোন কারণ নেই। তবু আমি চুপ করে রইলুম।

স্বাতি আমার দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিতে খানিকটা কৌতুক আর কিছু গর্ব। কেন জানি না আমার মনে হল যে সন্তুর মতো এ ভদ্রলোকও বোধ হয় আমার লেখার খবর পেয়েছেন। কিন্তু পেলেন কার কাছে! হোটেলের গাইড এ কথা জানল কার কাছে!

সবাই বসবার পরে ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। নাম সাধন গুপ্ত, দিল্লীর বড় দপ্তরে আছেন। ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে বললেন: আমার স্ত্রী ম্যানিলা।

স্বাতি তাঁর মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকাতে ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি বললেন: ম্যানিলায় জন্মেছি বলে বাবা শখ করে এই নাম রেখেছেন।

বললুম: নামটি বেশ।

খুশী হয়ে ভদ্রলোক বললেন: উমা ম্যানিলার বন্ধু, কিন্তু আমরা বনে ছিলুম বলে তার বিয়েয় আসতে পারি নি।

উমা!

আরে উমাশঙ্কর। আপনাদের বন্ধু।

বললুম: হ্যাঁ, এই অঘ্রাণেই তো পপির সঙ্গে বিয়ে হল উমার।

প্রচুর খুশী হয়ে সাধন গুপ্ত বললেন: ম্যানিলা আজ উমার চিঠি পেয়েছে, সে-ই আপনাদের খবর দিয়েছে। ঐ হতভাগা গাইডকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেই সব বেরিয়ে পড়ল।

আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। আর স্বাতি কৌতুকে হেসে উঠল।

ম্যানিলা কিছু অপ্রতিভ হয়ে বললেন: হাসলেন যে!

স্বাতি আমার জন্যেই হেসেছিল। কিন্তু বলল: ভদ্রলোক ভারি আমুদে লোক।

উমা তো!

ম্যানিলা তখন সহজ হয়ে গেছেন, বললেন : সাধনের ঠিক উল্টো দিক। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসতে পারে না।

তার পরেই জিজ্ঞাসা করলেন : উমার বউ কেমন হয়েছে ?

বলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : স্বাতির বন্ধু।

ম্যানিলা এবারে স্বাতির দিকে ফিরে তাকালেন।

স্বাতি বলল : দুজনকে বেশ মানিয়েছে।

উমা খুশী হয়েছে তো ?

খুশী ! পপিকে বিয়ে করবার জন্যে তো পাগল হয়ে উঠেছিল !

সত্যি নাকি ! ও তো আমাকেও বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল। যখন তখন এসে বিরক্ত করত। অনেক কষ্টে ওর কবল থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি।

স্বাতি গম্ভীর হয়ে গেল, আমিও কোন কথা বললুম না। কিন্তু দেখলুম যে সাধন গুপ্ত বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছেন, হয়তো একটু গর্বও বোধ করছেন এই কথা শুনে।

ঠিক এই সময়ে আমাদের কফি এল। ম্যানিলা বেয়ারাকেই বললেন কফি ঢেলে দিতে। তার পরে কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে সাধন গুপ্ত বললেন : আপনারা বুঝি কিছু দিন এখানে থাকবেন ?

বললুম : বিশ্রামের জন্যে এসেছি।

বিশ্রাম !

হ্যাঁ, শুয়ে বসে ঘুমিয়ে কিছু দিন কাটাব।

স্ট্রেঞ্জ ! এই ভাবে আপনারা সময় নষ্ট করবেন !

বলে ম্যানিলা আমাদের দুজনের দিকেই তাকালেন। স্বাতি তার কথার উত্তর দিল, বলল : আমরা এটাকে সময়ের সদ্ব্যয় ভাবছি।

সাধন গুপ্ত বললেন : এ হল ভারতীয় মনোভাব। আগে আমরা বনে গিয়ে না কী বলে, বানপ্রস্থে গিয়ে চোখ বুঁজে তপস্যায়

বসতাম, এখন সমুদ্রের ধারে গিয়ে বা পাহাড়ে এসে শুয়ে সময় কাটাই। বিদেশের লোক এ রকম ভাবতেই পারে না। তারা ছুটি পেলে খেলাধুলো দৌড়ঝাঁপ কোন কিছু নিয়ে সারা দিন মেতে থাকবেই।

বললুম : আপনারা—

আমরা কেদারনাথে যাচ্ছি।

স্বাতি যেন চমকে উঠল, বলল : কেদারনাথ!

সাধন গুপ্ত বললেন : কেদারনাথে আপনারা এখনও যান নি?

উত্তর আমি দিলুম, বললুম : না।

কী আশ্চর্য! আমরা বন্ থেকে কেদারনাথ দেখতে এলুম, আর আপনারা—

স্বাতি ম্যানিলাকে জিজ্ঞাসা করল : বন্ তো রাইনের তীরে জর্মনির একটি সুন্দর শহর। তা আপনারা সেখান থেকে সুইজারল্যাণ্ডে না গিয়ে—

বাধা দিয়ে সাধন গুপ্ত বললেন : ঠিক বলেছেন। আমরা সুইজারল্যাণ্ডেই যাচ্ছিলুম। আর এই কথা শুনে ফন্ গোয়েবল্‌স্ বললেন, সে কি, আপনাদের দেশে কেদারনাথ থাকতে আপনারা সুইজারল্যাণ্ডে কেন যাচ্ছেন!

বললুম : ফন্ গোয়েবল্‌স্ তো জর্মন!

আপনি চেনেন নাকি!

বললুম : নাম শুনেই অনুমান করছি। আর ঐ দেশের লোকই তো এক সময় আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতির অনুরাগী ছিল। ওরা না বললে আমাদের বেদ উপনিষদের কথাও পৃথিবীর লোকে জানত না।

সাধন গুপ্ত বললেন : না জানলেও ক্ষতি ছিল না কিছু। ওতে সাবস্‌টান্‌স্ কিছু নেই।

স্বাতি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। আমি তাকে ইশারায় থামিয়ে

দিলুম। বললুম: তাহলে আপনারা এক জর্মন ভদ্রলোকের কথাতেই কেদারনাথ দেখতে এত দূরে এসেছেন!

ভদ্রলোক বললেন: দিল্লীতে ডেকেছিল। ভাবলুম, এই সুযোগে দেখে যাই। তবে শুনতে পাচ্ছি, সুইজারল্যাণ্ডের চেয়েও ঠাণ্ডা বেশি, আর পথও দুর্গম।

ম্যানিলা বললেন: চলুন না আপনারাও।

এবারেও স্বাতিকে আমি ইশারায় থামিয়ে দিলুম, বললুম: আমরা তো তৈরি হয়ে বেরোই নি। এবারে আপনারাই দেখে আসুন। আব তা ছাড়া—

তা ছাড়া কী?

বললুম: আমাদের ধর্মে কেদারনাথ দর্শনের নিয়ম কানুন আছে। যাচ্ছি বললেই যাওয়া হয় না।

কী রকম?

বলে ম্যানিলা আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: ঋষিকেশ থেকে যাত্রা শুরু করতে হয়, আর পর পর চার ধাম দর্শন—যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ।

সাধন গুপ্ত আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তার পরে বললেন: আপনারাও এই সব কুসংস্কার মানেন?

গঙ্গা-যমুনার উৎস দেখাকে আপনি কুসংস্কার বলছেন!

না, মানে, এই যে আপনি নিয়ম কানুনের কথা বলছেন—

কোনও কারণেই নিয়ম কানুন হয়।

ম্যানিলা বললেন: এ সবেরও কোনও কারণ আছে নাকি?

বললুম: একটু ভাবলেই বোঝা যায়। যমুনোত্রীতে আমরা দেখি বন্দরপুঁছ পর্বতের তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ। ত্রিশূলের মতো যমুনার ধারা নেমেছে হিমবাহ থেকে। এই প্রাকৃতিক দৃশ্যই আমাদের দেবতা। গঙ্গোত্রীতে উৎস নয়, সেখানে গঙ্গার প্রবাহ

আমাদের দেবতা। তার পর কেদারনাথ। তুষারমণ্ডিত হিমালয়কে আমরা সেখানে শিব জ্ঞানে প্রণাম করি। আর নীলকণ্ঠ শৃঙ্গের নিচে বদ্রীনাথে আমরা পাথরের মূর্তির পূজা করি। হিন্দুধর্মের এই হল বৈশিষ্ট্য—বেদের যুগে আমরা প্রাকৃতিক শক্তি ও সৌন্দর্যকে পূজা করেছি। উপনিষদের কালে ধ্যান করেছি সর্বশক্তিমানের। তার পরে সেই শক্তির একটা মূর্তি কল্পনা করে পাথরের পূজা শুরু করেছি পৌরাণিক যুগে। উত্তরাখণ্ডে এসে চার ধাম দর্শনের সময় ধর্মভাবের এই বিবর্তনকে আমরা শ্রদ্ধা করি।

অফুল!

বলে সাধন গুপ্ত একটা হাই তুললেন।

আর আমি বললুম: খ্রীষ্টের জন্ম হয়েছে প্রায় দু হাজার বছর আগে। আর এ সব কথা হিন্দুরা ভেবেছে তারও দু হাজার বছর আগে। আর আপনি ফন্ গোয়েবল্স্এর যে কথা শুনে বন্ থেকে রানীখেতে এসেছেন, সে কথা গান্ধীজী এই অঞ্চলে বসেই অনেক দিন আগে বলেছিলেন।

ম্যানিলা আশ্চর্য হয়ে বললেন: তাই নাকি!

বাসের সেই ভদ্রলোকের কাছে শোনা কথা আমি তাঁদের জানিয়ে দিলুম, বললুম: গান্ধীজী এই কুমায়ুনকে বলেছিলেন 'দি সুইজারল্যাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'। বলেছিলেন, পৃথিবীর আর কোন দেশে বোধ হয় এমন সৌন্দর্য নেই। আর স্বাস্থ্যের জন্যে লোকে বিদেশে যায় কেন, সে জন্যেও বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

তার পরেই প্রশ্ন করলুম: স্টেট্সের গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান দেখেছেন?

ভদ্রলোক সত্যি কথাই বললেন: দেখি নি।

গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানের এক একটা সুন্দর জায়গার তারা বিস্ময়কর নাম দিয়েছে—ব্রহ্মা টেম্পল্ বিষ্ণু টেম্পল্ শিব টেম্পল্, দুর্গার নামে দেবী টেম্পল্, মনু টেম্পল্ বুদ্ধ টেম্পল্, আবার কৃষ্ণ শ্রাইন রাণা শ্রাইন. এই ধরনের নাম।

সাধন গুপ্ত সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলেন : সত্যি নাকি ?

বললুম : ও দেশে গেলে নিজে চোখে দেখে আসবেন।

ম্যানিলা বললেন : কেন এই রকম নাম দিয়েছে ?

স্বাতি বলল : আমাদের দেবদেবীকে শ্রদ্ধা করে বলেই দিয়েছে।

কিংবা—

বলে আমি যোগ করলুম : ঐ সব সুন্দর দৃশ্য দেখে আমাদের দেবদেবীর কথাই তাদের প্রথমে মনে পড়েছে।

সাধন গুপ্ত খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার পরে বললেন : দিল্লীর টুরিস্ট অফিস আমাদের মসুরি থেকে স্টার্ট করতে বলেছিল। দেরাতুন এক্সপ্রেসে দেরাতুনে এসে মসুরি, সেখান থেকে টেহরি না ঐ রকমের একটা জায়গার ওপর দিয়ে কেদারনাথ। হরিদ্বার বা ঋষিকেশ অ্যাভয়েড করতে বলেছিল পিলগ্রিমদের জন্যে। খুব নাকি ডার্টি ব্যাপার!

ম্যানিলা বললেন : আমরা সেই ভাবেই ব্যবস্থা করছিলাম। কিন্তু পরে তারাই জানাল যে বৃষ্টির জন্যে ও পথে রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না। তার চেয়ে রানীখেত হয়ে যাওয়াই সেফ্।

সাধন গুপ্ত বললেন : এ পথে এসেও অসুবিধায় পড়েছি। ট্যাক্সিতে সব মালপত্র যাবে না, ভাল স্টেশন ওয়াগন পাচ্ছি না। আর বাস দেখলুম হরিব্‌ল্। কোন্ একটা প্রয়াগে নিয়ে নামিয়ে দেবে। সেখান থেকে অন্য বাস, তার পরে আবার এক প্রয়াগ থেকে—

অ্যাবসার্ড ব্যাপার!

বলে ম্যানিলা আমার দিকে তাকালেন।

স্বাতি বলল : দুজন মানুষের মালপত্র একটা ট্যাক্সিতে যাবে না।

আমি বললুম : অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র না হয় এখানেই রেখে যান।

সাধন গুপ্ত যেন চমকে উঠলেন। বললেন : বলেন কি, এখানে

তো আমরা অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিছুই আনি নি, বরফের দেশে যেতে হলে যা দরকার শুধু তাই।

ম্যানিলা বললেন : গরম জামা কাপড়, লেপ কম্বল, স্লিপিং ব্যাগ—

হাইকিংএর উপযোগী জুতো ছাতা লাঠি ওয়াটার প্রুফ—

কিছু খাবার জিনিসপত্র—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : আপনারা কি রেঁধেবেড়ে খাবেন ?

দু চোখ বড় বড় করে ম্যানিলা স্বাতির দিকে তাকাল। তাড়াতাড়ি আমি বললুম : খানসামা তো সঙ্গে আসে নি, রাঁধবে কে ?

সাধন গুপ্ত বললেন : পথে শুনেছি কিছুই পাওয়া যায় না। তাই টিন্‌ড্‌ ফুড এনেছি। আর তা গরম করবার জন্যে—

বললুম : বুঝেছি।

কফি আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। স্বাতি বলল : এবারে আমরা উঠি।

বলেই উঠে দাঁড়াল।

সাধন গুপ্তও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : লেট্‌স্‌ মীট এগেন ওভার এ কাপ্‌ল্‌ অফ ড্রিঙ্কস্‌।

আমি ধন্যবাদ দিয়ে বললুম : আজ থাক।

সাধন গুপ্ত স্বাতির দিকে চেয়ে বললেন : আপনাদের পছন্দ মতো সব রকম ড্রিঙ্কস্‌ সঙ্গে আছে।

স্বাতি বলল : আমরা খাই নে।

একটু যেন রূঢ় ভাবেই কথাটা বলল।

ম্যানিলা মৃদু আর্তনাদ করে উঠল : হোয়াট্‌ ?

আমি হেসে বললুম : মাপ করবেন।

তার পর আর অপেক্ষা করলুম না।

নিজেদের ঘরে এসে স্বাতি অনেকক্ষণ ধরে হাসল। তার হাসি যেন আর থামতেই চায় না। আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম : অত হাসি কিসের বল তো?

হাসতে হাসতেই স্বাতি বলল : তোমার ঐ রকমের একটা বউ হলে বেশ হত।

আর তোমার ঐ রকমের একটা বর।

স্বাতি বলল : মানিক জোড়।

তার পরেই বলল : পপি উমাশঙ্কর এলে ওদের সঙ্গে জমত ভাল।

বললুম : ওরা তাই ভেবেছিল।

কিন্তু খুব নিরাশ হয়েছে।

নিরাশ করেছ তুমি। দিন কয়েক আমি ওদের খেলাতে পারতুম। অন্তত বিদেশের কথা ওদের কাছে কিছু জেনে নিতে পারতুম।

স্বাতি হেসে বলল : ওদের সঙ্গে তোমার কথাবার্তা শুনে আমার কী মনে হচ্ছিল জানো?

বললুম : না বললে জানা সম্ভব নয়।

মনে হচ্ছিল, তোমার মন এখন আকাশে উড়ছে।

মানে?

নিজেদের দেশ দেখা তো প্রায় শেষ হয়ে গেল, এবারে বিদেশে যাবার জন্যে মন তোমার তৈরি হচ্ছে।

আমি আশ্চর্য হলুম তার এই মন্তব্য শুনে। বিদেশ ভ্রমণের কথা আমি এখনও ভাবি নি, ভাববার দরকার হয় নি। স্বাতি এই মন্তব্য করে আমার মনে বুঝি নতুন ভাবনা ঢুকিয়ে দিল।

স্বাতি বলল : হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে?

বললুম : সবাই সাধন গুপ্ত নয় যে সরকারী পয়সায় বন্ থেকে সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে যাবে!

কিন্তু আমরা তো নেপাল সিংহলে যেতে পারি, সিকিম ভূটানও আমাদের কাছে নতুন দেশ। কিন্তু তার আগে—

বললুম ঃ বল।

তার আগে হিমালয় আমাদের ভাল করে দেখতে হবে। ঘোড়ায় চেপে, পায়ে হেঁটে হিমালয়ের ভয়ংকর সৌন্দর্য আমরা মনের ঝুলি পূর্ণ করে নিয়ে ফিরব।

স্বাতির চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল যে তার মন এখন সত্যি অন্যত্র হারিয়ে গেছে। আমাকেও যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে। আমি আর কোন কথা বলতে পারলুম না।

১৫

সকাল বেলায় ঘুম ভাঙার পরে দেখলুম যে স্বাতি ঘরে নেই, অথচ ঘরের দরজা ভেজানো আছে। গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে তাকে দেখতে পেলুম। সে খুব মনোযোগ দিয়ে সামনের হিমালয়ের ছবি তোলবার চেষ্টা করছে। সেই দৃশ্য। দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বরফে আবৃত পাহাড় এখন মেঘমুক্ত। পিছনে না তাকিয়ে স্বাতি বলল: ঘুম ভাঙল ?

বললুম: তোমার তৃতীয় নেত্র কি—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: নেত্র নয়, মন। মন চারি দিকে দেখে, অতীত ও ভবিষ্যৎও।

হেসে বললুম: তুমি কী ভবিষ্যৎ দেখছ ?

দেখছি। সন্তু আসছে আলমোড়া যাবার প্রস্তাব নিয়ে।

এখনি যেতে হবে !

খানিকক্ষণ সময় নিশ্চয়ই দেবে।

ভয়ে ভয়ে বললুম: এ যে দেখছি রীতিমতো অত্যাচার !

সন্তু তখন বারান্দার উপরে উঠে এসেছিল, বলল: অত্যাচার নয় গোপালদা, আপনারা না গেলে একেবারেই আনন্দ হবে না।

স্বাতি বলল: এ তোমার কথা, না মিমির ?

কার কথা বললে রাজী হবেন স্বাতিদি ?

তোমাকে মনগড়া কথা বলতে হবে না। কী জন্যে এসেছ তা সরাসরি বলে ফেল।

গোপালদা বুঝতেই পারছেন, আজ আপনাদের সম্মতি পেলে আলমোড়া ঘুরে আসি। বেশি পথ নয়, মাত্র ঊনত্রিশ মাইল। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সারাক্ষণ বাস যাতায়াত করছে।

কেন, তোমার কালকের বাস কী হল ?

সন্তু বলল : কুঁড়েরা আজ কিছুতেই বিছানা ছাড়তে চাইছে না।

মিমি ?

বলে স্বাতি তার দিকে তাকাল।

সন্তু গদগদ ভাবে বলল : আপনার নাম শুনলে সে এখুনি লাফিয়ে উঠবে।

স্বাতি সকৌতুকে আমার দিকে তাকালো।

আমি হেসে বললুম : তাহলে তো আমাদের যেতেই হবে।

সাড়ে সাতটার বাস, না তার পরেরটা ?

পরেরটা।

বলেই সন্তু একবার স্বাতির পা আর একবার আমার পা ছুঁয়ে বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেল।

বারান্দার রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে স্বাতি নিচে সন্তুকে দেখল খানিকক্ষণ। তার পরে আমার দিকে ফিরে বলল : এদের মধ্যে প্রাণ আছে।

যা আমাদের মধ্যে নেই।

কে বলল ?

তোমার কথাই বললুম।

বেয়ারা বোধ হয় আমাদের দেখতে পেয়েছিল। ভোরের চা এনে হাজির করল। স্বাতি বলল : আমরা আজও বেরোব। ব্রেকফাস্ট তাড়াতাড়ি চাই, আর দুপুরে লাঞ্চ খাব না।

জী।

বলে সে ট্রে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

একখানা চেয়ারে বসে বললুম : এ রকম ছুটোছুটি করব বলে কিন্তু আমরা এখানে আসি নি।

স্বাতি বলল : বিধাতার ইচ্ছা মতোই তো হবে।

কিন্তু খোদার উপরে খোদকারি করছে যে সবাই। শেষ পর্যন্ত—

আমি থামতেই স্বাতি বলল : বল।

শেষ পর্যন্ত রানীখেত ছেড়ে কেদারনাথের পথ না ধরতে হয়!

স্বাতি চমকে উঠে সোজা হয়ে বসল। গভীর ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল : তা কি সম্ভব?

বললুম : কিছুই অসম্ভব নয়।

কিন্তু—

আমাদের আর প্রয়োজন কতটুকু! দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লেই পৌছতে পারব।

স্বাতি চা ঢেলে আমার চা এগিয়ে দিয়ে নিজের পেয়ালায় অনেকক্ষণ ধরে চামচে নাড়তে লাগল। আমি বুঝতে পারছি যে সে এখন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। মুক্ত বাতাসে তার ভাবনা পৌছে গেছে কেদারনাথের মন্দির দ্বারে। আমি হেসে বললুম : অত ভাবনা কিসের!

কিন্তু স্বাতি তার ভাবনার কথা বলে আমাকে চমকে দিল। বলল : সত্যি বলতে কি, তোমাকে ঠিক আগের মতো মনে হচ্ছিল না।

এখন?

স্বাতি এই বারে তার চায়ে চুমুক দিয়ে বলল : এখন ভাবছি, হঠাৎ বদলে গিয়েছিলে কেন?

বললুম : এর উত্তর তো খুব সোজা।

কী?

বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ানো তো আর সাজে না, ঘরে মন দেবার চেষ্টা করছি।

স্বাতিও এবারে হেসে বলল : বুঝেছি।

তার দু চোখে এখন প্রসন্নতা যেন উপছে পড়ছে। বলল : দেরি করলে আর চলবে না। অনেক কাজ আছে আমাদের। কিন্তু—

বল।

ওদের দলে যোগ দিতে চেয়ো না।

বললুম : কেন, সন্তুদের কি ভাল লাগছে না!

সন্তুদের কথা নয়। তোমার বন্ধু সাধন গুপ্ত আর—

তোমার বন্ধু ম্যানিলা গুপ্ত।

স্বাতি বলল : ওরা আমার বন্ধু নয়।

আমি বললুম : তোমার বন্ধুর বন্ধু।

ব্রেকফাস্ট শেষ করতে না করতেই সন্তু এসে আমাদের টেনে নিয়ে গেল। বলল : আজ ভারি ঝামেলা হয়েছে স্বাতিদি, তিতি বৌদি কিছুতেই বিছানা ছেড়ে উঠছে না।

কেন?

কাল সারা দিন বাসের ধকলে তাঁর কোমরে ব্যথা হয়েছে।

বললুম : দাদাও যাচ্ছেন না বুঝি?

না।

স্বাতি বলল : মিমির যেতে আপত্তি কি?

সন্তু একেবারে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলল : সে কথাটা যে বোঝাতেই পারছি না!

কাকে?

হ্যাঁ-না করে সন্তু যা বলল, তা ঠিক বোঝা গেল না। স্বাতি বলল : আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করছি।

বলতেই সন্তু খপ্ করে আবার স্বাতির পায়ের ধুলো নিল।

স্বাতি আমাকে বলল : তুমি এইখানে দাঁড়াও, আমি মিমিকে ডেকে আনছি। এসো।

বলে সে সন্তুকে ডেকে নিয়ে তাদের হোটেলে ঢুকে পড়ল।

বেশিক্ষণ সময় তার লাগল না। মিমি বোধ হয় তৈরি হয়েই ছিল, স্বাতির সঙ্গে পথে নেমে এল। আরও কয়েকজন এলেন তাদের সঙ্গে।

আলমোড়ার বাসে তখনও বেশি যাত্রী ওঠে নি। টিকিট কেটে আমরাও উঠে পড়লুম। স্বাতি বলল: মিমি, আজ আমি তোমার গার্জিয়ান। তোমার দিদিকে এই কথা দিয়ে এনেছি। আজ তুমি ফাজিল ছেলেদের সঙ্গে একটিও কথা বলবে না।

বলে সন্তুর দিকে তাকাল।

সন্তু বলল: আমার মতো ভাল ছেলের সঙ্গে এক আধটা কথা বলতে পারে।

খবরদার।

বলে মিমিকে জানালার ধারে বসতে দিয়ে নিজে তার পাশে বসল। আর সন্তুকে বসতে বলল আমার পাশে।

সন্তু একটু বিমর্ষ হয়েছিল। কিন্তু বাস ছাড়বার পরে চমকে উঠল। স্বাতি এক ঠেলায় তাকে তুলে দিয়ে নিজে আমার পাশে এসে বসল। আর সন্তু আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে মিমির পাশে ধপ করে বসে পড়ল। কৃতজ্ঞতায় দু চোখ তখন তার ছলছল করছে।

স্বাতি বলল: কিছু দেখতে পাচ্ছ?

বললুম: না।

কিছু তো দেখতে পাবে না! এ মনটাই তোমার নেই। তুমি এখন আলমোড়ার কথা ভাববে, ভাববে এই পথে আরও কত দেখবার জায়গা আছে।

বলে তার ব্যাগের ভিতর থেকে দুখানি সরকারী বই বার করে দিল।

রানীখেত আর আলমোড়ার উপরে লেখা নানা তথ্য কথা। দু একটা পাতা উল্টে বেশ হতাশ হয়ে গেলুম। অনেক নতুন জায়গার নাম আছে, মাইলের হিসেবও আছে, কিন্তু কোন মানচিত্র নেই। রানীখেত ও আলমোড়ার মাঝামাঝি কোনখান থেকে একটা পথ বেরিয়েছে, কিন্তু মানচিত্রের অভাবে চোখের সামনে

কিছুই ফুটে উঠছে না। রানীখেত থেকে নৈনিতাল ও কাঠ-গোদামের পথ একই, অন্য দিকে আলমোড়ার পথ। এই পথ থেকেই যে কৌসানির পথ বেরিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কৌসানির পথেই বাগেশ্বর যেতে হয়, সেখান থেকে পিণ্ডারি গ্লেসিয়ার। রামনগর অন্য দিকে। দ্বারা হাটের পথ বোধ হয় আর এক দিকে, এই পথ ধরেই বদ্রীনাথের দিকে যেতে হয় বলে শুনেছি। আলমোড়া থেকেও অনেকগুলি জায়গায় যাবার বাস আছে। কাঠগোদামের একটা সংক্ষিপ্ত পথও আছে। বাগেশ্বরের পথ বোধ হয় রানীখেতের দিকে খানিকটা এগিয়ে পাওয়া যায়। এ ছাড়া পিথোড়াগড় ও লোহাঘাটে যাবার পথ। লোহাঘাটের নাম আগে শুনি নি। শুনেছি পিথোড়াগড়ের নাম। টনকপুর থেকে চম্পাবতের উপর দিয়ে পিথোড়াগড়। তার পরে আস্কোট, গার্বিয়াং হয়ে লিপুলেক পাস পেরিয়ে তিব্বত। যাত্রীরা আগে এই পথেই মানস সরোবর ও কৈলাসে যেত। একখানা মানচিত্র না হলে এই সব পথঘাটের সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা হয় না।

স্বাতি বলল ঃ তোমাকে এমন চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন ?

আমি সত্যি কথাই বললুম ঃ তোমার এই বই দেখে আমি কোন হদিস পাচ্ছি না।

স্বাতি বলল ঃ সেই তো ভাল। নিজের চোখেই সব দেখে নেব।

তার পরে বলল ঃ বাবাকে আমাদের পৌঁছনো সংবাদ দিয়েছি তারে। কাল চিঠি লিখব। কেদারনাথের খবরও দেব।

তুমি কি সত্যিই যাবে ?

আর বাধা কিসের! মানুষের মনই তো বাধা, সেই মন স্থির হলেই বাধা দূর হয়ে যায়।

আমি হাসলুম তার কথা শুনে। আর স্বাতি বলল ঃ হাসলে যে!

বললুম ঃ তোমার কথা শুনেই হাসলুম।

তুমি কি অন্য কোন বাধার কথা ভাবছ ?

না।

তবে কী ভাবছ ?

ভাবছি, যদি সত্যিই সেখানে যেতে হয় তো কিছু ভাবা দরকার।

স্বাতি বলল: আগে তোমার বন্ধুরা যাত্রা করুন, তার পরে ভাবব।

তাতে নিজেদেরই সময় নষ্ট হবে।

স্বাতি বলল: তোমার বিশ্রামও হবে। আর এই অবসরে এদিকে যা কিছু দেখবার আছে—

বললুম: বিশেষ কিছুই নেই।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: চৌবাত্তিয়া নামে একটা ফলের বাগান আছে মাইল ছয়েক দূরে। শহরের সব চেয়ে উঁচু জায়গা, কিন্তু বাসেই যাতায়াত করা যায়।

স্বাতি বলল: এখানে তো সর্বত্রই মোটর চলে দেখছি। একবার ওদিকে যাবে নাকি!

পরশু বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে চারি দিকে দেখেছি ঝাউ ওক সিডার ও সাইপ্রেস গাছের ঘন অরণ্য। তেমনি সুন্দর পথ ঘাট, খোলামেলা জায়গাও দেখেছি। এই শহরটি একটি মালভূমির উপরে অবস্থিত। আর এই জন্যেই বোধ হয় ভারতের বড়লাট লর্ড মেয়ো ভারতের রাজধানী সিমলা থেকে এইখানে সরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। শহরে নাকি খেলার মাঠ পোলো গ্রাউণ্ড ও গলফ্ কোর্সও আছে। ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া শহর থেকে প্রায় এক হাজার ফুট উঁচুতে। সে দিকে আমরা যাই নি। আমার মনে হল যে চৌবাত্তিয়ার দিকেই এই সেনানিবাস। আমার বইএর পাতায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললুম: সরকারী ফলের বাগানে একটি ফুট

রির্সাচ স্টেশনও আছে। আর যাত্রীদের জন্যে ফলের দোকান আর কাফেটেরিয়া।

তার পর ?

পায়ে হেঁটে মাইল দেড়েক এগিয়ে গেলে ভালু ড্যাম। একটি কৃত্রিম জলাশয় থেকে রানীখেতের জল আসে। টুরিস্টরা মাছ ধরে এই লেকে।

ঠিক এই সময়ে যাত্রীদের মধ্যে খানিকটা কলরব শুনে আমরা ফিরে তাকালুম। আমাদের কৌতূহল লক্ষ্য করে একজন যাত্রী বললেনঃ রানীখেত থেকে আমরা সাড়ে তিন মাইল এসেছি। উপত নামের এই জায়গায় গল্‌ফ খেলার মাঠ আছে, আর ফলের বাগান। কালীমন্দির দেখতে হলে এইখানে নেমে পড়বেন, কালিকার কালীমন্দির আর ফরেস্ট নার্শারি।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল : এখানেও কালীমন্দির !

বললুম : খোঁজ নিলে হয়তো দেখবে, কোনও বাঙালী প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ভদ্রলোক কী বুঝলেন জানি না। বললেনঃ রানীখেত থেকে আট মাইল দূরে এই পথের ধারেই মাঝখালি নামে একটি সুন্দর জায়গা আছে। সেখান থেকে বরফের দৃশ্য খুব চমৎকার।

আমি বললুম : রামনগরের পথ বোধ হয় উল্টো দিকে !

ভদ্রলোক বললেন : আপনারা বুঝি কাঠগোদামের দিক থেকেই এসেছেন ?

বললুম : হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বললেনঃ বুঝেছি। কাঠগোদাম স্টেশন থেকে রানীখেত বাহান্ন মাইল, আর রামনগর স্টেশন থেকে মাইল সাতেক বেশি। কিন্তু এই পথ কর্বেট ন্যাশনাল পার্কের ভিতর দিয়ে এসেছে। ফেরার সময়ে ঐ পথেই যাবেন। রানীখেতের বাস স্টেশন থেকে দু মাইল দূরে দেখবেন কো-অপারেটিভ ড্রাগ ফ্যাক্টরি,

গাছগাছড়া ও শেকড় থেকে আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি হচ্ছে। আরও তিন মাইল এগিয়ে তারিখেত নামের একটি নতুন শহর। দেশ স্বাধীন হবার আগে মহাত্মা গান্ধী এখানে কিছু দিন ছিলেন। এখনও সেই গান্ধী কুঠি দেখবেন, আর প্রেম বিদ্যালয়।

স্বাতি বলল : কর্বেট পার্কের ভেতর দিয়ে গেলে কি কিছু দেখতে পাওয়া যায় ?

যায় বৈকি। নানা রকমের পশু পাখি দেখা যায়। কপাল ভাল হলে বাঘ ভালুক হাতি হরিণ, নানা জাতের পাখি, এমন কি কুমীরও দেখতে পাওয়া যায় বলে শুনেছি।

স্বাতি আমাকে আস্তে আস্তে বলল : বই দেখে কিছু বুঝতে পারছিলে না, এঁর কাছেই জেনে নাও না কিছু।

বাঙলা কথা বুঝতে না পেরে ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললুম : এ দিকের পথ ঘাট আমরা জানি নে বলে ভারি অসুবিধে হচ্ছে।

ভদ্রলোক বললেন : সত্যি কথা বলতে কি, পথ ঘাটের খবর আমরাও ঠিক রাখি নে, রাখতেও পারি নে। পাহাড়ে রোজ পথ ঘাটের পরিবর্তন হচ্ছে। পায়ে হাঁটা পথ হচ্ছে মোটর চলার উপযোগী। আবার নতুন পথ তৈরি হবার পরে পুরনো পথের কথা সবাই ভুলে যাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলুম : রানীখেত থেকে কতগুলো পথ বেরিয়েছে ?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন : তিনটি পথ তো দেখতেই পেয়েছেন— কাঠগোদাম, রামনগর ও আলমোড়ার পথ। আর একটা পথ উত্তর দিকে দ্বারা হাটের উপর দিয়ে গনাই হয়ে কর্ণপ্রয়াগে পৌঁছেছে। কর্ণপ্রয়াগ বদ্রীনাথের পথে। শুনতে পাচ্ছি যে এই বছরই রানীখেত থেকে বদ্রীনাথের বাস ছাড়বে।

এখন ?

এখন কর্ণপ্রয়াগ পর্যন্ত বাস যাচ্ছে। সেখানে পৌঁছে বাস বদল করে বদ্রীনাথে যেতে হয়।

স্বাতি আবার আস্তে আস্তে বলল: রানীখেতে ফিরেই আমরা খোঁজ নেব।

ভদ্রলোক আবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললুম: কর্ণপ্রয়াগ বুঝি অনেক দূর?

ভদ্রলোক বললেন: খুব কাছে। মাইলের হিসেব জানি নে। তবে ভোর বেলায় বেরোলে দুপুরেই পৌঁছানো যাবে। টুরিস্ট অফিসে শুনেছি যে বদ্রীনাথের বাস এক দিনেই রানীখেত থেকে বদ্রীনাথে পৌঁছবে।

বললুম: তবে তো আমরাও এক দিনে পৌঁছতে পারব!

ভদ্রলোক বললেন: বোধ হয় না।

কেন?

কর্ণপ্রয়াগে নেমে থ্রু বাসে তো জায়গা পাবেন না, লোকাল বাসে উঠতে হবে। সন্ধ্যা বেলায় হয়তো যোশীমঠে পৌঁছবেন, আর পর দিন সকাল বেলায় বদ্রীনাথ।

স্বাতি বলল: চমৎকার। আমরা বদ্রীনাথ দর্শন করে কেদারনাথ যাব।

এখন আমাদের বাস আলমোড়ার দিকে ছুটেছে।

১৬

কখন আমরা মাঝখালি পেরিয়ে এসেছি খেয়াল করি নি। কে একজন বললেন যে মাঝখালি এ পথে নয়, রানীখেত থেকে দ্বারা হাট যাবার পথে এই জায়গা। এ কোনও বড় কথা নয় বলে আমি এই বিতর্কে কান দিলুম না। যে ভদ্রলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম: কৌসানি বলে একটি জায়গার নাম শুনেছি। সে কোন্ দিকে ?

ভদ্রলোক বললেন: রানীখেত আর আলমোড়া দু দিক থেকেই কৌসানি যাওয়া যায়। আর সত্যি বলতে কি, কৌসানি না গেলে হিমালয়ের রূপ পুরোপুরি দেখা হয় না। রানীখেত থেকে বরফের পাহাড় দেখেছেন তো ? কৌসানি থেকে এই পাহাড় আরও কাছে, আরও অনেক মহিমান্বিত মনে হয়। পরিষ্কার দিনে হিমালয়ের দু শো মাইলেরও বেশি গিরিশ্রেণী দেখা যায়।

জিজ্ঞাসা করলুম: সে জায়গা কত দূরে ?

ভদ্রলোক বললেন: রানীখেত থেকে আটচল্লিশ মাইল, আর বত্রিশ মাইল আলমোড়া থেকে।

স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

বললুম: তাহলে এই পথেরই একটা জায়গা থেকে কৌসানির পথ বেরিয়েছে !

মনে মনে হিসেব করে বললুম: আলমোড়া পৌঁছবার মাইল সাতেক আগে এই কৌসানির পথ পাওয়া যাবে পথের বাঁ ধারে।

ভদ্রলোক বললেন: কৌসানির অন্তরিক জিলা পরিষদ ডাক বাংলোয় বসে মহাত্মা গান্ধী তাঁর গীতার ভাষ্য লিখেছিলেন। এখানেই আছে তাঁর শিষ্যা সরলা বেনের আশ্রম।

আর কিছু ?

আরও কিছু দেখতে হলে আপনাদের এগিয়ে যেতে হবে। কৌসানি থেকে বাগেশ্বর আপনারা বাসেই যেতে পারবেন। আরও তেইশ মাইল উত্তরে। সেখান থেকে আরও চোদ্দ মাইল পথ কাপকোট পর্যন্ত মোটরে যাওয়া যায়। তার পরে হাঁটতে হয় ছত্রিশ মাইল।

কেন ?

তা না হলে পিণ্ডারি গ্লেসিয়ার দেখবেন কী করে !

পিণ্ডারি গ্লেসিয়ার !

অপরূপ রূপ এই হিমবাহের। একবার দেখলে সারা জীবনে ভুলতে পারবেন না।

সত্যি !

ভদ্রলোক উৎসাহ পেয়ে বললেন : পথে রাত্রিবাসের কোন দুর্ভাবনা নেই। কয়েক মাইল পরে পরেই ডাক বাংলো আছে। শেষ রাতটা কাটাতে হয় প্রায় সাড়ে দশ হাজার ফুট উঁচুতে ফুরকিয়া ডাক বাংলোয়। পিণ্ডারি হিমবাহ সেখান থেকে তিন মাইল দূরে বারো হাজার ফুট উঁচুতে। সকালে বেরিয়ে বিকেলে ফিরে আসা যায়।

ভদ্রলোকের কাছেই এই হিমবাহের বর্ণনা শুনলুম। এক দিকে নন্দাদেবী, অন্য দিকে নন্দকোট। মাঝখানে দেড় শো থেকে দু শো হাত প্রশস্ত হিমবাহ প্রায় মাইল দুই বিস্তৃত। তেরো-চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু থেকে তুষারের স্রোত নেমে এসে নিচে পিণ্ডারি নদী রূপে প্রবাহিত হয়েছে। লোকে বলে পিণ্ডার গঙ্গা। বদ্রীনাথের পথে কর্ণপ্রয়াগে মিলেছে অলকনন্দার সঙ্গে। পাহাড়ের গায়ে পরিচিত বৃক্ষলতাও আর দেখতে পাওয়া যায় না। প্রথমে ঝাউ গাছ শেষ হয়ে যায়, তার পরে ওক আর দেবদারু। ফুরকিয়ার পরে শুধু বুনো ফুল ফার্ন আর রডোডেনড্রন। হিমবাহের কাছে তৃণগুল্ম ছাড়া আর কিছু নেই।

আমি নীরবে ছিলাম। ভদ্রলোক নিজেই বললেন : এই পথে আরও দুটি জায়গা আছে দেখবার মতো। একটির নাম বিনসার। আলমোড়া থেকে আঠারো মাইল দূরে বাগেশ্বরের পথে এই জায়গাটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যে আদৃত। প্রায় আট হাজার ফুট উঁচু ঝাণ্ডিধর থেকে ত্রিশূল নন্দাদেবী প্রভৃতি কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের অনেক পাহাড় দেখা যায়। আরও একটি অদ্ভুত দৃশ্য হল চোখের ভুল। সূর্যোদয়ের সময়ে মনে হবে যেন দিগন্তের উপরে সূর্য ঘুরছে।

স্বাতি বলল : আশ্চর্য তো!

ভদ্রলোক বললেন : কিন্তু কেন এ রকম দেখায় তা কেউ বলতে পারে না।

আর কোথাও এ রকম দেখা যায় কিনা তা আমরা শুনি নি। কিন্তু ভদ্রলোক থামলেন না, বললেন : পিণ্ডারির পথে বৈজনাথ আর একটি সুন্দর জায়গা। বাগেশ্বর থেকে যাওয়া যায়, আবার আলমোড়া থেকে সরাসরিও বাস যায়। মন্দিরের জন্যে এই জায়গাটি এই অঞ্চলে পরিচিত। একটি শিবের মন্দির আছে। বৈজনাথ শিব। আর আছে লক্ষ্মীনারায়ণ. ও সত্যনারায়ণের মানুষ-প্রমাণ মূর্তি।

স্বাতি আস্তে আস্তে বলল : তোমার কপাল দেখে হিংসে হয়।

কেন ?

পথে এক একজন বেশ জুটে যায়।

বললুম : আমরাও কি অনেককে অনেক কথা বলতে পারি নে!

তা পারি।

তবে অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে। নিজেরা কিছু না বলে অন্যের কাছে শুনতে চাই। আর অন্যরা বলতে চায় বলে আমরা শুনতেও পাই।

আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছি দেখে ভদ্রলোক অন্য দিকে

মুখ ফেরালেন। বোধ হয় ভাবলেন যে আমরা তাঁর কথা শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ক্লান্ত না হলেও খানিকটা হাল্কা হবার প্রয়োজন ছিল। এক সঙ্গে বেশি কথা শুনলে কিছুই মনে থাকে না।

স্বাতি বলল : আমি কী ভাবছি জানো ?

বললুম : কেদারনাথে যাবার কথা।

কী করে জানলে ?

মানুষকে জানলেই তার মনের কথাও জানা যায়।

সব সময় না। তোমার মনের কথা—

বাধা দিয়ে বললুম : আমার মনে এখন কোন কথাই নেই।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল : কেদারনাথে যাবার নামে কোন দুর্ভাবনা মনে আসছে না !

দুর্ভাবনা কিসের ! বদ্রীনাথের বাসে যে দিন বসব, সে দিন থেকেই ভাবব সেই যাত্রার কথা।

তার আগে ?

হেসে বললুম : হাজার হাজার তীর্থযাত্রী প্রতি বছর যাচ্ছে এই সব তীর্থে। লোকে যখন হেঁটে যেত, তখনও কিছু ভাবত না। পথে চটি ছিল, ধর্মশালা ছিল। কেউ কিনে খেত, কেউ খেত রেঁধে-বেড়ে। পথের কষ্টের কথা তারা ভাবত না, ভাবত আনন্দের কথা। আমরাও তো আনন্দ পেতে যাচ্ছি !

তবে ওরা অমন ভয় পাচ্ছে কেন ?

স্বাতি যে সাধন গুপ্তদের কথা ভাবছে, তা বুঝতে পারি। বললুম : যারা ভীরু, তারাই ভয় পায়। ভয় পেলে কি বড় কিছু করা যায় !

কিন্তু আমি তোমার মতো নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

তুমি তো নিজের জন্যে ভাবছ না !

তবে ?

ভাবছ, যাহারে পেয়েছি তারে কখন হারাই !

স্বাতি তার মুখ ফিরিয়ে নিল, কোন উত্তর দিল না।

দেখতে দেখতে অনেকটা পথ আমরা নিঃশব্দে অতিক্রম করে এলুম। দু একটি লোকালয়ে আমাদের বাস স্বল্পক্ষণের জন্যে দাঁড়িয়েছিল। কেউ চা, কেউ পান খেয়েছেন, কেউ ধরিয়েছেন সিগারেট। এক সময় আমাদের সহযাত্রী ভদ্রলোক বললেন: এই বারে একটু নজর রাখবেন।

কেন?

কোশী নদীর পুল পেরোতে হবে, আর তারই ধার দিয়ে কৌসানির পথ উত্তরে গেছে।

রানীখেতে যাবার পথে এই কোশী নদী আমরা পেরিয়েছি। নদী না পেরিয়ে আলমোড়ার পথ ধরলে আর আমাদের এই নদী পেরোতে হত না। খানিকক্ষণ পরই আমরা কোশীর পুল পার হলুম, আর কৌসানির পথ দেখলুম। ভদ্রলোক বললেন: আলমোড়া এখান থেকে ছ মাইল।

স্বাতি বলল: তুমি সাত মাইল বলেছিলে।

বললুম: খুব বেশি ভুল করি নি।

পথে মাঝে মাঝে চেরি গাছ দেখছি, আর এক রকমের বুনো গাছ।

ভদ্রলোক বললেন: কুমায়ুনে আলমোড়া খুব প্রাচীন শহর। চার শো বছর আগে রাজা কল্যাণচাঁদ এই শহর পত্তন করেছিলেন। গত শতাব্দীতে এটি বৃটিশের হাতে এসেছে। সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু এই শহরটির অন্য রকম মায়া। দু মাইল লম্বা এই শহরের চারি দিকে পাহাড়। আর পাহাড়ের মাথায় মাথায় মন্দির। শহরের বাজারটি আগাগোড়া পাথরে বাঁধানো দেখবেন। তার দু ধারে শ্লেট পাথরের বাড়ি, তার ছাদও শ্লেটের। বাড়িগুলি এক তলা নয়, দোতলা তেতলা চার তলা সব বাড়ি।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : শহরে আর কী দেখবার আছে ?

ভদ্রলোক বললেন : বিশেষ কিছুই নেই। বাজার হাট কোর্ট কাছারি তো আর দেখবার জিনিস নয়। বরং বাজারের কাছে একটা পাহাড়ের উপরে নন্দাদেবীর মন্দির দেখবেন। চারি দিকের দৃশ্য আপনাদের ভাল লাগবে।

আর কিছু ?

আরও কিছু দেখতে হলে দিন কয়েক থাকতে হবে। সে সব জায়গায় যেতে আসতে বেশ কিছু সময় লাগে, পরিশ্রমও হয়।

এই সব জায়গার কথা ভদ্রলোক খুব সংক্ষেপে বললেন। আড়াই মাইল দূরে সিমটোলা একটি চমৎকার পিকনিকের জায়গা। সেখান থেকে মাইল খানেক এগিয়ে কালিমাট। কালো মাটির জন্যে এ জায়গার নাম হয়েছে কালিমাট। আর এখান থেকে হিমালয়ের বরফের দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়। পায়ে হাঁটা পথে আরও আধ মাইল এগিয়ে গেলে একটা পাহাড়ের মাথায় কসর দেবীর পুরনো মন্দির। দেবদারু বনে ঘেরা এই জায়গা থেকে শহরের দৃশ্যও দেখা যায়। আবার হিমালয়ের বরফও দেখা যায়। পরিষ্কার দিনে নন্দকোট থেকে চৌখাম্বা পর্যন্ত সমস্ত শৃঙ্গগুলিই দেখতে পাওয়া যায়। অনেক বিদেশী নাকি এইখানে এসে বসবাস করছেন ধ্যানের জন্যে।

সাড়ে ছ মাইল দূরে মাটেলায় যাওয়া যায় মোটরে চেপে। পাহাড়ের উপরে একটি সুন্দর বাগান আর জলের পাম্পিং স্টেশন আছে। পরিষ্কার দিনে ত্রিশূল শৃঙ্গটি দেখা যায়, আর ইচ্ছা করলে একটা লগ্ কেবিনে রাত্রিবাসও করা যায়। হীরা ডুংরি দু মাইল দূরে। সেখানে একটি বাগান আর জলাশয় আছে। চার মাইল দূরে চিতাই নামে একটা জায়গায় বাসে যাওয়া যায়। সেখানেও একটি মন্দির আছে। আর হিমালয়ের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখবার জন্যে যাত্রীরা ভিড় করে ব্রাইটন এণ্ড কর্ণারে।

এইবারে আমরা আলমোড়ার লোকালয় দেখতে পেলুম। মনে হল যে একটা সমতল পথে আমরা শহরের অন্য প্রান্তে পৌঁছে যাব।

ভদ্রলোক বললেন: কাছাকাছি আরও দু একটি জায়গা আছে। ন মাইল বাসে গিয়ে মাইল দুই পায়ে হেঁটে পৌঁছনো যায় কাটারমলে। প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে একটি সূর্যের মন্দির আছে। আর এই মন্দির থেকে মাইল খানেক এগিয়ে গেলে আলমোড়া শহরের সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় বিকুট বন থেকে।

সামনে আলমোড়ার ঘন বসতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেই দিকে চেয়ে ভদ্রলোক বললেন: সিতলাখেত নামে একটা জায়গা থেকে কৌসানির মতো বরফের পাহাড় দেখা যায়। বনের পথ ধরে আট মাইল হাঁটতে না চাইলে মোটরে বাইশ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়। কাঠপুরিয়া পর্যন্ত ষোল মাইল পথ বাসেও যাওয়া যায়। সিতলাখেত থেকে দু মাইল দূরে সিয়াহি দেবীতে দুর্গার মন্দির আছে।

এই বারে আমরা শহরের দোকান পাট হোটেল রেস্তোরাঁ দেখতে পেলুম। আর তার পরেই বাস স্ট্যাণ্ডে এসে আমাদের বাস থামল। ভদ্রলোক যে এই অঞ্চলের লোক তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা তো আজই ফিরবেন মনে হচ্ছে!

বললুম: আপনি?

ভদ্রলোক বললেন: কাজ হয়ে গেলে আজই ফিরব। তা না হলে রাতে এখানেই থাকতে হবে।

বলে নেমে গেলেন।

স্বাতি এবারে মিমির দিকে তাকাল। বলল: তুমি সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবে।

সন্তু করুণ ভাবে বলল: সারাক্ষণ!

তার উত্তরে আমি বললুম : তুমি আমার সঙ্গে।

মনে হল যে এই দীর্ঘ পথে তাদের বিব্রত না করার জন্যে যেটুকু কৃতজ্ঞতা তারা সঞ্চয় করেছিল তা এক মুহূর্তে ফুরিয়ে গেল। আর তা লক্ষ্য করে স্বাতি আমার দিকে চেয়ে একটুখানি হাসল। আমি বললুম : তুমি মিমিকে নিয়ে নন্দাদেবীর মন্দিরে যাও। সন্তুকে নিয়ে আমি একটু দূরের পথে ঘুরে আসি।

কাতর স্বরে সন্তু বলল : এই পাহাড়ে আমাকে হাঁটতে হবে ?

বললুম : চল না, একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে বরফের দৃশ্য দেখে আসি।

আমাদের সহযাত্রীরা যে যার মতো এগিয়ে গেলেন। আমরা বাস স্ট্যাণ্ডেই অপেক্ষা করলুম খানিকক্ষণ। টুরিস্ট অফিস দেখলুম, আর হোটেল রেস্তোরাঁ। সন্তু আর মিমি অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবে আমাদের সঙ্গে রইল। তার পরে সহযাত্রীরা অদৃশ্য হবার পরে স্বাতি বলল : সন্তু যদি বরফের পাহাড় দেখতে না চাও তো মিমিকে নিয়ে নন্দাদেবীর মন্দিরে যাও। আমি যাই বরফের পাহাড় দেখতে।

সন্তু যেন লাফিয়ে উঠল, মিমির হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করছিল। তাই দেখে স্বাতি ধমক দিল : অসভ্যতা কোরো না।

না স্বাতিদি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বলে মিমিকে ডেকে নিয়ে এক নিমেষে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

স্বাতি সহাস্যে বলল : এসো, আমরা অন্য দিকে যাই।

বলে যে দিক থেকে এসেছি, সে দিকে না গিয়ে আমরা সামনের দিকেই এগিয়ে গেলুম। পথের ধারে একটা চায়ের দোকানে বসে চা খেয়ে নিলুম আগে। তার পরে খানিকটা এগিয়ে দেখলুম যে শহর এই দিকে শেষ হয়ে যাচ্ছে। একজন পথচারীকে প্রশ্ন করে জানলুম যে এই প্রশস্ত রাজপথ ধরে

অনেকটা এগিয়ে গেলে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম। আর উপরের দিকে উঠবার একটি পায়ে-চলা পথ দেখিয়ে বলল যে ঐ দিকে উঠলে আবার সমতল পথ পাওয়া যাবে শহরের মাঝখানে যেতে। কোর্ট কাছারি দেখে বাজার হাট ছাড়িয়ে নন্দাদেবীর মন্দিরেও পৌঁছনো যাবে। কাজেই আমরা আর নির্জন পথে না এগিয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগলুম আর অল্পক্ষণ পরেই পেলুম সমতল পথ।

আমাদের সহযাত্রী ভদ্রলোক ঠিকই বলেছিলেন। এই পথটি শ্লেট পাথরে বাঁধানো, দু পাশের ঘরবাড়িও শ্লেট পাথরের। স্বাতি বলল: হাঁটতে বেশ লাগছে, তাই না!

বললুম: নতুন জায়গায় এলে সব কিছুই ভাল লাগে।

জায়গাটা ভাল হওয়া চাই।

তা না হলেও ক্ষতি নেই। মনের আলোয় খারাপও ভাল লাগে।

আমরা নিজেরাই পথ চিনে আদালত এলাকায় এসে উপস্থিত হলুম। লোকজন ব্যস্ততা দেখে বুঝতে আমাদের অসুবিধা হল না। মনে হল যে ভিতরে গিয়ে কোন জায়গা থেকে পাহাড়ের ভাল দৃশ্য দেখা যাবে। কিন্তু স্বাতি রাজী হল না। বলল: চল, তার চেয়ে নন্দাদেবীর মন্দিরে গিয়ে খানিকক্ষণ বসি।

বললুম: সেখানে যাওয়া কি ঠিক হবে?

কেন?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: সন্তদের বিব্রত করা হবে না!

স্বাতি হেসে বলল: আমরা কি ওদের গুরুঠাকুর!

কিন্তু অভিভাবক তো।

সত্যি তা হলে ওরা বেঁচে যেত।

আলমোড়া শহর এখন আর বড় বলে মনে হচ্ছে না। হাঁটতে

হাঁটতেই আমরা বাজারের কাছে পৌঁছে গেলুম। তারই শেষ প্রান্তে একটা পথ উপরের দিকে উঠেছে। দু তিনজন স্ত্রীলোক উপর থেকে নেমে আসছিল। তাদের হাতে পূজার উপকরণ দেখেই বুঝতে পারলুম যে ঐ পথেই মন্দিরে যেতে হবে। কাউকে জিজ্ঞাসা না করেই আমরা এগিয়ে গেলুম। আর অল্প খানিকটা উঠেই পৌঁছে গেলুম মন্দিরের প্রাঙ্গণে।

পাহাড়ের মাথায় এই মন্দির। কিন্তু অনেকখানি প্রশস্ত স্থান মন্দিরের চারি ধারে। সন্তু আর মিমিকেও আমরা দেখতে পেলুম। একটুখানি আড়ালে খুব কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে। বললুম: ও দিকে যেয়ো না।

স্বাতি আমার কথা মেনে নিল, বলল: এই দিকেই বসা যাক।

বসলুম দুজনে। স্বাতিই প্রথমে কথা বলল। জিজ্ঞাসা করল: নন্দাদেবী কোন দেবতা?

বললুম: হিমালয়ের চূড়ো একটি। সমগ্র কুমায়ুনের জাগ্রত দেবতা। কৈলাসে যেমন শিব, কুমায়ুনে তেমনি নন্দাদেবী। তাঁর মন্দির আছে নানা স্থানে। শ্রাবণ মাসে মেলা বসে নানা স্থানে— নৈনিতাল রানীখেত ভাওয়ালি আলমোড়ায়। নন্দাদেবীর উদ্দেশে এ অঞ্চলের লোক তীর্থযাত্রা করে। রূপকুণ্ডের কথা মনে পড়ে?

না।

আজ থাক সে কথা।

স্বাতি সেই কথা শোনার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করল না। তার ভাল লেগেছে এই পরিবেশ, নিঃশব্দে তা উপভোগ করতে চাইছে। আমিও আর কোন কথা বললুম না।

মধ্যাহ্নের সূর্য বোধ হয় পশ্চিমের দিকেই খানিকটা হেলেছে। খানিকটা উত্তাপ লাগছে দেহে।

১৭

স্বাতি তার হাতের ঘড়ি দেখল এক বার, বলল : তোমার ক্ষিদে পায় নি তো ?

বললুম : বিশ্রামের এ রকম জায়গা বোধ হয় আর নেই।

তবে এইখানে বসেই আলমোড়া দেখা যাক।

বলে স্বাতি তার ব্যাগের ভিতর থেকে আলমোড়ার বইখানি বার করে দিল। বাসে সে দুখানি বই আমার হাতে দিয়েছিল। সে বই সে কখন আমার হাত থেকে নিয়ে ব্যাগে পুরেছিল, তা খেয়াল করি নি। বলল : এ দিকে ব্যাপারটা বোঝা যায় কিনা দেখ তো !

বললুম : আলমোড়ার পূর্ব দিকটা এবারে বুঝে নিতে হবে।

স্বাতি বলল : রূপকুণ্ডের কথা আগে বল।

বুঝতে পারলুম যে স্বাতি এমনি একটি জায়গায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রূপকুণ্ডের কথা শুনবে বলেই তখন কৌতূহল প্রকাশ করে নি। বললুম : কোন্ বছরেব কথা মনে নেই। সেবারে রূপকুণ্ডের পথে বরফের উপরে অনেক নরকঙ্কাল দেখে কাগজে খুব হৈ চৈ হয়েছিল। নানা রকম অনুমানের কথাও পড়েছিলুম। তার পরে শুনেছিলুম যে এই অঞ্চলের লোকের কাছে সে কোনও নতুন কথা ছিল না। গত শতাব্দীর শেষের দিকেই তারা এই কথা জানত, বিশ্বাস করত যে তীর্থযাত্রীরাই সেই পথে প্রাণ হারিয়েছিল কোনও দুর্ঘটনায়। এক জন দুজন নয়, অসংখ্য মানুষ তাদের প্রাণ দিয়েছিল নন্দাদেবীর জন্যে।

সবিস্ময়ে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম : অমরনাথে যেমন প্রতি বছর যাত্রা হয়, রূপকুণ্ডে তেমন নয়। সেখানে যাত্রা হয় বারো বা চব্বিশ বছর পর। পণ্ডিতগণ গ্রহ নক্ষত্রের সমাবেশ দেখে বলেন যে এই বছর রাজ জাঠ তীর্থযাত্রা

হবে। আর সেই কথা শুনে গাড়োয়াল আর কুমায়ুনের সমস্ত ধর্ম-প্রাণ যাত্রী এসে জমা হবে কর্ণপ্রয়াগের কাছে নৌতি গ্রামে। ত্রিশূল শৃঙ্গের পাদদেশে হোম কুণ্ডিতে আছে নন্দাদেবীর মন্দির। সেইখানে এই যাত্রার শেষ।

রূপকুণ্ড কোথায়?

এই পথেই রূপকুণ্ড। আঠারো হাজার ফুট উচুঁতে 'একটি আশ্চর্য সুন্দর জলাশয়। বিদেশীরা বলে লেক অফ মিস্ট্রি অ্যাণ্ড ডেথ্। মানস সরোবর নয়, মরণ সরোবর। ২৩৩৬০ ফুট উচু তুষারাবৃত ত্রিশূল শৃঙ্গের নিচে দিয়ে আরও চার মাইল এগিয়ে যেতে হয়। রূপোর পাল্কিতে নন্দাদেবীর সোনার মূর্তি নিয়ে যাত্রীরা এগিয়ে চলে। সকলের আগে একটি চার শিঙের ভেড়া। এই তীর্থযাত্রার জন্যেই নাকি এই ভেড়ার জন্ম হয়। তার পিছনে দণ্ড ও পতাকাধারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দল ও হাজার হাজার তীর্থযাত্রী। যে পথে তারা যায় তার নাম ভ্যালি অফ ডেথ্। মৃত্যু উপত্যকা। সর্বত্র মৃত্যু-ভয়। কিন্তু সমস্ত বিপর্যয় উপেক্ষা করে নির্ভীক যাত্রীরা যায় এগিয়ে। এক বার এমনিই একটি দল রূপকুণ্ডের ধারে বরফে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। এখন সেই সব কঙ্কালই নতুন যাত্রীদের রূপকুণ্ড থেকে হোমিও কুণ্ডের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

স্বাতি ভয়ে ভয়ে বলল: আশ্চর্য সাহস!

বললুম: একটা কঠিন চড়াই ভেঙে উঠতে হয় কালুয়া বিনায়ক। সিদ্ধিদাতা গণেশের একটি কালো পাথরের মূর্তি, প্রায় আড়াই ফুট উচু। এই হল নন্দাদেবীর মন্দিরে প্রবেশের দ্বার।

তুমি এত কথা জানলে কোথায়?

বিশ্বাস হচ্ছে না?

বিশ্বাস করছি বলেই কৌতূহল হচ্ছে।

বললুম: যা দেখতে পাই নে তাকে দেখবার জন্যে, আর যা জানবার উপায় নেই তাকে জানবার জন্যে মানুষের তপস্যা। আমি

যে দিন বিশ্বাস করেছিলুম যে এ সব জায়গা আমি কোন দিনই দেখতে পাব না, সে দিন বই আর কাগজ পড়েই সব কিছু জানবার চেষ্টা করেছিলুম। পশ্চিমে ত্রিশূল আর পূর্বে ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নন্দাদেবী ২৫৬৪৫ ফুট উঁচু। ত্রিশূলকে বাঁ হাতে রেখে নন্দাদেবীর পাদদেশে পৌঁছে যাত্রীরা প্রণাম করে নন্দাদেবীকে।

স্বাতি বলল : নন্দাদেবীকে তুমি ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বলছ কেন? হিমালয়ে তো আরও অনেক উঁচু শৃঙ্গ আছে!

বললুম : মাউন্ট এভারেস্ট আর মাকালু নেপালে, কাঞ্চনজঙ্ঘা নেপাল ও সিকিমের সীমানায়, আর নঙ্গ পর্বত কাশ্মীরের উত্তরে। নন্দাদেবীই ভারতের নিজস্ব এবং সর্বোচ্চ।

স্বাতি বলল : আজ অনেক নতুন কথা বলছ!

বললুম : এ সবই পুরনো কথা।

আমার কাছে নতুন। আমার মতো অনেকের কাছেই এ সব কথা নতুন মনে হবে।

বোধ হয় তা মনে হবে না। হিমালয়ের উপরে এত বই বেরিয়েছে যে নতুন কথা বোধ হয় কেউই বলতে পারবে না।

বলে আমি পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসবার চেষ্টা করলুম। বললুম : ম্যাপে দেখেছিলুম যে পিণ্ডারি গ্লেসিয়ারের ঠিক উত্তরে নন্দাদেবী। আর যাত্রীরা এক সময় পিণ্ডার গঙ্গার উপত্যকা ধরে রূপকুণ্ডের দিকে এগোয়। রানীখেত আর আলমোড়া থেকে যারা যাত্রা করে, তারা বাসে গরুড় উপত্যকার উপর দিয়ে গোয়ালডামে যায়। সেখান থেকে পিণ্ডার গঙ্গার তীরে তলোয়ারি। তার পরে পায়ে হাঁটা পথ। ঘোড়াও চলে। লোহাজুং নামে একটি গিরিপথ পেরিয়ে যেতে হয়। কর্ণপ্রয়াগ থেকেও পিণ্ডার গঙ্গার ধারে ধারে এগিয়ে এইখানে পৌঁছানো যায়। অনেকে নন্দপ্রয়াগ থেকেও মন্দাকিনী নদীর উপত্যকা ধরে এইখানে পৌঁছন। আরও অনেক ছোট ছোট জায়গার নাম পড়েছিলুম, সে সব এখন আর মনে নেই।

স্বাতি বলল : যথেষ্ট মনে আছে।

বললুম : পথের দুর্গমতার কথাও কিছু মনে আছে। বরফের মাঠের উপর দিয়ে পথ, বরফের দেওয়ালের মধ্য দিয়ে পথ, বরফ পাহাড়ের ওপর দিয়ে পথ। একটি সংকীর্ণ খাড়াই পথ অতিক্রম করতে হয় প্রাণ হাতে নিয়ে, তারই নাম ভ্যালি অফ ডেথ্।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : কিন্তু কিসের টানে এত যাত্রী ঐ দুর্গম পথ অতিক্রম করার সাহস পায় ?

সংক্ষেপে বললুম : টান নন্দাদেবীর।

নন্দাদেবী কি কোনও দেবতা ?

নন্দা গৌরীর নাম, হিমালয় কন্যা পার্বতী।

স্বাতি যেন চমকে উঠল।

বললুম : খুব আশ্চর্য হচ্ছ তো! এ দিকে নন্দাদেবী, আর গৌরীশঙ্কর নাম মাউণ্ট এভারেস্টের। পুরাকালে মাউণ্ট এভারেস্ট এই নামেই পরিচিত ছিল।

স্বাতি নিঃশব্দে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বললুম : আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ রকম নাম আরও আছে। অন্নপূর্ণা, নীলকণ্ঠ। এ অঞ্চলের লোক বলে, নন্দাকোট ও নন্দাঘুন্টিও নন্দার নামে। নন্দাই কুমায়ুনের দুর্গা।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমি কোনও বইএ একটা জোড়া মূর্তির ছবি দেখেছিলুম। এ দিকে নাকি নন্দাদেবীর পূজার সময় জোড়া মূর্তির পূজা হয়। লেখক লিখেছিলেন যে তাঁরা দুই বোন নন্দা ও সুনন্দা, কুমায়ুনের এক চাঁদ রাজার দুই কন্যা। মহিষ ও ছাগরূপী রাক্ষসকে বধ করে দুর্গা তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। তাঁদেরই স্মরণ করা হয় নন্দাদেবীর পূজার সময়। শাজাহান বাদশাহর সমসাময়িক বাজবাহাদুর চাঁদ সমগ্র কুমায়ুনে নন্দাদেবীর নামে এক উৎসবের প্রচলনা করেছিলেন। সেই উৎসব এখনও চলে আসছে।

হঠাৎ স্বাতি আমার একটা হাত চেপে ধরল। এটা কিসের

সঙ্কেত বুঝতে না পেরে আমি চারি ধারে তাকালুম। দেখলুম সন্তু আর মিমি ওধার থেকে আসছে, আমাদের সামনে দিয়ে নিচে নেমে যাবে। ভেবেছিলুম নিঃশব্দে থাকব। কিন্তু সন্তুর চোখ আমার উপরে পড়তেই সে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। তাই বললুম: লজ্জা কি ব্রাদার! ভেবেছিলুম, ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা আমাদেরই আগে মনে পড়বে। তাহলে আমরাই আগে নেমে যেতুম।

মিমি বলল: আপনারা ফিরবেন না?

স্বাতি উত্তর দিল: তোমরা এগিয়ে যাও।

আর আমি বললুম: একটু আড়ালে খেও।

সন্তু কোনও উত্তর না দিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেল। আর স্বাতি সহাস্যে বলল: লজ্জা পেয়েছে খুব।

কিন্তু তুমি তো লজ্জা পেতে না!

স্বাতি বলল: মনে পাপ থাকলেই ভয়, আর লজ্জা অসভ্যতার জন্যে।

কিন্তু ওরা তো কোনও অসভ্যতা করে নি।

তাহলে লজ্জা পাওয়াও উচিত ছিল না!

বলে সে উঠে দাঁড়াল।

ঘড়িতে তখন দুপুর হয়েছে। এর পরে আহারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। আমার হাতের বইখানা আবার তার ব্যাগে পুরে বলল: চল।

দুজনে আবার হাঁটতে শুরু করলুম। এবারে একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাবার জায়গা খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু নিচে নামার পথে সে রকম কোনও হোটেল বা রেস্তোরাঁ চোখে পড়ল না। শেষ পর্যন্ত বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকলুম।

হোটেলের ঘরগুলো স্বাতি দেখে এল, বলল: নামেই হোটেল। ধর্মশালা বললেই ভাল হত।

বেয়ারা খবর দিল, নিরামিষ আহার পাওয়া যাবে, আমিষ আর নেই।

স্বাতি বলল : তাই দাও।

কিন্তু পিছন থেকে এক ভদ্রলোক যেন গর্জে উঠলেন, বললেন : নেই মানে !

তার পরে স্থানীয় ভাষায় যা বললেন, তার মানে আমরা বুঝতে পারলুম না। লোকটি অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে ভিতরে চলে গেল।

খাবারের সঙ্গে ছোট দু প্লেটে মাংস এল। কিন্তু তার চেহারা দেখেই স্বাতি বলল : না না, এ চাই নে, এ নিয়ে যাও।

কেন জানি না, আমারও খুব অপ্রবৃত্তি হয়েছিল মাংসের চেহারা দেখে। মনে হয়েছিল যে কোথাও ফেলে দেওয়া জিনিস কুড়িয়ে এনেছে।

খেয়ে দেয়ে পয়সা মিটিয়ে পথে নামবার পরেও সেই অপ্রবৃত্তি মনে জেগে ছিল। স্বাতি বোধ হয় কিছু সন্দেহ করেছিল, বলল : এসো, আজ পান খাওয়া যাক।

রাস্তার ধারের একটা পানের দোকানে পান কিনে আমরা দুজনেই আজ পান খেলুম।

স্বাতি বলল : এবারে ফেরা তো ! চল, আগে ভাগেই আমরা বাসে গিয়ে বসি।

বললুম : তোমার বইখানাও তাহলে শেষ করা যাবে।

আবার কিন্তু কেন ?

সন্তরাও কি এই বাসে ফিরবে ! আমি যে মিমির দায়িত্ব নিয়ে বসে আছি !

ঠিক এই সময়েই আমরা তাদের দেখতে পেলুম। তারাও এই দিকে আসছে। নিশ্চিন্ত হয়ে বললুম : আর ভাবনা নেই।

স্বাতি বলল : উঁহু, ওদের কাছে আসতে দাও। ওদের এই বাস ধরবার কথা বলে তবে আমরা বাসে গিয়ে উঠব।

ততক্ষণে তারা কাছে এসে গিয়েছিল। স্বাতি সেই নির্দেশ জারি করে আমাকে বলল : এই বারে চল।

বাসে যাত্রী তখন বেশি নেই। একটা পছন্দ মতো জায়গায় উঠে বসতেই স্বাতি তার আলমোড়ার বইখানি বার করে দিল। আমিও তার পাতা উল্টে সব কিছু দেখে নিলুম।

রানীখেতের পথে আমাদের সহযাত্রী ভদ্রলোক অনেক কথাই বলেছিলেন। নেপাল সীমান্তের কাছে মিটার গেজ লাইনের শেষ স্টেশন হল টনকপুর। সেখান থেকে সাতচল্লিশ মাইল উত্তরে চম্পাবত হল কুমায়ুনের চাঁদ রাজাদের প্রাচীন রাজধানী। দুর্গা রত্নেশ্বর ও বলেশ্বরের সুন্দর মন্দির আছে। বলেশ্বরের মন্দিরে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশের মূর্তি। মন্দিরের ছাদেও সুন্দর পৌরাণিক চিত্র উৎকীর্ণ। মায়াবতী আশ্রম এখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে। রামকৃষ্ণ মিশনের এই আশ্রমে প্রবুদ্ধ ভারতের অফিস আছে জানি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই আশ্রমে এসেছিলেন। সে কথা পড়েছি তাঁর 'মায়াবতীর পথে' বইএ।

আলমোড়া থেকেও এই আশ্রমে আসা যায়। পঁচাত্তর মাইল দূরে লোহাঘাট পর্যন্ত নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। লোহাঘাট থেকে মায়াবতী আশ্রম পায়ে হাঁটা পথে তিন মাইল আর মোটর পথে ছ মাইল।

পিথোড়াগড় হল এ অঞ্চলের জেলা শহর। আলমোড়া থেকে মোটর পথে চুয়াত্তর মাইল। আর পায়ে হাঁটা পথে তিপ্পান্ন মাইল। চম্পাবত থেকে আটচল্লিশ মাইল দূরে। টনকপুর স্টেশনে নেমে পিথোড়াগড়ে আসাই সুবিধে। মোটর পথে পঁচানব্বুই মাইল। আর আলমোড়া এক শো তিরিশ মাইল দূরে। আলমোড়ায় আমরা কাঠগোদাম থেকে যাই, কখনও নৈনিতাল হয়ে, কখনও বা রানীখেত হয়ে। কিন্তু টনকপুর থেকে যাই না। এ পথে গেলে চম্পাবর্তে নেমে মায়াবতী আশ্রম দেখেও যাওয়া যায়। লোহাঘাট হয়ে

আলমোড়া কাছে, পিথোড়াগড় ঘুরেও যাওয়া যায়। পাহাড়ে তো আজকাল পায়ে হেঁটে চলতে হয় না, মোটরে চেপে পাহাড়ে বেড়ানো আজকাল শৌখিনতায় পরিণত হয়েছে।

আমাদের বাস ছাড়তে আরও কিছু দেরি ছিল। ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টর এখনও আসে নি। রৌদ্রের উত্তাপ বেশ কমে এসেছে, কিছুক্ষণের মধ্যে যাত্রা করলে অন্ধকার হবার আগেই রানীখেতে পৌঁছতে পারব।

স্বাতি বলল : কেন জানি না আমার কৈলাসের কথা মনে পড়ছে।

বললুম : মনে পড়বেই।

কেন ?

এখান থেকেই কৈলাসের পথ শুরু হয়েছে।

সত্যি !

বললুম : কৈলাসে যাবার অন্য পথও আছে। কিন্তু পুরনো ভ্রমণ-কাহিনীতে আমি এই পথই প্রশস্ত বলে শুনেছি। মানস সরোবর ও কৈলাস যাত্রা যখন নিষিদ্ধ ছিল না, তখন নানা দেশ থেকে যাত্রীরা এসে আলমোড়ায় জমা হত। তার পরে এক সঙ্গে যাত্রা করত। এই পথ দূর যত, দুর্গমও তত, বিপজ্জনকও ছিল। কেদার-বদরীর পথের মতো কোনও চটি ছিল না পথের ধারে, সমস্ত ব্যবস্থা সঙ্গে নিয়ে যেত হত। শুধু খাদ্য নয়, রাত্রিবাসের তাঁবু পর্যন্ত। কতকটা অমরনাথের মতো। কিন্তু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। ভারতের সীমান্তে লিপুলেক পাস পেরিয়ে ওপারে তিব্বত। বাঁয়ে রাক্ষস তাল আর ডানে মানস সরোবর। মাঝখান দিয়ে কৈলাসের পথ। যাত্রীরা মানস সরোবরে স্নান করে। কৈলাস প্রদক্ষিণের পথে বরফে আচ্ছন্ন গৌরীকুণ্ডেও একবার ডুব দিয়ে তুষারমৌলি কৈলাসকে প্রণাম করে দেশে ফেরে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়েছিল। বললুম :

কোনও মন্দির নেই, কোনও দেবতা নেই। শুধু পাহাড় আর বরফ। এই আমাদের দেবতা। এই দেবতাকে দেখবার জন্যই যুগযুগান্তর ধরে যাত্রীরা কৈলাসে গেছে।

আস্তে আস্তে স্বাতি বলল: এমন সংক্ষেপে বললে কি ভাল লাগে!

হেসে বললুম: আমি তো কৈলাসে যাই নি!

বইএ পড়েছ তো!

সব কথা কি মনে আছে!

স্বাতি বলল: যা মনে আছে, তাই আমার কাছে যথেষ্ট। তার আগে—

বললুম: বল।

মিমিরা উঠেছে কিনা দেখে নিই।

বলে চারি ধারে তাকাল।

আমি হেসে বললুম: চুপি চুপি উঠে ঐ কোণার দিকে বসেছে।

স্বাতি নিশ্চিন্ত হয়ে বলল: এই বারে বল।

আমার যত দূর মনে ছিল, আমি তা সংক্ষেপে বললুম। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে আষাঢ়ের প্রথমে হল কৈলাস যাত্রার প্রশস্ত সময়। আগে আলমোড়া থেকেই হাঁটতে হত, এখন পিথোড়াগড় থেকে আস্কোট পর্যন্ত মোটর বাস চলে। পিথোড়াগড়ে আগে চাঁদ রাজাদের দুর্গ ছিল, এখন আর সে দুর্গ নেই। তার বদলে কোর্ট কাছারি হয়েছে। আগে এখানে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে পাঁচ দিন লাগত, এখন বাসে এক দিনেই পৌঁছনো যায়। বাস বদল করে আস্কোট। সেখানে রাজওয়াড়া সাহেবদের তৈরি দোতলা ধর্মশালা আছে, আর পাহাড়ের গায়ে তাঁদের দুখানা সুন্দর বাড়ি। শহরের মতো সমৃদ্ধ গ্রাম এই আস্কোট। অনেক ঘর বাড়ি দোকান পাট আছে। এখান থেকে গার্বিয়াঙের পথে মোটর পথ এগিয়েছে কিনা জানি না।

আস্কোট থেকে তিন-চার মাইল উৎরায়ের পর গৌরী-গঙ্গার পুল। এই গৌরী-গঙ্গা কালী নদীর সঙ্গে মিলেছে। খানিকটা চড়াই ভাঙবার পরে এই দুই নদীর সঙ্গম দেখতে পাওয়া যায়। এর পরে কালী নদীর তীরে তীরে সোজা উত্তরে এগোতে হয়। ভারতের মাটির উপর দিয়ে পথ, নদীর পরপারে হিমালয়ের এক গিরিশ্রেণী নেপালের সীমান্ত রক্ষা করছে।

ধারচুলা থেকে কৈলাসের আসল যাত্রা। আর সেখান থেকে গার্বিয়াং পাঁচ দিনের পথ। দু মাইল দূরে শ্রীরামকৃষ্ণ তপোবন, খেলার চড়াই পার হয়ে মাইল দেড়েক উৎরায়ের পর ধৌলি গঙ্গা, তার পর পঙ্গুর পাহাড়। চড়াই উৎরায়ে কষ্টের আর শেষ নেই।

গার্বিয়াং হল ভারতের সীমান্তে শেষ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গাড়োয়ালি ভোটিয়া আর হুলিয়াদের বাস। হুলিয়ারাই ভাল গাইড ও দোভাষী। এই গার্বিয়াং থেকে মানস সরোবর ও কৈলাস পরিক্রমা করে ফিরে আসতে দিন কুড়ি সময় লাগে। আলমোড়ায় যে পাহাড় দেখি তা হিমালয়ের প্রথম তবঙ্গ, দ্বিতীয় তরঙ্গে পিথোড়াগড় ও আস্কোট, গার্বিয়াং তৃতীয় তরঙ্গে। হিমালয়ের সমস্ত তুষারশৃঙ্গগুলিই এই তৃতীয় তরঙ্গে অবস্থিত। এই তরঙ্গই ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে ১৬৭৮০ ফুট উঁচু লিপুলেক গিরিপথ পেরিয়ে তিব্বতের দিকে নেমে গেছে। বাতাস এখানে হাল্কা হয়ে যায়, নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়, ঠাণ্ডায় পা ভারি হয় পাথরের মতো। দেহের অনাবৃত অংশ পুড়ে যাবার মতো জ্বালা করে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়, মাথা ঘোরে, চোখ জ্বলে। মনে হয় যে জ্বর এসেছে কাঁপুনি দিয়ে। একে বলে বিষ চড়া।

লিপুলেক পাহাড়ের চূড়ার নাম লিপুধুরা। কোনও গাছপালা নেই, শুধু বরফে আবৃত উলঙ্গ পাহাড়। এরই উপর দিয়ে তিব্বতের পথ।

সাত মাইল উৎরায়ের পরে পুরাং তিব্বতের প্রথম জনপদ। বর্ণালী নামে একটি নদীর দুই তীরে এই গ্রাম্য শহর, ভারতীয়রা বলে

তাক্‌লাকোট বা তাক্‌লাখার। আর বর্ণালী নদীর তিব্বতী নাম মাং চু। পাহাড়ের উপর একটা প্রাচীন দুর্গ আছে, সেখানে থাকেন স্থানীয় শাসনকর্তা জুম্পান পুসো।

এর পরে তিব্বতের মালভূমি, চড়াই উৎরাই আর বেশি নেই। এখান থেকে কৈলাস পরিক্রমা করে ফিরে আসতে দশ বারো দিন সময় লাগে। গুরেলা মান্ধাতা পাহাড়ের পাশ দিয়ে রাবণ হ্রদের তীরে পৌঁছানো যায়। অনেকে বলে রাক্ষস তাল, তিব্বতীরা বলে লাংবো বা লাগাং। এর তীর ধরেই কৈলাসে যাওয়া যায়, কিন্তু যাত্রীরা সাধারণত মানস সরোবরে স্নান করে এগোয়। মানস সরোবরকে তিব্বতীরা বলে সো মাফম আর নিজেদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলে মনে করে।

এই দুই সরোবরের দূরত্ব মাত্র মাইল দেড়েক, কিন্তু পথ অসমতল বলে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে। সমুদ্রতল থেকে পনর হাজার ফুটেরও বেশি উঁচুতে মানস সরোবরের অপরূপ রূপ। নগ্ন পৃথিবী এখানে যেন তপস্যায় নিমগ্ন।

কৈলাস তিব্বতীদেরও পরম তীর্থ। তারা বলে খাং রিম্‌পোছে। বারো বছর পর পর তাদের কুম্ভের মতো যোগ আসে। তারা মানৎ করে এসে দণ্ড খেটে কুড়ি বাইশ দিনে কৈলাস পরিক্রমা করে। এই পরিক্রমার পথে তিব্বতীদের অনেক গোম্ফা আছে। আঠারো হাজারেরও বেশী উঁচুতে গৌরী কুণ্ড। তিব্বতীরা বলে দোল্‌মা-লা। আধ মাইল পরিধির এই কুণ্ডটি সারা বছরই বরফে আচ্ছন্ন থাকে। উপরের পুরু বরফ ভেঙে যাত্রীদের অনেকে স্নান করে। অনেক সময় চার-পাঁচ মাইল পথ বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়।

কৈলাস শৃঙ্গ প্রায় বাইশ হাজার ফুট উঁচু। কঠিন বরফে আবৃত একটি গিরিশৃঙ্গ, থ্যাবড়া শিবলিঙ্গের মতো তার আকার। তারই পাশ দিয়ে বরফের পাহাড় এসেছে নেমে, তার নাম পিনাক। এই পিনাক গৌরী কুণ্ডের প্রান্তে মিলেছে।

স্বাতি স্তব্ধ হয়ে আমার গল্প শুনছিল। বলল: এই কৈলাস!

বললুম: হ্যাঁ, শিবের আবাস এই কৈলাস। হিন্দুর পরম তীর্থ। শুধু পাহাড় আর বরফ। এই আমাদের মন্দির, এই আমাদের দেবতা। সৌন্দর্যের প্রতীককেই হিন্দুরা দেবতা বলে পূজো করেছে, আজও করে। হিমালয় সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি, হিমালয়ে তাই দেবতার আবাস। দেবতার নামে হিমালয়ে আমরা সুন্দরকে খুঁজতে আসি।

স্বাতি নিঃশব্দে আমার কথা মেনে নিল।

রানীখেতের বাস এক সময় ঘড় ঘড় করে উঠল। সচকিত হয়ে দেখলুম যে ড্রাইভার তার সীটে উঠে বসেছে, আর পিছনের দরজায় দাঁড়িয়ে কণ্ডাক্টর যাত্রার নির্দেশ দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। আলমোড়া দেখা শেষ করে এখন আমরা রানীখেতে ফিরব। স্বাতি আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে সন্তু ও মিমিকে দেখে নিল।

তার এই কর্তব্যজ্ঞানের বহর দেখে আমি বললুম: মিমি তোমার চেয়ে বয়সে খুব বেশি ছোট নয়।

স্বাতি বলল: বয়সটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল মানসিকতা। আমি খুকী আছি ভাবলে আমার বয়সও বাড়ত না। তা না হলে—

স্বাতিকে থেমে পড়তে দেখে আমি বললুম: বল।

স্বাতি একটু দ্বিধা করে বলল: সন্তুও কি তার বয়সের মতো ব্যবহার করছে!

এক এক সময় ভাঁড়ামি করছে।

তার দরকার ছিল না। হ্যাংলামি না করে বলিষ্ঠ ভাবেও ভালবাসা যায়। পুরুষের মতো ভালবাসা।

বললুম: ঠিক বলেছ। তলোয়ার চালিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাথা কেটে—

ঠাট্টা নয়। মিন্‌মিনে ভালবাসা কি মেয়েরা ভালবাসে! পুরুষরা এ কথা বোঝে দেরিতে।

অনেকে হয়তো বোঝেই না।

বাস তখন চলতে শুরু করেছিল। সেই পুরনো পথ। আলমোড়ায় মোটর চলাচলের এই একটিই পথ। যে পথে বাজার হাট কোর্ট কাছারি সে পথে মোটর চলতে দেখি নি। রানীখেতের মতো বাস এখানে সর্বত্র চলে না। দেখতে দেখতেই আলমোড়ার লোকালয় শেষ হয়ে গেল।

স্বাতি বলল: উদয়শঙ্কর আলমোড়ায় একটি ভারতীয় নৃত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে শুনেছিলাম।

বললুম: এখন আর সে সম্বন্ধে কিছু শুনি না।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: হিমালয়ে এত নাচ গান, অথচ—

নাচের কথাই শুনেছি। পার্বতীও ভাল নাচতে জানতেন, আর নাচ দেখিয়েই জয় করেছিলেন শিবকে। শিবই হলেন জগতের শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী।

কথায় কথায় আবার আমরা হিমালয়ের প্রসঙ্গে চলে এলুম। আর স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল: এই হিমালয় কত কালের পুরনো পাহাড় বলতে পার?

পারি।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: পারো?

বললুম: ঠিক হিং টিং ছটের মতো শোনাবে।

কেন?

বলছি।

বলে হিমালয় সম্বন্ধে এক সময় যা পড়েছিলুম, তার যা সামান্য মনে ছিল তাই বললুম স্বাতিকে। ভূ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে টেথিস নামে একটি বিলুপ্ত সমুদ্র থেকে হিমালয় ধীরে ধীরে উত্থিত হয়েছে। সমুদ্রটির বয়স পঞ্চাশ কোটি বছরেরও বেশি।

স্বাতি হাসল।

জিজ্ঞাসা করলুম: হাসলে যে?

স্বাতি বলল: ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এই বারে কত কোটি বছর আগে হিমালয়ের জন্ম হল সেই কথা বল।

বললুম: বেশি নয়, ছ কোটি বছর আগে ইওসিস যুগ থেকে উত্থানের সূত্রপাত হয়। মূল হিমালয় মানে তুষারমণ্ডিত গিরি-শৃঙ্গগুলির জন্ম এই সময়ে।

তার পর?

মধ্য হিমালয়ের জন্মকাল হল দু কোটি বৎসর আগে মায়োসিন যুগ থেকে এক কোটি কুড়ি লক্ষ বছর আগে প্লায়োসিন যুগ পর্যন্ত। আর বহির্হিমালয় মানে শিবালিক পর্বতের জন্ম একেবারে আধুনিক কালে।

মানে?

এক কোটি থেকে দশ লক্ষ বৎসর আগে। যে নদীগুলি টেথিস সমুদ্রে এসে পড়েছিল, তাদের জলের পলিমাটি থেকে শিবালিকের জন্ম। পণ্ডিতেরা আরও একটি কথা বলেন।

কী?

গঙ্গা যমুনা সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বড় বড় নদীগুলি নাকি হিমালয়ের জন্মের আগে থেকেই এ দেশে প্রবাহিত হত।

অবিশ্বাস্য কথা।

কেন?

হিমালয় না থাকলে তাদের জল আসত কোথা থেকে?

বললুম: সিন্ধু ও শতদ্রুর জন্ম তো মানস সরোবরে। ব্রহ্মপুত্রের জন্মও হিমালয়ের পরপারে।

স্বাতি কোন তর্ক না করে বলল: হিমালয়ের জন্ম যে সমুদ্রের গর্ভ থেকে, তার কোন প্রমাণ আছে?

আছে।

স্বাতি ভেবেছিল, আমি হয়তো হিমালয়ের গায়ে সামুদ্রিক জীব-জন্তুর কথা বলব। কিন্তু তার বদলে বললুম: মূল ও মধ্য হিমালয়ের শিলাসমষ্টির গঠন ও প্রকৃতিই নাকি একটি বিলুপ্ত সমুদ্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করছে।

স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: সব পরিষ্কার বুঝে ফেলেছি।

হেসে বললুম: এ আমারও জ্ঞানের কথা নয়। পড়া কথা কোনও রকমে মনে রেখেছি।

বুঝতে না পারলে মনে রাখো কেমন করে ?

যেমন করে পথ ঘাট ও জায়গার নাম মনে রাখি, ঠিক তেমনি করে শুধু মনকে বলতে হয়, মনে রেখো।

আবার আমরা কোশী নদীর পুল পেরোলুম আর কৌসানি-বাগেশ্বরের পথ পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলুম রানীখেতের দিকে।

দু একটি লোকালয়ে এই বাস দাঁড়ায়। এবারে আমরা নেমে পড়ে এক জায়গায় বিকেলের চা খেয়ে নিলুম। শুধু চা। পথের এই সব দোকানে আর কিছু খাবার প্রবৃত্তি হয় না।

অন্ধকার গভীর হবার আগেই আমরা রানীখেতে পৌঁছে গেলুম। বাস থেকে নেমেই মিমি স্বাতির পাশে এসে দাঁড়াল, আর সন্তু চলে এল আমার কাছে। বলল : চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বলে স্বাতির দিকে ফিরে তাকাল।

বুঝতে পারলুম যে সে কিছুক্ষণ গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চায়। তাই তাদের হোটেলের সামনে না দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গেই এগিয়ে চলল। স্বাতি মিমিকে নিয়ে ঢুকে গেল ভিতরে। আর অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এল। বলল : সন্তু আজ আমাদের সঙ্গে চা খাবে।

সন্তু আশ্চর্য হয়ে তাকাল আমার মুখের দিকে।

স্বাতি বলল : মিমির হুকুম।

মানে ?

তিতি বৌদি জিজ্ঞেস করেছিল, সন্তু কোথায় ? মিমি করুণ ভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

আমি বললুম : তুমি বুঝি মিথ্যে কথা বলেছ ?

স্বাতি মাথা নেড়ে বলল : না।

তবে ?

বলেছি, ওর দাদার সঙ্গে।

তবে মিমির হুকুম বলছ কেন?

তার চোখের দিকে চেয়ে তাই মনে হয়েছে। কিন্তু একটা কথা বলব?

বলে স্বাতি সন্তুর মুখের দিকে তাকাল।

সন্তু বলল: বলুন।

স্বাতি বলল: এরকম করে কত দিন চলবে?

সন্তু প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল: জানি চলবে না। কিন্তু কী করব বলুন। আমরা সগোত্র।

আমি আশ্চর্য হয়ে বলুলম: এ যুগেও এ সব বিচার!

বলুন তো আপনি!

বলে সন্তু যেন ফুলে উঠল।

কিন্তু স্বাতি তাকে সমর্থন করল না। বলল: সগোত্রে মানে এক বংশের ছেলেমেয়ে। ভাই বোন। তাই আপত্তি ওঠে।

সন্তু হতাশ হল তার কথা শুনে। বলল: আপনিও তাই বলছেন!

স্বাতি বলল: এ আমার কথা নয়, এ হল আমাদের সংস্কারের কথা। ভাই বোনের সম্পর্ক আমাদের ধর্মে পবিত্র। রক্তের সম্পর্ক কিনা!

তখন আমরা আমাদের হোটেলের দরজায় পৌঁছে গেছি। উপরের বারান্দায় উঠে দেখলুম যে কলরবের অন্ত নেই। অনেক লোকজন এক সঙ্গে হৈহৈ করছে। তাদের মধ্যে আমাদের গাইডকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম: ব্যাপার কী!

গাইড চুপি চুপি বলল: কাল এঁরা কেদারনাথ যাত্রা করবেন।

এঁরা মানে সেই দম্পতি। সাধন গুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী ম্যানিলা গুপ্ত। কিন্তু এত লোক কেন! পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলুম যে জিনিসপত্র বাঁধা ছাঁদা হচ্ছে। দু তিনজন লোক ভিতরে। আর গুপ্ত দম্পতি দাঁড়িয়ে সব কিছু তদারক করছেন।

চোখ বড় বড় করে সন্তু জিজ্ঞাসা করল : কোথায় যাচ্ছেন এঁরা ?

নিজেদের ঘরের সামনে এসে আমি বললুম : কেদারনাথ।

স্বাতি ঘরের তালা খুলে ভিতরে ঢুকল। আমরা দুজনে বসলুম বারান্দায়। সন্তু বলল : এত মালপত্র ?

বললুম : ঠাণ্ডার দেশ তো !

বেয়ারা এসে আমাদের চায়ের অর্ডার নিয়ে চলে গেল। এক ফাঁকে গাইড এসে বলল : কাল সকালে ব্রেকফাস্টের পরে যাত্রা করবেন। স্টেশন ওয়াগন ভাড়া করেছেন। সঙ্গে দুজন লোকও যাবে, তাদের একজন রান্নার লোক।

দু চোখ বিস্ফারিত করে সন্তু আমার মুখের দিকে তাকাল।

ঘর থেকে বেরোবার সময় স্বাতি সব কথা শুনতে পেয়েছিল। কাছে এসে বলল : কেদারনাথের মন্দির দেখবেন, না কেদারনাথ শৃঙ্গ জয় করবেন ?

আমি হাসলুম তার পরিহাস শুনে। আর সন্তু বলল : ও দুটো বুঝি এক জায়গায় নয় ?

বরফাচ্ছন্ন চূড়ায় যে মন্দির তৈরি সম্ভব নয়, মন্দির যে শৃঙ্গের পাদদেশে শক্ত মাটি বা পাথরের উপরে তৈরি হয়, স্বাতি তাকে সে কথা বোঝাবার চেষ্টা করল না। বলল : আমরা পরশু যাত্রা করব। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে ?

পরশু ! আপনারাও যাবেন !

প্রথমে কেদারনাথে নয়, বদ্রীনাথ হয়ে কেদারনাথ দর্শনে যাব। তার পর গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী।

সন্তু যেন আকাশ থেকে পড়েছে এমনি ভাবে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললুম : স্বাতি যা বলে, তা করবে বলেই বলে। কালকের দিনটা আমরা গোছগাছ করে নিয়ে পরশু সকালে বেরিয়ে পড়ব। তবে স্টেশন ওয়াগন ভাড়া করে নয়। আমরা সরকারী বাসে যাব। সাধারণ যাত্রীর মতো—

খোলা মনে। কিসের টানে মানুষ এত কাল ধরে এই সব তীর্থে আসছে, তাই আবিষ্কার করতে।

কালই আপনারা এত জিনিসপত্র সংগ্রহ করবেন?

আমাদের চা বেয়ারা টেবিলের উপরে রাখল। ওধার থেকে একখানা চেয়ার টেনে এনে স্বাতি আগেই বসেছিল। এই বারে চায়ের পটে হাত দিয়ে বলল: আমাদের কিছুই চাই নে।

সে কি!

বলে সন্তু তার মুখের দিকে তাকাল।

স্বাতি বলল: গরম জামা কাপড় আছে, বিছানা আছে। পথে যাত্রীরা যা খায়, আমরাও তাই খাব।

আমি বললুম: বৃষ্টির জন্যে ছাতা কিংবা ওয়াটার প্রুফের দরকার হতে পারে।

কিন্তু স্বাতি তখনি জবাব দিল: বৃষ্টি পড়লে গাছের তলায় আশ্রয় নেব।

আর গাছ না থাকলে?

ভিজব।

সন্তু বলল: এ রকম চটি পায়ে কি হাঁটতে পারবেন?

স্বাতি বলল: জুতো পায়েও হয়তো পারব না। জুতো তো কখনও পরি নি!

আমি বললুম: রবারের চটিই সব চেয়ে ভাল। ভিজলে শুকিয়ে যাবে।

সন্তু বলল: পায়ে মোজা না পরলে যে ঠাণ্ডায় পা জমে যাবে!

আর জলে সেই মোজা ভিজলে কী হবে?

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি আমাদের চা ঢেলে দিয়েছিল। এই বারে সন্তুর দিকে কেকের প্লেট এগিয়ে দিয়ে বলল: তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে কিনা বল।

আমি!

হ্যাঁ, তুমি।

আপনি আমাকে যেতে বলছেন!

সন্তুর গলায় কেক যেন আটকে যাচ্ছিল। দু তিন চুমুক চা মুখে নিয়ে বলল: একটু ভেবে দেখবার সময় দিন স্বাতিদি।

স্বাতি অত্যন্ত সহজ ভাবে বলল: ভেবে আর দেখবে কি! মিমি যাবে না। ওর দিদি নিজেও যাবে না, বোনকেও যেতে দেবে না। তুমি নিজের কথাই ভাব। শখ থাকে চল। না গিয়ে এখানে থেকেও যে খুব লাভবান হবে, তা মনে হয় না।

সন্তু সহসা গম্ভীর হয়ে গেল, তার পরে বলল: আপনিও তাই বলছেন!

স্বাতি বলল: মেয়েদের কাছে সংস্কার খুব শ্রদ্ধার জিনিস। সংস্কার ঝেড়ে ফেলতে হলে যে মনোবলের দরকার, তা মিমির দিদির নেই। মিমির আছে কিনা তা ভাল করে জেনে নাও।

সন্তু বলল: মিমির আপত্তি নেই।

ও তো এখনকার কথা। রঙীন কাচের ভেতর দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখছে বলেই এই রকম ভাবছে বা বলছে। তার পর—

তার পর কী?

সংসারে সুখ দুঃখ, সুযোগ দুর্যোগ আছে। অনেক বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে কঠিন পদক্ষেপে সবাইকে এগোতে হয়। তখন যদি মনোবল হারিয়ে ভাবে, সংস্কার মানে নি বলেই এই রকম হচ্ছে!

স্বাতি আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। আমার মনে হল যে সে বোধ হয় এমন কোনও কথা যার মধ্যে খানিকটা লজ্জা আছে। তাই খানিকটা অপেক্ষা করে বলল: মিমির সঙ্গে খোলা-খুলি কথা বলো। কত পুরুষ আগে তোমরা ভাই বোন ছিলে জানা নেই। সে হয়তো কয়েক হাজার বছর আগেও হতে পারে। এ একটা সংস্কার। সংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়।

আমি জানি, দক্ষিণ ভারতে মামাতো বোনকে বিয়ে করে, মামা ভাগ্নিতেও বিয়ে হয়। মুসলমানরা শুধু আপন বোনকে বিয়ে করে না। যে সব সম্পর্কও অত্যন্ত আপন, তাতেও কোনও বাধা নেই। বাধা আমাদের সগোত্রে বিবাহ। কিন্তু আমি কোন মন্তব্য করলুম না।

সন্তকে এখন বড় চিন্তিত দেখাচ্ছে। স্বাতি তাকে আরও ভাবিয়ে তুলল। বলল: এই সংস্কারকে অতিক্রম করার সাহস যদি তোমাদের থাকে তো লুকোচুরি ছেড়ে সত্য কথা সবাইকে জানিয়ে দাও স্পষ্ট ভাবে। তার পরে সমস্ত নিগ্রহ মাথা পেতে নাও তোমাদের ভালোবাসার পুরস্কার হিসেবে। আর এ সাহস যদি না থাকে তো চলো আমাদের সঙ্গে। হিমালয় তোমার শোক ভুলিয়ে দেবে।

সন্ত খুব তাড়াতাড়ি চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল।

আমি হেসে বললুম: কী হল?

সন্ত বলল: স্বাতিদি ঠিকই বলেছেন। আজই একটা ফয়সালা করতে হবে।

স্বাতি বলল: কার সঙ্গে ফয়সালা করবে?

তিতি বৌদির সঙ্গে। তিনিই তো বাগড়া দিচ্ছেন।

স্বাতি কঠিন স্বরে বলল: না। তুমি ফয়সালা করবে মিমির সঙ্গে। তোমার জন্যে সব কিছু সইতে সে রাজী আছে কিনা, আগে তা জেনে নেবে। ব্যাপারটা তোমার একার নয়, দুজনের। আগে তোমরা ফয়সালা করবে।

আমি হাসছিলুম। আর আমার হাসি দেখে স্বাতি রেগে গেল। বলল: তুমি হাসছ যে! তুমি কি অন্য রকম ছিলে!

কিন্তু আমার কোনও উত্তর দেবার দরকার হল না। তার আগেই সন্ত অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। তাই বললুম: ওরা কী স্থির করবে বলতে পার?

স্বাতি বলল: স্থির ওদের করাই আছে।

তার উত্তর শুনে আমি আশ্চর্য হলুম।

স্বাতি বলল: সাহস থাকলে ওরা অনেক আগেই বিদ্রোহ করত, চোরের মতো লুকিয়ে বেড়াত না।

বললুম: খাঁটি কথা।

দু তিন বছর আগের ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। রাতে রামেশ্বরের আরতি দেখতে আমরা বেরিয়েছিলুম। আমি আর স্বাতি, তার পরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মন্দিরের প্রাঙ্গণে। স্বাতি সারারাত পথে পথে ঘুরে ধর্মশালায় ফিরে তার মা'র কাছে অপর্যাপ্ত বকুনি খেয়েছিল। আর কালীঘাটের কালীকৃষ্ণ হালদার সব জেনেছিলেন বলে তার বাবা ভয় পেয়েছিলেন অপরিমিত। তার বিবাহের কথা-বার্তা চলছিল বলেই ভয়। কিন্তু স্বাতি একেবারেই বেপরোয়া ভাব দেখিয়েছিল। কন্যাকুমারীতেও সে বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। সমুদ্রের ধারে আমার পাশে এসে বসেছিল নির্ভয়ে। সেদিনের প্রত্যেকটি কথা আমার মনে আছে। চিরদিন মনে থাকবে। স্বাতিকে আমি সেই দিনই চিনেছিলুম। নিজের অজ্ঞাতসারেই নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা বিশ্বাস জন্মেছিল। সে স্বাতির জন্যে, সে আমার জন্যে নয়। সেদিনের সেই স্বাতিই আজ সন্তকে পথ দেখাচ্ছে।

খানিকক্ষণ নীরবে থেকে স্বাতি বলল: সন্ত আমাদের সঙ্গেই যাবে। আমি তার উপকার করলাম।

আমি জানতুম যে সাধন গুপ্তরা আর আমাদের সঙ্গে কথা কইবেন না। এক দিনের আলাপেই আমাদের সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মেছে, তা নিশ্চয়ই প্রীতিকর নয়। এ যুগের উপযোগী নই বলে দূরে সরিয়ে রাখবেন বলে নিশ্চিত হয়েছিলুম। কিন্তু দেখলুম যে যাবার সময় আমাদের বলে গেলেন। জিনিসপত্র গাড়িতে উঠবার পরে নিজেরা ঘর ছেড়ে বেরোলেন। আমরা বাইরেই বসেছিলুম। এগিয়ে এসে সাধন গুপ্ত বললেন : চললাম।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম : আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।

ম্যানিলা স্বাতিকে বললেন : জীবনটা আপনারাও উপভোগ করুন।

উত্তরে স্বাতি একটু হাসল।

বিদায় নিয়ে ওঁরা নেমে গেলেন। নিচে মোটরের শব্দ পেলুম। ওঁরা চলে গেলেন। দ্বারা হাটের পথে কর্ণপ্রয়াগ যাবেন। সেখান থেকে রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে কেদারনাথ। এই পথেই ফিরবেন কিনা জেনে নেওয়া হল না।

স্বাতি বলল : কী ভাবছ বল তো !

বললুম : তোমার আয়োজনের কথা।

স্বাতি হেসে বলল : ভয় নেই, আমাদের কোনও আয়োজনেরই দরকার নেই। বিকেল বেলায় বেড়াতে বেরিয়ে বাসের টিকিটের খোঁজ করব, দরকার হলে টিকিট কেটেই আসব।

ঠিক এই সময়ে সন্তু এসে উপস্থিত হল। কোন ভূমিকা না করে বলল : আমি আপনাদের সঙ্গে যাব।

তবে আর আপনি নয় ভাই, এবার থেকে আমাদের 'তুমি' বলতে হবে। আমরা তোমার আপন জন হয়ে গেলাম।

সন্তু খানিকটা নিরাশ হল। বলল: তোমাকে অনেক কথা বলবার ছিল স্বাতিদি।

স্বাতি বলল: সব আমার জানা কথা। তবু যদি বলতে চাও, পরে শুনব। অনেক পথ যেতে হবে, অনেক কথা হবে পথে। এখন থেকে আমরা হিমালয়ের কথাই শুধু ভাবব।

সন্তু কোন প্রতিবাদ করল না। শুধু আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম: দার্জিলিঙ দেখেছ?

সন্তু সংক্ষেপে বলল: দেখেছি।

বললুম: দার্জিলিঙের চেয়ে রানীখেত ভাল নয়?

সন্তু বলল: রানীখেত আর আমার ভাল লাগছে না।

কিন্তু দার্জিলিঙ আমার অনেক বেশি ভাল লেগেছে।

কেন?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি সন্তুকে বললুম: মোটর দুর্ঘটনায় জখম হয়ে আমি দার্জিলিঙের হাসপাতালে পড়েছিলুম। হঠাৎ শুনলুম এক পরিচিত ভদ্রলোকের কুমারী মেয়ে দিল্লী থেকে উড়ে আসছে দার্জিলিঙ। আসছে আমার জন্যেই। তার ব্যাগের মধ্যে মায়ের লেখা চিঠি ছিল একখানা। কিন্তু সেখানা আমার হাতে দিতে ভুলেই গেল।

স্বাতি ভর্ৎসনার সুরে বলল: বাজে বোকো না।

কিন্তু আমি নির্ভয়ে বলতে লাগলুম: সেই মেয়ের সঙ্গেই আমি দার্জিলিঙ দেখেছিলুম। শুধু দার্জিলিঙ নয়, কালিম্পঙ গ্যাংটকও দেখেছি। গলার হাড় ভাঙা না থাকলে ভূটানও দেখে নিতুম।

সন্তু কৌতূহলী হয়ে বলল: সত্যি নাকি!

বললুম: সেই মেয়েটি প্রথমেই কী করল জানো? হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে আমাকে একটা হোটেলে এনে তুলল। পাশাপাশি দুটো ঘরে আমরা বাস করতে লাগলুম। আশ্চর্য সেই মেয়েটির

সাহস! কোনও লোকলজ্জার ভয় তার ছিল না। তার পরে একটু সুস্থ হবার পরে দার্জিলিঙের সব কিছু আমাকে দেখাল।

পিছনের বারান্দা থেকে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতুম। এই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে মনে হত দার্জিলিঙের গৃহদেবতা। কখনও মেঘাবৃত, কখনও রৌদ্রকরোজ্জ্বল। সারাক্ষণ সবাই যেন এই দেবতাকে দেখবার জন্যে লালায়িত হয়ে থাকত। তিব্বতী ভাষায় দোর্জে মানে বজ্র, ইন্দ্রের বজ্র, আর লিঙ মানে স্থান। দার্জিলিঙ শব্দের মানে তাই বজ্রের দেশ। একদা অবজারভেটরি হিলের উপরে একটি বৌদ্ধ গোম্ফা ছিল, সেই গোম্ফায় লামা ছিলেন দোর্জে। দোর্জে লামার একটি সমাধি আজও এখানে আছে। আর আছে হনুমান ও কালীর স্থান। অনেকে এই পাহাড়কে মহাকাল পাহাড় বলেন, আর প্রণাম করেন মহাকাল শিবকে। ইংরেজ এই জেলাটি উপহার পেয়েছিল সিকিমের মহারাজার কাছে।

সন্তু বলল: চুপ করে রইলে কেন গোপালদা, সেই মেয়েটির সঙ্গে কী কী দেখেছিলে বল।

স্বাতি বলল: চিড়িয়াখানা যাদুঘর—

সত্যিই চিড়িয়াখানা দেখেছিলুম। সাধারণ চিড়িয়াখানা নয়, এখানে আছে পাহাড়ী অঞ্চলের পশু পাখি। রাশিয়ার বাঘ—

আর—

বড় বড় ভালুকও দেখেছিলুম ছাড়া আছে।

স্বাতি সকৌতুকে বলল: তবে তো সবই মনে আছে। জাদু-ঘরে কী দেখেছিলে বল।

নানা রকম পাখি দেখেছিলুম—পূর্ব হিমালয়ের পাখি, এমন সুন্দর ভাবে সাজানো যে জীবন্ত মনে হয়েছিল। তেমনি জীবন্ত বাঘ, কীট পতঙ্গ ও প্রজাপতি।

তার পর?

বার্চ হিলের কী একটা নতুন নাম হয়েছে। সেখানে দেখেছিলুম

মাউন্টেনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউট আর তার মিউজিয়ম। ছবি নক্সা মানচিত্র দেখেছি নানা রকমের আর উপরের তলায় একটি শেরপার পাহাড়ে ওঠার মূর্তি। আমরা সত্যি মানুষ বলে ভুল করেছিলুম।

স্বাতি বলল : শহরটা তোমার মনে পড়ে ?

বললুম : কিছু পড়ে বৈকি।

বলে সংক্ষেপে সেই কথা বললুম : স্টেশনের ধারে একটা হোটেলে উঠেছিলুম আমরা। স্টেশনের সামনে দিয়ে গেছে কার্ট রোড। শিলিগুড়ি থেকে এই পথই উঠে এসেছে। তার পর বাজারের সামনে দিয়ে গোটা বার্চ হিল পাহাড়টা ঘুরে লেবঙের রেস কোর্সে পৌঁছেছে। বাঁ দিকের একটা পথ নেমে গেছে বটানিকল গার্ডেনে। দার্জিলিঙের শ্মশান আরও নিচে। চৌরাস্তায় পৌঁছতে হলে উপরে উঠতে হয়। চৌরাস্তার এক ধারে জলা পাহাড়ে ওঠবার পথ, অন্য ধারে অনেক দূর এগিয়ে গেলে বার্চ হিল। অবজরভেটরি হিলের পথ চৌরাস্তা থেকেই উপরে উঠেছে। আর এই পাহাড়ের উপরে উঠে জেনেছিলুম যে দার্জিলিঙের দিগন্তবিস্তৃত তুষার শ্রেণীর নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা একটি শৃঙ্গের নাম। আর প্রত্যেকটি শৃঙ্গের এক একটি নাম আছে। অবজরভেটরি হিলের একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে উত্তরের দিগন্ত দেখা যায় অবারিত ভাবে। হিমালয়ের মহিমা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। তুষারাচ্ছন্ন পাহাড়ের এ এক অপরূপ রূপ আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। বিশ হাজার ফুটেরও উঁচু গিরিশৃঙ্গ এখানে কুড়িটির বেশী আছে। একটি ঘরের নিচে মানচিত্রে আছে তাদের নাম লেখা। সব চেয়ে পশ্চিমে হল কাঙ আর কোক টাঙ। তার পরে জান্নু ছোট কাব্রু ও কাব্রু। জান্নু পঁচিশ হাজার ফুটের বেশি আর কাব্রু চব্বিশ হাজার ফুট। তার পরের নিচু শৃঙ্গটির নাম জেম। তার পরেই কাঞ্চনজঙ্ঘা তালুঙ ও পান্দিমের মাঝখানে। বাঁয়ে তালুঙ তেইশ হাজার ফুট, আর ডানে পান্দিম বাইশ হাজার। মাঝখানে

কাঞ্চনজঙ্ঘা ২৮১৫৬ ফুট উঁচু। এর পরেও আরও অনেকগুলি শিখর আছে—এ পাশে জুগনু আর ও পাশে নরসিং বিশ হাজারের নিচে। মাঝখানে সিম্ভু প্রায় সাড়ে বাইশ হাজার ফুট। নরসিংএর পাশে সিনিয়ালচু—চোমিয়ামো কাঞ্চনমাও ওঞ্চিয়া রি পাহাড়ও সিম্ভুর সমান উঁচু। এখানেই জেনেছিলুম যে কাঞ্চনজঙ্ঘা শব্দটিরও একটি মানে আছে। ক্যাং মানে তুষার, চেন মানে বৃহৎ, আর জোঙ্গা মানে পাঁচটি ধনভাণ্ডার। সত্যিই এটি একটি বরফের বৃহৎ ভাণ্ডার। সমস্ত দার্জিলিঙ শহর সারাক্ষণ এই হিমালয়ের মহিমা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আছে।

শহরের বাহিরেও আমরা অনেক কিছু দেখেছিলুম। এক দিন ভোর চারটেয় গাড়ি করে বেরিয়েছিলুম টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে। ঘুমের উপর দিয়ে এই পথ। ঘুম হল পাঁচ মাইল দূরে শিলিগুড়ির দিকে। এই অঞ্চলের সব চেয়ে উঁচু জায়গা। ন্যারো গেজ ট্রেন নানা কায়দায় এই পর্যন্ত উঠে দার্জিলিঙের দিকে গড়িয়ে নামে। মাঝ পথে কার্সিয়াঙ নামে আর একটি সুন্দর শহর আছে। উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুটের কিছু কম বলে শীতও কম। কতকটা আলমোড়ার মতো মধ্যবিত্ত শহর। ঈগল্‌স্‌ ক্রেগ নামে একটা পাহাড়ে উঠলে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাওয়া যায়। আর তার পাশে জানু ও কাব্রু। ঘুমের পাহাড় এদের পুরোপুরি ঢাকতে পারে নি।

ঘুম এই পাহাড়ে একটা জংসন স্টেশনের মতো। প্রধান রাজপথ দার্জিলিঙ থেকে সমতল ভূমিতে শিলিগুড়ি পর্যন্ত গেছে। বাঁ হাতে পেশক রোড তিস্তা নদীর পুল পর্যন্ত নিচে নেমে গেছে। সেই পুল পেরিয়ে ডান দিকে কালিম্পঙ ও বাঁ দিকে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক। আর একটু এগিয়ে আর একটি সরু পথ বেরিয়েছে বাঁ দিকে, তার নাম সিঞ্চল রোড। কেভেন্টার্স ডায়েরি ফার্মের পাশ দিয়ে টাইগার হিলে যাবার পথ এটি। আরও

খানিকটা এগিয়ে বাঁ হাতের আর একটি পথ গেছে সিঞ্চল লেকের দিকে।

কুমায়ুনের কৌসানির মতো সুন্দর জায়গা দার্জিলিঙ অঞ্চলেও আছে। ঘুম রেলওয়ে স্টেশনে পৌছবার আগে দার্জিলিঙ থেকে গান্ধী রোড এসে কার্ট রোডে মিলেছে। আর সেইখান থেকে যে রাস্তা উল্টো দিকে গেছে, তা ঘুমের গোম্ফায় পৌছেছে। ঘুম স্টেশন পেরিয়ে যে রাস্তা পাওয়া যায় ডান হাতে, সেই রাস্তা সুকিয়া বাজার টংলু হয়ে সন্দকৃফু ও ফালুট পর্যন্ত গেছে। সন্দকৃফু ও ফালুট থেকে হিমালয়ের দৃশ্য আরও মনোরম। শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়, মাউণ্ট এভারেস্টও দেখা যায়।

টাইগার হিল থেকেও মাউণ্ট এভারেস্ট দেখতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত গাড়ি যায়। উপরে একটি দোতলা বাড়ি। নিচের তলায় রেস্তোরাঁ, আর উপরের তলা থেকে সূর্যোদয় দেখবার ব্যবস্থা। কিন্তু সেই স্বল্পপরিসরে সকলের দাঁড়াবার স্থান হয় না। নিচে দাঁড়িয়েই দেখতে হয়। সূর্যোদয়ের আগে থেকেই পূর্বাকাশে রঙের খেলা শুরু হয়ে যায়। নানা বর্ণে রঞ্জিত হয়ে ওঠে প্রত্যুষের মেঘমালা। সূর্যোদয়ের পরে অন্য ধার থেকে দেখতে হয় কাঞ্চনজঙ্ঘা ও মাউণ্ট এভারেস্ট। নীল পাহাড়ে আড়াল হয়ে থাকে মাউণ্ট এভারেস্ট। শুধু তিনটি তুষার শিখর জেগে থাকে সামনের পাহাড়ের পিছনে। যে শিখরটি সবচেয়ে উঁচু মনে হয়, তা কিন্তু মাউণ্ট এভারেস্ট নয়, তার নাম মাকালু। তার উচ্চতা কম নয়, সাড়ে সাতাশ হাজার ফুটেরও বেশি। মাঝখানের নিচু শিখরটিই মাউণ্ট এভারেস্ট, পৃথিবীর উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ ২৯০০২ ফুট। ৮৪৮২ ফুট উঁচু টাইগার হিল থেকে আমরা মাউণ্ট এভারেস্ট দেখেছিলুম। সন্দকৃফু বা ফালুট গিয়ে আরও কাছে থেকে আমরা তাকে দেখতে পারি নি।

ফেরার পথে আমরা সিঞ্চল লেক দেখেছিলুম। পাশাপাশি

তিনটি সরোবর অর্ধচন্দ্রাকৃতি, একটির সঙ্গে অপরটি সংলগ্ন। এপার থেকে ওপারে যাবার পথও আছে। পাহাড়ে বেষ্টিত এই স্থান থেকে দূরের দৃশ্য দেখা যায় না। শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশটি নির্জনে উপভোগ করা যায়।

সিঞ্চল লেকের কথায় স্বাতি বলল: নৈনিতাল ও ভীমতালের লেক তোমার বেশি ভাল লাগে নি?

বললুম: তার কারণ আছে। নৈনিতালের লেক তো শহরের মাঝখানেই। তাকে সারাক্ষণ দেখছি, নৌকোয় চেপে জলে ভেসে বেড়াচ্ছি, স্নান করছি মন্দিরের ঘাটে, আর চারি দিকের রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছি। ভীমতালেও কতকটা তাই। নৈনিতাল থেকে দূরে হলেও যাতায়াতের বাস আছে, লেকের ধারে হোটেল রেস্তোরাঁ আছে, জলে বেড়াবার জন্যে নৌকো আছে, মাছ ধরার অনুমতি পাওয়া যায়। আর কী চাই? কিন্তু সিঞ্চল লেক সম্বন্ধে সরকার বা সরকারী টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্ট বেশ উদাসীন। লেকে যাবার জন্যে পারমিট চাই, কিন্তু লেকে গিয়ে কী পাওয়া যাবে? দার্জিলিঙ শহর থেকে বোধ হয় মাইল সাতেক দূরে, কিন্তু যাতায়াতের কোনও ব্যবস্থাই নেই। ঘুমের গোম্ফা, টাইগার হিল—এ সব দেখবার জন্যেও নিজেদের ব্যবস্থা করতে হয়। অথচ যাত্রীর অভাব নেই দার্জিলিঙে। পুজোর সময় জায়গা পাওয়া যায় না হোটেলে।

স্বাতি হেসে বলল: বাঙলার ব্যাপারে তোমার একটা আক্রোশ আছে দেখছি।

বললুম: তা অকারণে নয়। কোন বাঙালী আজও বাঙলাকে ভাল করে দেখে নি। অথচ বাঙালীরাই ভারতের সর্বত্র সব কিছু দেখে বেড়াচ্ছে। সব রাজ্যের লোকেরাই স্বীকার করে যে ভ্রমণের ব্যাপারে বাঙালীরাই সব চেয়ে বেশি উৎসাহী।

সন্তু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। বলল: আমি কলকাতাই এখনও ভাল করে দেখি নি।

বললুম : সে তোমার দোষ নয়, ভ্রমণের ব্যবস্থা আকর্ষণীয় হলে তুমি রানীখেতে আসবার আগে বাঙলা ভ্রমণ শেষ করে ফেলতে।

স্বাতি বলল : সিকিম দেখার ব্যবস্থা কি এর চেয়ে ভাল ! কিন্তু তুমি তো সিকিমও ঘুরে এসেছ !

বললুম : ঘুরে এসেছি, কিন্তু দেখে এসেছি বলব না।

কেন ?

দার্জিলিঙ থেকে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে লাঞ্চের আগে পৌঁছেছিলুম সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক, আর পরদিন সকালেই এসেছিলুম ফিরে।

সন্তু বলল : পথের কথা কিছু বল না গোপালদা।

বললুম : ঘুম থেকে তিস্তার পুল উনিশ মাইল দূরে। পথ নিচে নেমেছে লপচু ও পেশক চা বাগানের ধার দিয়ে। যে মংপুতে রবীন্দ্রনাথ এসে থাকতেন, সেখানে সিন্‌কোনার চাষ। এই পথ থেকে সেখানেও যাওয়া যায়। প্রধান পথ অন্য দিকে। শিলিগুড়ি থেকে সোজা কালিম্পঙ যাবার পথে রিয়াং থেকে বেঁকে যেতে হয়।

তার পরে বললুম : তিস্তার পুলে পৌঁছবার আগে আমরা ভিউ-পয়েন্ট নামে একটা জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে রঙ্গিত ও তিস্তা নদীর সঙ্গম দেখেছিলুম। একটির জল সবুজ, আর একটির সাদা স্বচ্ছ টলটলে জল। চোখের সামনেই দুই নদীর মিলন দেখতে পাওয়া যায়, আর তাদের মিলিত ধারা তিস্তা নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে।

তার পরে তিস্তার পুল। এপারে লোকজন দোকান পাট চা জলখাবার। ওপারে দুটো পথ। বাঁ দিকের পথ গ্যাংটকে গেছে, আর কালিম্পঙ গেছে ডান দিকের পথ। কালিম্পঙ পাহাড়ের প্রধান শহর কালিম্পঙ এখান থেকে দশ মাইল দূরে।

সন্তু জিজ্ঞাসা করল : কালিম্পঙ দেখেন নি ?

বললুম : গ্যাংটক থেকে ফেরার পথে কালিম্পঙও দেখেছিলুম। পশ্চিম বঙ্গেরই শহর। শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে ছেচল্লিশ মাইল

দূরে প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু। সব চেয়ে উঁচু পাহাড়টির মাথায় হল কালিম্পঙ হোম্‌স—অনাথ ইউরোপীয় ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাজার হাট ঘরবাড়ি নিয়ে কালিম্পঙ একটি সুন্দর পাহাড়ী শহর।

তার পরে গ্যাংটকের কথা বললুম। তিস্তার পুল থেকে রঙ্গপো নদীর পুল চোদ্দ মাইল দূরে। পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের সীমানায় এই রঙ্গপো নদী। জায়গার নামও রঙ্গপো। বাঙলার ও সিকিমের পুলিস খানাতল্লাসী করবে, আর ইণ্ডিয়ান টুরিস্ট বললেই ছেড়ে দেবে। গ্যাংটক এখান থেকে তেইশ মাইল দূরে পাঁচ হাজার আট শো ফুট উঁচুতে।

সিকিমে রাজা আছেন। ভারতের সঙ্গে তাঁর মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ়। প্রতিবেশী ভুটানের সঙ্গেও ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এ দুটি দেশ ভারতের সঙ্গেই সংযুক্ত। কিন্তু নেপাল স্বাধীন দেশ, সিংহল বা ব্রহ্মদেশের মতো। নেপালে যাতায়াতের নানা বিধিনিষেধ আছে, কিন্তু কড়াকড়ি নেই। সিকিমে কিছুই নেই।

গ্যাংটকে কী দেখেছিলেন?

বলে সন্তু আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি তার প্রশ্ন শুনে হাসলুম। তার পরে সন্তু খানিকটা অপ্রস্তুত হয়েছে দেখে বললুম: বিশেষ কিছুই দেখি নি।

কেন?

বিকেল বেলায় বৃষ্টি নেমেছিল। শুনেছিলুম যে কাঙড়া উপত্যকার ধর্মশালার মতো সন্ধ্যা বেলায় প্রায়ই নাকি বৃষ্টি হয়।

তার পরে স্বাতির দিকে চেয়ে বলেছিলুম: পথে যেতে যেতে কাশ্মীরের কথা মনে হয়েছিল। রঙ্গনি নদীকে মনে হয়েছিল লীডার নদী। গ্যাংটক তো নয়, যেন পহলগামের পথে চলেছি মনে হয়েছিল।

সত্যি!

বলে সন্তু বিস্ময় প্রকাশ করল।

বললুম : হিমালয় এই রকমই। এক জায়গায় গিয়ে আর এক জায়গার কথা মনে পড়ে। কিন্তু গ্যাংটকের একটা নিজস্ব রূপ আছে। নিচের প্রশস্ত রাজপথে তার বাজার হোটেল রেস্তোরাঁ, আর পাহাড়ের উপরে রিজ সেক্রেটারিয়েট রাজপ্রাসাদ ও তার সংলগ্ন গোম্ফা। পাহাড়ের এই মাথায় রাজপথ খুব প্রশস্ত। সুন্দর দৃশ্য। রাজপ্রাসাদটি একটি সুদৃশ্য দোতলা বাড়ি। উপরে রঙীন ছাদ চালার মতো। পিছনের দরজা দিয়ে গোম্ফায় যেতে হয়। গোম্ফার দেওয়ালে আছে বুদ্ধের জীবন কাহিনী চিত্রিত। আর এরই ভিতরে রাজপরিবারের সমস্ত সামাজিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

গোম্ফা থেকে বেরিয়ে একটি ঢালু পথে সেক্রেটারিয়েটে আসতে হয়। যেমন সুন্দর বাড়ি, তেমনি সুন্দর এর বাগানটি। পিছনে একটি চিড়িয়াখানার মতোও আছে।

পাহাড়ের অন্য ধারে পলিটিকাল অফিসারের বাড়ি। গ্যাংটক পাহাড়ের শেষ এইখানে। এর পরে স্তরে স্তরে পাহাড় ডিঙিয়ে হিমালয়ের তুষারাবৃত শিখরগুলি সুন্দর দেখা যায়। আকাশ মেঘাবৃত বলে সে সৌন্দর্য আমরা দেখতে পাই নি।

গ্যাংটক থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে নাথুলা। প্রায় সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু গিরিপথ। ওপারের চুম্বি উপত্যকা এক সময়ে সিকিমের ছিল, এখন তিব্বতের কবলে। নাথুলার এ ধারে ভারতীয় সৈন্য টহল দিচ্ছে আর ও ধারে চীনা সৈন্য।

সন্তু বলল : ভুটানে কি এই পথেই যায়?

বললুম : না। কিন্তু কোন্ পথে যায়, তাও ঠিক জানি না। পণ্ডিত নেহরু যখন ভুটানে গিয়েছিলেন, কাগজে তখন অনেক লেখালেখি হয়েছিল। কিন্তু কোন্ পথে কী ভাবে গিয়েছিলেন ঠিক বুঝতে পারি নি। ভূগোল পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল যে ভুটানের রাজধানী হল পুনাখা। কিন্তু সম্প্রতি জেনেছি যে থিম্পু

হল ভুটানের বর্তমান রাজধানী। আর কিছু দিন আগে নাকি পারোতে রাজধানী ছিল। ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ভুটান সরকার নিজের দেশে পথ ঘাট তৈরি করতে রাজী ছিল না, পছন্দ করত না বিদেশীদের আনাগোনা। কিন্তু এর পরের বছরই ভুটান সরকার সহসা তার মত বদলাল। বোধ হয় তিব্বতের অবস্থা দেখেই ভয় পেল যে চীনারা এসে ঢুকে পড়তে পারে।

এখন ভারতীয় সাহায্যে ভুটানে অনেক পথ ঘাট তৈরি হয়েছে ও হচ্ছে, বাঙলার সীমান্তে ফুন্‌ছোলিঙ নামে একটা জায়গা থেকে পারো ও থিম্বু পর্যন্ত সড়ক তৈরি হয়েছে দু বছরে। পূর্ব পশ্চিমেও যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়েছে। খচ্চরের পিঠে চেপে যে পথ অতিক্রম করতে আগে ছ দিন লাগত, এখন জিপে তা দশ ঘণ্টায় যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: এই ফুন্‌ছোলিঙ জায়গাটি কোথায় বলতে পার?

বললুম: আমার গ্যাংটকের বন্ধু বলেছিলেন যে জলপাইগুড়ি জেলায় জয়ন্তী নামে একটি জায়গা আছে। পাহাড়ের উপরে একটি রেল স্টেশন, আলিপুর জংসন থেকে যেতে হয় ভুটানের সীমান্তে। এ ধারে জয়ন্তী, ও ধারে ফুন্‌ছোলিঙ। কিন্তু মাঝখানের যোগাযোগ ব্যবস্থা তাঁরও জানা ছিল না। ম্যাপে আমি আর একটি পথ দেখেছি ভুটানে যাবার। আসামের রঙ্গিয়া থেকে সে পথ ভুটানের উপর দিয়ে তিব্বতে গেছে।

এই সব পথ ঘাটের কথা পরে আমি জানতে পেরেছিলুম বর্ডার রোড বিভাগের এক ভদ্রলোকের কাছে। তিনি বলেছিলেন যে জলপাইগুড়ি জেলার হাসিমারা থেকে ফুন্‌ছোলিঙ পর্যন্ত উনিশ মাইল পথে বাস যাতায়াত করে। ফুন্‌ছোলিঙ থেকে প্রায় এক শো দশ মাইল দূরে থিম্বু। মাঝ পথে তখ্‌তি চু নামে একটি জলপ্রপাত আছে, আর বর্ডার রোড বিভাগের একটি ক্যান্টিন। এই প্রধান

রাজপথ থেকেই বেরিয়েছে পারোর পথ। থিম্বু পৌঁছবার একুশ মাইল আগে বাঁ হাতের পথ ধরতে হয়। ভুটানের পুরনো রাজধানী পারোতে এখন একটি জং আছে—প্রাসাদ অফিস আর জেলখানা। একটি বৌদ্ধ মন্দিরও আছে। থিম্বু পৌঁছবার আড়াই মাইল আগে আর একটি পথ বেরিয়ে গেছে পুনাখার দিকে। আটাশ মাইল দূরে পুনাখা, কিন্তু এই পথ আরও পনর-ষোল মাইল দূরে পালেলা পর্যন্ত গেছে। আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম, পথ ঘাটের এত হিসেব আপনি রাখেন!

ভদ্রলোক হেসে বলেছিলেন: পথঘাট তৈরিই তো আমাদের কাজ!

তার পরে আরও কয়েকটি পথের কথা বলেছিলেন। জলপাই-গুড়ি জেলার বিন্নাগুড়ি থেকে সাম্‌চি। ভুটানের মাইল তিনেক ভিতরে এই সাম্‌চি শহরে নানারকমের মদ তৈরি হয়। চেরির ব্র্যাণ্ডি ও অন্যান্য পানীয়, আলিপুরদুয়ার থেকে ভুটান সীমান্তে হাথিসারেও যাওয়া যায়। হাথিসাব থেকে প্রায় সোয়া শো মাইল দূরে টংসা। পালেলা থেকেও টংসা যাওয়া যায়। টংসায় ভুটান রাজাদের সমাধি ক্ষেত্র।

সন্তু হঠাৎ সিকিম ও ভুটানের প্রসঙ্গ ছেড়ে একেবারে ব্যক্তিগত প্রশ্নে চলে এল। বলল: সেই মেয়ের কী হল?

প্রশ্নটা আমি ঠিক ধরতে পারি নি। বললুম: কোন্ মেয়ে?

যে মেয়েটি আপনাকে দেখবার জন্যে দিল্লী থেকে দার্জিলিঙ উড়ে এসেছিল!

কথাটা মনে পড়তেই হেসে উঠলুম।

সন্তু বলল: হাসছ যে?

বললুম: তোমার স্বাতিদিকে জিজ্ঞেস কর। কী কেলেঙ্কারী হয়েছিল সেই মেয়েকে নিয়ে! ও সব জানে।

পরম বিস্ময়ে সন্তু স্বাতির মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু স্বাতি কোন কথা বলল না।

২০

সন্তু তিনবার নিচের পথের দিকে তাকাল। তার পরেই ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: কী হল?

না। কিছু না।

বলে সে আবার বসে পড়ল। কিন্তু তার চোখ রইল নিচের দিকে।

স্বাতি মুখ উঁচু করে নিচের পথের দিকে চেয়ে বলল: ডাকব?

না না। ডাকাডাকি ভাল নয়।

কিন্তু মন যে ঐ দিকেই গেছে।

সন্তু বলল: মানে—

আমি বললুম: মিমি বেড়াতে বেরিয়েছে বুঝি!

মানে একা বেরিয়েছে কিনা!

বলে সন্তু আমার দিকে তাকাল।

স্বাতি বলল: তবে তুমি ওকে একা ফেলে কেদারনাথে যাবে কেমন করে?

সন্তু বলে উঠল: একা ফেলে তো যাচ্ছি না, ওর দিদি জামাই-বাবুর সঙ্গেই ও থাকবে, ফিরবেও ওদের সঙ্গে।

স্বাতি হেসে বলল: কিন্তু ওর দিদি জামাইবাবু তো সারাক্ষণ ওকে সামলাবে না, এমনি করে হয়তো একা একাই ঘুরবে!

সন্তু বলে উঠল: পরের মেয়ের জন্যে আমার কী দায়িত্ব বলুন!

স্বাতি সকৌতুকে বলল: পরের মেয়ের জন্যেই বেশি মাথা-ব্যথা!

কেন?

তোমার গোপালদাকেই দেখো না, পরের মেয়েকে নিয়ে রাত দিন হিমশিম খাচ্ছে।

একেবারে বাজে কথা। গোপালদাকে নিয়েই স্বাতিদি হিমশিম খাচ্ছে।

মিমিরও একই অবস্থা। সন্তুকে খুঁজতে বেরিয়েছে সাত সকালে।

হাল্কা চটির শব্দে আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলুম যে মিমি এই দিকেই আসছে। আর সন্তু তার পিছনে কিছু দেখতে পায় নি বলে চেঁচিয়ে উঠল : কক্ষণো না।

স্বাতির মুখ ছিল মিমির দিকেই। হেসে বলল : সন্তুকে খুঁজতে এসেছ তো!

সন্তু একেবারে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু মিমি বলল : আপনাদের কাছেই এলাম।

সন্তু যে এখানেই আছে তা জানতে নিশ্চয়ই!

সন্তু নিজের চেয়ারটি মিমিকে ছেড়ে দিয়ে আর একটি চেয়ার টেনে এনে বসল।

মিমি বলল : ও তো আপনাদের সঙ্গে কেদারনাথে যাচ্ছে!

স্বাতি বলল : হ্যাঁ। বড় জ্বালাতন করছিল তোমাকে, তাই নিয়ে যাচ্ছি।

মিমির মুখখানি বড় করুণ দেখাল, কিন্তু বলতে পারল না যে সন্তু তাকে জ্বালাতন করছে না। তার বদলে সন্তু জিজ্ঞাসা করল : দিদি কোথায়?

মিমি বলল : চৌবাত্তিয়ার ফলের বাগান দেখতে বেরিয়েছে জামাইবাবুর সঙ্গে।

স্বাতি বলল : তুমি গেলে না কেন?

মিমি একটু অপ্রতিভ ভাবে বলল : কাল খুব কষ্ট হয়েছে বাসে।

হুঁ।

বলে স্বাতি গম্ভীর হয়ে গেল। তার পরে সন্তুকে বলল : সন্তু,

তুমি মিমিকে নিয়ে একটু হেঁটে বেড়িয়ে এসো। আর দেখো, কালকের মতো যেন কষ্ট না পায়!

সন্তু আবার লাফিয়ে উঠল, কিন্তু মিমি লজ্জিত ভাবে উঠল। স্বাতি বলল: যখন ফিরবে, মিমিকে এইখানে পৌঁছে দিয়ে তুমি একা তোমার হোটেলে ফিরবে। আমি ওকে পৌঁছে দেব। আর—

দুজনে বেরিয়ে যাচ্ছিল, একটু থমকে দাঁড়াল।

স্বাতি বলল: আমাদের এখানে না পেলে অপেক্ষা কোরো। সন্ধ্যে বেলায় দু একটা টুকিটাকি জিনিস কিনতে আমরা কিছুক্ষণের জন্যে বেরোব।

সন্তু বলল: সে তো সন্ধ্যে বেলা!

রাগের ভান করে স্বাতি বলল: তবে কি তোমরা এখুনি ফিরবে ভাবছ!

না, তা নয়।

বলতে বলতে সন্তু মিমিকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

তারা চলে যাবার পরে আমি বললুম: কী ছেলেমানুষি হচ্ছে বল তো!

স্বাতি বলল: বয়সের তুলনায় ওরা এখনও ছেলেমানুষ আছে।

তার পরেই বলল: একটু আগে তুমি সিকিম ও ভুটানের কথা বললে, কিন্তু নেপালের কথা এখনও কিছু বলো নি।

বললুম: কিছু জানলে তো বলব!

কিছু জানো না, তা হতে পারে না।

হেসে বললুম: নেপালে তো দূরের কথা, তার ধারে কাছেও আমি যাই নি।

স্বাতি বলল: আমি তো তোমাকে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলছি না। তুমি তোমার পড়া কথা বা শোনা কথা বল। আমি এক কাঠমাণ্ডু আর পশুপতিনাথ ছাড়া আর কিছু জানি-নে।

বললুম: লুম্বিনি বা মুক্তিনাথ নামও বোধ হয় শুনেছ, আর জনকপুর।

স্বাতি বলল: শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

হেসে বললুম: আর ভাবনা কী! এক দিকে সীতার জন্মস্থান, অন্য দিকে বুদ্ধের। মাঝখানে মুক্তিনাথ ও পশুপতিনাথ। এই নিয়েই নেপাল, কাঠমাণ্ডু তার রাজধানী।

স্বাতি বলল: হিমালয়!

সবই তো হিমালয়! হিমালয়ের রাজ্য বলতে নেপালকেই বোঝায়, আর সিকিম ও ভুটান।

স্বাতি বলল: এমন সংক্ষেপে বললে চলবে না। তোমার কাছে গল্প শুনেই মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে চাই। তার পর—

তার পরের কথা স্বাতি বলল না দেখে আমিই জিজ্ঞাসা করলাম: তার পর কী করবে বল।

স্বাতি বলল: তুমি পাগল বলবে।

হেসে বললুম: নেপালে বেড়াতে যাবে। তার পরে সিংহলে, তার পরে—

থাক থাক, আর বলতে হবে না। ভারতবর্ষ দেখা শেষ হয়ে গেলে তো ঘরে বসে থাকব না। পুরনো জায়গাতেও যাব না বার বার। তখন যদি নেপালে যাবার কথা বলি—

কারও আপত্তি করা উচিত নয়।

স্বাতি বলল: বল এই বারে।

বললুম: আমার দু তিনটি বন্ধু এক বার পাটনায় এসেছিল। সেখান থেকে কাঠমাণ্ডু দেখে ফিরেছিল কলকাতায়।

স্বাতি বলল: আর তোমাকে সেই গল্প বলেছে।

শুধু গল্প নয়, সেখান থেকে যে সব বইপত্র এনেছিল তাও পড়তে দিয়েছিল। সেই সব পড়েই নেপাল সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়েছে।

তার পরে আমি স্বাতিকে নেপালের গল্প বললুম।

যাদের পয়সা আছে, তারা উড়োজাহাজে কাঠমাণ্ডু যায়। দিল্লী বেনারস পাটনা কলকাতা আর ঢাকা থেকে প্লেন পাওয়া যায়। তা না হলে ট্রেনে যেতে হয় রক্সৌল। পাটনার গঙ্গা পেরিয়ে ট্রেন আছে, কলকাতা থেকেও ট্রেনে যাওয়া যায়। রক্সৌল স্টেশন হল ভারতে, সীমানার ওপারে বীরগঞ্জ নেপালের শহর। স্টেশন থেকে রিক্সায় যাতায়াত করা যায়। কাঠমাণ্ডুর বাস দাঁড়িয়ে থাকে সীমানার চেক পোস্টে। যাত্রীদের জিনিসপত্র চেক হয় বীরগঞ্জে ঢোকবার আগে। রক্সৌল স্টেশনে আসে বাসওয়ালারা, টিকিট বেচে স্টেশনে, হেঁটে যাবার পথ দেখিয়ে দেয়। ভোর বেলায় পৌঁছলে বীরগঞ্জে জলযোগ সেরে যাত্রা। আর সন্ধ্যার দিকে বাস পৌঁছয় কাঠমাণ্ডু। পাহাড়ের উপর দিয়ে ত্রিভুবন রাজপথ এক শো উনত্রিশ মাইল। বাসগুলো আরামপ্রদ নয়, মাঝে মাঝে বেগড়ায়, সময় ঠিক রাখতে পারে না। এখন উন্নতি হয়েছে কিনা জানি নে।

রক্সৌল ও বীরগঞ্জের মতো ভারত ও নেপাল সীমান্তে আর কয়েকটি যোগাযোগ পথ আছে। একেবারে পূর্ব দিকে যোগবানি ও বিরাটনগর। তার পরে বিহারে জয়নগর ও জনকপুর। রক্সৌলের পশ্চিমে নৌগড় স্টেশন থেকে বাসে যেতে হয় লুম্বিনী। এরও পশ্চিমে টনকপুর পর্যন্ত আরও অনেক জায়গা দিয়ে নেপালে ঢোকা যায়। এই দেশটির তিন দিকে ভারত। শুধু উত্তরে তিব্বত। সেই দিক দিয়েই চীনের সঙ্গে নেপালের যোগাযোগ। ভারত যেমন ত্রিভুবন রাজপথ তৈরি করেছে, চীনারা তেমনি পিকিং থেকেও যোগাযোগের পথ তৈরি করে দিয়েছে।

সিকিম ও ভুটানের চেয়ে অনেক বড় দেশ নেপাল। পূর্ব পশ্চিমে পাঁচ শো মাইল লম্বা, আর উত্তর দক্ষিণে নব্বুই থেকে দেড় শো মাইল। ভারতের দিক থেকে ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে কাঠমাণ্ডু ও পোখারার উপত্যকা অঞ্চল, তার পরে আকাশ ছোঁয়া গিরিশৃঙ্গ।

ওপারে তিব্বত। কিছু দিন আগেও কাঠমাণ্ডু উপত্যকা থেকে পোখারা উপত্যকায় যেতে হত উড়োজাহাজে। এখন শুনেছি মোটরের পথ তৈরি হয়ে গেছে। পোখারা অতি সুন্দর একটি উপত্যকা, এখান থেকেই যেতে হয় গোঁসাইকুণ্ড ও মুক্তিনাথ।

স্বাতি বাধা দিয়ে বলল: আগে কাঠমাণ্ডুর কথা বল।

বললুম: কাঠমাণ্ডু গিয়ে লোকে নেপালের কিছুই দেখতে পায় না। একটি দেশ কখনও একটি শহরে আবদ্ধ থাকে না।

স্বাতি বলল: শহরের কথা বল। তার পরে দেশের কথা শুনব।

তাই বললুম।

শহরের প্রথম দ্রষ্টব্য হল হনুমান ঢোকা বা নেপালের প্রাচীন রাজাদের প্রাসাদ এলাকা, ইংরেজীতে বলে দরবার স্কোয়ার। এখানে অনেক কিছু দেখবার আছে, তার মধ্যে মনে পড়ছে কালভৈরবের একটি বিরাট ও ভয়ঙ্কর মূর্তি আর তালেজু মন্দির। আর যা কোথাও শুনি নি, তা হল জীবন্ত দেবী বা কুমারীর বাড়ি। সবাই তাঁকে প্রণাম করতে যায়, তিনি দেখা দেন দোতলার বারান্দায়, নিচে থেকে দেখতে হয়।

এক প্রধানমন্ত্রী রাণার তৈরি সিংহদরবার হল পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বাসগৃহ। এখন তা নেপালের সেক্রেটারিয়েট। রাজবাড়ির নাম নারায়ণহিতি দরবার। বিখ্যাত পশুপতিনাথের মন্দির হল মাইল তিনেক দূরে বাগমতীর নদীর তীরে। নিকটেই গুহ্যেশ্বরীর মন্দির। গুহ্যেশ্বরী হলেন পার্বতী। কিন্তু নেপালে শুধু হিন্দু ধর্ম নয়, বৌদ্ধ ধর্মেরও সমান মর্যাদা। শহরের বাহিরে ছোট একটি পাহাড়ের মাথায় দু হাজার বছরের পুরনো স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির। পথে নেপাল মিউজিয়ম। আর মাইল চারেক দূরে বিরাট উঁচু বোধনাথ স্তূপ। এও নাকি দু হাজার বছরের পুরনো। আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার হল, নেপালের মন্দিরে দেবতারা হিন্দু

ও বৌদ্ধ দু দলেরই আরাধ্য। শহরের মধ্যে মাছেন্দ্রনাথ মন্দির তার প্রমাণ।

কাঠমাণ্ডুর কাছাকাছি আরও দুটি পুরনো শহর আছে—ছোট ছোট রাজাদের রাজধানী—নাম ললিতপুর ও ভক্তপুর। এই দুটি পরিত্যক্ত রাজধানী এখন পাটন ও ভাদ্‌গাঁও নামে পরিচিত। এ দুটি জায়গাতেও স্কোয়ার আছে, অনেকগুলি মন্দির। কিন্তু ভারতীয় মন্দিরের মতো নয়, পুরোপুরি তিব্বতীও নয়। ছবি দেখে বুঝেছি যে এই স্থাপত্য রীতি—বোধ হয় নেপালের নিজস্ব, তবে খানিকটা যে তিব্বত ঘেঁষা তা বোঝা যায়। ললিতপুর মাত্র তিন মাইল দূরে, তার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল নাকি ২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। এর প্রায় ছ শো বছর পরে ভক্তপুরের প্রতিষ্ঠা, দূরত্ব ন মাইল। কীর্তিপুর নামে নাকি আরও একটি পুরনো রাজধানী শহর আছে পাহাড়ের মাথায়। এ সব জায়গায় যাতায়াতের সুন্দর পথ আছে, বাস আছে। এক বেলাতেই এক একটা জায়গা দেখে ফেরা যায়।

আমি থামতেই স্বাতি বলল: আর কিছু দেখবার নেই?

নেই বলব না, বলা উচিত মনে নেই।

স্বাতি বলল: চেষ্টা করলেই আরও কিছু বলতে পারবে।

বললুম: বন্ধুরা আরও কয়েক জায়গায় গিয়েছিল, আর গল্প করেছিল সে সব জায়গার। নামগুলো একটু বেয়াড়া ধরনের বলে মনে রাখতে অসুবিধে হয়।

তার পরে বললুম দু একটা জায়গার কথা। বালাজু নামের একটি সুন্দর বাগান শহর থেকে দু মাইল দূরে। সেখানে জলের উপরে বিষ্ণুর অনন্ত শয়ন মূর্তি, কিন্তু নাম বুড়া নীলকণ্ঠ। আসল বুড়া নীলকণ্ঠ ছ মাইল উত্তরে। মাইল আষ্টেক দূরে সুন্দরীজল নামে একটা জায়গায় তারা জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিল, আর অন্য পথে মাইল চৌদ্দ দূরে দক্ষিণ কালী। কালীর সামনে পাঁঠা জবাই হয়, আর ডিম বলি হয় আছড়ে ভেঙে। নেপালে মহিষ বলির প্রথা

আছে। মোষের মাংস খায় অনেকে। হোটেলে রেস্তোরাঁতেও নাকি চলে। বড় বড় মাংসের টুকরো দেখে অনেকেরই আতঙ্ক হয়।

স্বাতি বলল: খুবই বিপদের কথা।

বললুম: বিদেশ আজকাল জাত ধর্মের কথা ভাবে না। খেতে অপ্রবৃত্তি না হলেই হল।

স্বাতি বলল: শুনলে হবেই। আলমোড়ার কথা কি এখুনি ভুলে গেলে?

কিন্তু এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি বললুম: এত সব দেখে আসার পরেও বন্ধুদের আমি কী বলেছিলুম জানো?

বল।

বলেছিলুম, নেপাল তোমরা দেখো নি। তারা ক্ষেপে উঠে বলেছিল, কেন? এই প্রশ্নের উত্তরেই আমি সত্যিকার নেপালের কথা বলেছিলুম। নেপাল হল হিমালয়ের মুকুট, সেই মুকুট তারা দেখে নি। অথচ তারা যে কাগজপত্র টুরিস্ট অফিস থেকে চেয়ে এনেছিল, সেই সব পড়েই আমার এই ধারণা হয়েছিল। কাঠমাণ্ডুর কাছে এমন কয়েকটি জায়গা আছে যেখানে দাঁড়ালে হিমালয়ের দিগন্ত প্রসারিত গিরিশ্রেণী দেখা যায়—ধওলাগিরি অন্নপূর্ণা থেকে মাউণ্ট এভারেস্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যন্ত। এমন অপরূপ দৃশ্য রানীখেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিনা জানি না। নিজের চোখে না দেখলে তুলনা করতে পারব না।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: এক সঙ্গে সব দেখা যায়?

বললুম কাঠমাণ্ডু পৌঁছবার আগে ত্রিভুবন রাজপথের ধারে দমন নামে একটা জায়গায় একটা উঁচু ভিউ টাওয়ার আছে। তার উপর থেকে দেখা যায় পশ্চিমে ধওলাগিরি অন্নপূর্ণা তিন ও দুইএর মাঝখানে মচ্ছ পুচ্ছরে, হিমল চুলি মানসলু গণেশ হিমল গৌরশঙ্কর মাউণ্ট এভারেস্ট লোৎসে আর মাকালু। মাউণ্ট এভারেস্টকে

নেপালে সাগরমাতা বলে। আর অনেকগুলি শৃঙ্গের নাম আমার মনে পড়ছে না।

স্বাতি বলল : কাঞ্চনজঙ্ঘা ?

বললুম : কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় নগরকোট থেকে। আর পশ্চিমে মচ্ছ পুচ্ছরের বদলে অন্নপূর্ণা দেখা যায়। অন্নপূর্ণার তিনটি শৃঙ্গ। কাকনি নামে আরও একটি জায়গা থেকে এই সব চূড়ার দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়। নেপাল সরকার রাত্রিবাসের জন্যে টুরিস্ট বাংলো তৈরি করে দিয়েছে।

স্বাতি হিমালয়ের শিখরগুলির কথাই বুঝি ভাবছিল। বলল : তুমি একটু গোলমালে ফেললে।

কেন ?

মাউন্ট এভারেস্টের নাম বললে সাগরমাতা। আর গৌরীশঙ্কর আরেকটা শিখরের নাম। অথচ এর আগে বলেছিলে মাউন্ট এভারেস্টের নামই গৌরীশঙ্কর।

বললুম : এ আমাদের পুরনো ধারণা। পুরাকালে আমরা গৌরীশঙ্করকেই সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বলে জানতাম। এখন দেখতে পাচ্ছি যে তার উচ্চতা অনেক কম—২৩,৪০০ ফুটের মতো।

স্বাতি বলল : হিমালয়ের শিখরের নাম সাগরমাতা হল কেন ?

বললুম : কোনও শেরপাকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যাবে।

কেন, তুমি তো বলেছিলে যে হিমালয় একটা সাগর থেকে উত্থিত হয়েছে। সে জন্যেও হতে পারে।

অসম্ভব নয়।

তার পরে বললুম : এই সাগরমাতার রূপ দেখতে হলে পূর্ব দিকে অনেক দূর যেতে হবে। কাঠমাণ্ডু থেকে দেড় শো মাইল দূরে নাম্‌চে বাজার, প্রায় ষোল দিনের পথ। পথে দুধকুণ্ড নামে একটি জায়গা থেকে হিমালয়ের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। নাম্‌চে বাজার

হল শেরপাদের গ্রাম, ৯৬০০ ফুট উঁচু। ছ মাইল দূরে থিয়াংবোচে ১১৪০০ ফুট উঁচু। লোৎসে লুপ্‌সের সঙ্গে সাগরমাতার দৃশ্য এখান থেকেই সব চেয়ে সুন্দর। নাম্‌চে বাজারের কাছে খুম্‌বু উপত্যকার শেরপা গ্রামগুলি ঘুরে ঘুরে দেখবার মতো।

স্বাতি বলল: এইবারে মুক্তিনাথের কথা বল।

বললুম: সে অন্য ধারে। কাঠমাণ্ডু থেকে আগে পায়ে চলার পথ ছিল। পয়সা থাকলে লোকে উড়ে যেত, সময় লাগত এক ঘণ্টারও কম। এখন বোধ হয় মোটরের পথ চালু হয়ে গেছে। কাকনি এই পথের উপরেই।

পোখারা উপত্যকায় অনেকগুলি সুন্দর লেক আছে। তার মধ্যে ফেওয়াতাল হল সব চেয়ে বড়। মচ্ছ পুচ্ছরে শৃঙ্গের ছায়া পড়ে এই লেকের জলে। অন্নপূর্ণার তিনটি শৃঙ্গও দেখা যায় প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে। আর ধওলাগিরি শ্রেণী। এ সবই ছাব্বিশ হাজার ফুটের বেশি উঁচু।

স্বাতি বলল: মুক্তিনাথ কোথায়?

বললুম: পোখারা শহর থেকে আটষট্টি মাইল দূরে। ছ দিন হেঁটে পৌঁছনো যায় সেখানে। পোখারা উপত্যকা তিন হাজার ফুট উঁচু, আর মুক্তিনাথের উচ্চতা বারো হাজার ফুটের বেশি। তার মানে কেদারনাথ বা তুঙ্গনাথের চেয়েও বেশি উঁচুতে। পথে একটি সুন্দর জলপ্রপাত আছে, আর ততোপানি বা তপ্তপানি নামে একটি উষ্ণ জলের ধারা। মুক্তিনাথে একটি ছোট বিষ্ণুর মন্দির আর এক শো আটটি জলের ধারা। জওয়ালা মাইএর মন্দিরের ভিতরে জলের উপরে আগুনের শিখা দেখতে পাওয়া যায়।

জ্বালামুখীর মতো?

বোধ হয় তাই। আর আমরা যে শালগ্রাম শিলার উপরে বিষ্ণু পূজা করি, তা এখানেই পাওয়া যায় কালী গণ্ডকী নদীর বুকে।

স্বাতি বলল: শালগ্রাম জিনিসটা কী?

বললুম : কালো অ্যামোনাইট ফসিল।

তার পরে দামোদর কুণ্ডের কথা বললুম : এখান থেকে চার দিনের পথ উত্তরে গেলে চোদ্দ হাজার ফুটে আর একটি তীর্থস্থান হল দামোদর কুণ্ড। চারি দিকে বরফের পাহাড় ঘেরা এই কুণ্ডের ভিতর দিয়ে দুটি পাহাড়ী নদী বয়ে গেছে। আর খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে এই কুণ্ডের জলেই শালগ্রাম শিলা সহজে পাওয়া যায়।

গোঁসাইকুণ্ডের কথাও আমার মনে পড়ল। বললুম : কাঠমাণ্ডু থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে আর একটি তীর্থস্থান আছে ষোল হাজার ফুট উপরে। কাঠমাণ্ডু থেকে যাতায়াতে বারো দিন সময় লাগে। পথে সাতটি লেক দেখা যাবে, তার মধ্যে গোঁসাইকুণ্ড হল সব চেয়ে বড়। আর আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই সব কুণ্ড নাকি একটার সঙ্গে আর একটা যুক্ত হয়ে আছে। আশ্চর্য সুন্দর নাকি এই সব পথ ঘাট আর পাহাড়ী অঞ্চল।

স্বাতি হেসে বলল : নেপাল সম্বন্ধেও কিছু লিখবে নাকি ?

না গিয়েই লেখা ?

যাও নি মনে হচ্ছে না তো !

গেলে বুঝতে পারবে, কতটা ঠিক বলেছি আর কতটা ভুল।

স্বাতি বলল : তবে একবার গিয়েই দেখতে হবে, কী বল !

এর উত্তর না দিয়ে আমি বললুম : মধ্য ও উত্তর নেপাল সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছি। কিন্তু দক্ষিণ নেপাল মানে তরাই অঞ্চলের কথা কিছুই বলা হয় নি।

বল এই বারে।

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : পূর্বে তরাই অঞ্চলে বিরাটনগর নামে একটি শহর আছে। কিন্তু মহাভারতের বিরাট নগর নিশ্চয়ই নয়। জনকপুর কিন্তু রামায়ণের জনক রাজার রাজধানী। সীতার জন্ম হয়েছিল এইখানে, আর রাম এখানেই হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে বিবাহ

করেছিলেন। জানকী সীতার একটি সুন্দর মন্দির আছে এখানে, আর চারি ধারে অনেকগুলি কুণ্ড। প্রতি বছর বিবাহ পঞ্চমী ও রাম নবমীর উৎসব হয়।

স্বাতি বলল : যেতে হয় কেমন করে?

বললুম : কাঠমাণ্ডু থেকে যদি প্লেনে যেতে না চাও তো দ্বারভাঙ্গার পথে যেও। জয়নগর থেকে নেপাল সরকারের খেল্‌না রেল পাবে। কিন্তু লুম্বিনী যেতে হলে কোনও খেল্‌না রেল নেই। নর্থ ঈস্টার্ন রেলে নওগড় নামে একটা স্টেশন আছে। সেখান থেকে একুশ মাইল পথ বাসে যেতে হয়। আর তা না হলে কাঠমাণ্ডু বা পোখারা থেকে প্লেন।

লুম্বিনীতে এখন কী দেখবার আছে?

বললুম : গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান। বুদ্ধের মা মায়াদেবীর একটি পাথরের মূর্তি আছে, বুদ্ধের একটি পুরনো মন্দির, আর একটি ভাঙা অশোক স্তম্ভ। দ্রষ্টব্য বলতে এই সব। কিন্তু তীর্থস্থান বলে নানা দেশ থেকে যাত্রী আসে।

স্বাতি বলল : বুদ্ধ তো শুদ্ধোধন রাজার ছেলে। কিন্তু লুম্বিনী বনে তাঁর জন্ম হল কেন?

হেসে বললুম : সচরাচর এ প্রশ্ন কেউ করে না। তাই উত্তরটাও অনেকের জানা নেই। অথচ কপিলাবাস্তু যে শুদ্ধোধন রাজার রাজধানী ছিল তা সবারই জানা।

স্বাতি কোনও কথা না বলে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বললুম : লুম্বিনী থেকে মাইল পনেরো দূরে তৌলি হাওয়া নামে একটি শহর আছে। লোকে বলে, এই জায়গাই প্রাচীন কপিলাবাস্তু। অন্তঃসত্ত্বা রানী মায়াদেবী লোকজন নিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছিলেন। পথে এই লুম্বিনী বনে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন যখন দুটি শালগাছের মাঝে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখনই জন্ম হয়েছিল গৌতমের। নাম রাখা হয়েছিল সিদ্ধার্থ। এ হল খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ শো তেষটি বছর

আগের ঘটনা। এই সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধ হয়েছিলেন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে, আর বেঁচে ছিলেন আশী বছর।

তার পর ?

তার পর নয়, তার আগের কথা বলি। এক শো বছর আগেও বুদ্ধের এই জন্মস্থানের কথা কেউ জানত না।

সত্যি ?

বললুম: ১৮৯৬ সালে ফুরার নামে এক সাহেব এইখানে এক শিলালিপি আবিষ্কার করলেন অশোকের আমলের। তাই থেকেই সব জানা গেল। কিন্তু পুরাকালে এ কথা সবাই জানত—ফা হিয়েন হিউএন সাঙ এঁরা এসে লুম্বিনী দেখে তার বর্ণনা লিখে রেখে গিয়েছিলেন। এই জায়গাটি নতুন করে আবিষ্কার করেছে সাহেবরা।

স্বাতি বলল: নেপালে আর কিছু দেখবার আছে ?

বললুম: রাপ্তি উপত্যকা। কিন্তু এর বেশি আর কিছুই জানি না।

স্বাতি হেসে বলল: তবে থাক। নেপালে গিয়েই আমরা নেপালকে আবিষ্কার করব।

২১

বিকেলের চায়ের পরে স্বাতি বলল : চল একটু বেরিয়ে পড়ি।

আমি বললুম : তুমি যে সন্তুদের জন্যে অপেক্ষা করবে বলেছিলে!

স্বাতি বলল : অন্ধকার হবার আগে ওরা আসবে না।

কী করে বুঝলে?

মিমি বোধ হয় জানে ওর দিদি দুপুরে ফিরবে না। তা না হলে অনেক আগেই এসে উপস্থিত হত।

বুঝেছি।

স্বাতি আমার গায়ে একটা সোয়েটার চাপিয়ে দিয়ে বলল : চল।

আমি বললুম : কোনও কাজের তাড়া আছে মনে হচ্ছে।

আছে বৈকি। কাল ভোর বেলায় যদি যাত্রা করতে হয়তো আজ সন্ধ্যার মধ্যেই সব ব্যবস্থা করতে হবে।

তার পরে বলল : বলেছিলুম, কিছু কেনাকাটার দরকার নেই কিন্তু বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে হবে তো, বিছানাও বাঁচাতে হবে।

ছাতা কিনবে?

পাগল!

তবে?

প্লাস্টিকের রেন কোট পেলে কিনে নেব।

না পেলে?

নিজেরা ভিজব। কিন্তু বিছানা বাঁচাবার জন্যে প্লাস্টিকের ঢাকা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

তার সঙ্গে নিচে নেমে এসে বললুম : আর কিছুর দরকার হবে না?

স্বাতি বলল : মালপত্রের বোঝা না থাকলে আনন্দ বেশি পাওয়া যাবে।

কিন্তু কোন দোকানে না ঢুকে স্বাতি এগিয়ে চলল। বললুম : কোথায় চললে ?

স্বাতি বলল : আগে বাস স্ট্যাণ্ডে খোঁজ নিয়ে আসি।

গতকাল আমরা আলমোড়ার বাস যেখানে পেয়েছিলুম, সেটা নাকি আসল বাস স্ট্যাণ্ড নয়। এটা আমাদের হোটেলের কাছেই, বাজারের এক প্রান্তে। তাই আমরা অন্য প্রান্তের আসল বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেলুম। কাঠগোদাম ও নৈনিতাল থেকে যে সব বাস আসে সেগুলো উপরের রাস্তা দিয়ে সমস্ত শহরটা ঘুরে নিচের রাস্তা ধরে সেখানে পোঁছয়। ছাড়েও এইখান থেকে। তবে শহরটা আর ঘুরে যায় না। ফেরার যাত্রীদের তাই সেখানে গিয়ে বাসে উঠতে হয়। একটা পাকা বাড়িতে অফিস। আগে ভাগে সীট রিজার্ভ করার ব্যবস্থা আছে। নির্দিষ্ট দিনে সময় মতো এসে বাসে উঠলেই হল। কিন্তু আমরা হতাশ হলুম। বদ্রীনাথের বাস এ দিক থেকে ছাড়ে না। আর বদ্রীনাথের বাস নাকি এখনও চালু হয় নি। অদূর ভবিষ্যতে চলবে। এখন এই বাস কর্ণপ্রয়াগ পর্যন্ত চলছে। কর্ণপ্রয়াগে বাস বদল করে বদ্রীনাথে যেতে হবে।

ফেরার পথে আমি বললুম : আগে ঐ দিকে গেলেই ভাল হত।

স্বাতি বলল : সারা দিন তো বসেই আছি। তবু একটু হাঁটা হল।

দোকান পাট দেখতে দেখতে স্বাতি একটা পছন্দ মতো দোকানে ঢুকে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল : সস্তায় রেন কোট আছে ? ওয়াটার প্রুফ ?

আপনার জন্যে ?

দুজনের জন্যেই।

দোকানদার আর কোনও প্রশ্ন না করে পাতলা প্লাস্টিকের বাণ্ডিল বার করল গোটা দুই। একটা এক রঙা। আর একটা ছাপ কাটা

প্লাস্টিকের। দেখা গেল যে এক রঙা বাণ্ডিলটা মেয়েদের। একটুখানি ফাঁক দিয়ে হাত বার করতে হয়। আর সমস্ত গা জড়িয়ে গলার নিচে আটকে দেবার ব্যবস্থা। অন্য বাণ্ডিলটা পুরুষদের জন্যে। গলা থেকে নিচে অবধি বোতাম, পুরো হাত, হাঁটু পর্যন্ত ঝুল। স্বাতি একটা সাদা রঙের রেন কোট পছন্দ করে নিল। বেশ সস্তা দেখে আমি বললুম: আমাকেও ঐ রকম একটা দাও।

এ যে মেয়েদের জন্যে!

বলে পুরুষদের ওয়াটার প্রুফ একটা আমার হাতে দিল। বললুম: এটা পরতে না পরতেই বৃষ্টি থেমে যাবে।

স্বাতি আর তর্ক না করে আর একটা সাদা রঙের কোট বার করে নিল। খুলে পরবার কায়দাটা বুঝে নিয়ে বলল: এর টুপি পাওয়া যাবে কি?

নিশ্চয়ই।

বলে দোকানদার দুটো সাদা টুপি বার করে আনল। বাচ্চাদের মতো মাথায় পরে নিচে ফিতে বাঁধতে হয়। তার পরে বিছানা জড়াবার উপযোগী খানিকটা প্লাস্টিকের কাপড় কিনে দোকান থেকে আমরা বেরিয়ে এলুম।

এ ধারের বাস স্ট্যাণ্ডেও টিকিট পাওয়া গেল না। টিকিট ঘর বন্ধ। আশেপাশে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে এখানে অ্যাড্ভান্স বুকিংএর কোন ব্যবস্থা নেই। বাসের সময় কাউণ্টার খুলে টিকিট দেওয়া হয়। ভোর ছটায় এলে কর্ণপ্রয়াগের বাস পাওয়া যাবে, আর টিকিট পেতেও অসুবিধা হবে না।

স্বাতি বলল: নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

তবে কী করবে?

করবার আর কি আছে! সময় মতো না এসে কিছু আগেই আসব।

কিংবা হোটেলের গাইডকে বলব আগে ভাগে এসে টিকিট কেটে জায়গা দখল করতে।

স্বাতি খুশী হয়ে বলল : সেই ভাল।

আর আমি অত্যন্ত বিনয় সহকারে বললুম : এই বারে হুকুম?

হোটেলের দিকে পা বাড়িয়ে স্বাতি বলল : কর্ণপ্রয়াগের বাসে উঠে তোমার বক্তৃতা আর শুনব না, দু চোখ ভরে হিমালয়ের শোভা দেখব।

সে তো খুব ভাল কথা।

তাই হিমালয়ের কথা যদি কিছু বাকি থাকে তো এই বেলা বলে ফেল।

বললুম : কাশ্মীর থেকে ভুটান পর্যন্ত তো বলেছি।

আসামের হিমালয়?

শিলং তো হিমালয়ে নয়, আসামের হিমালয়ে কী আছে বল তো!

স্বাতি বলল : আমি আবার কী বলব!

আমি একটু ভেবে বললুম : আসামের উত্তরে অরুণাচল প্রদেশ হল হিমালয়ের কোলে। ১৯৬২ সালে চীন যখন ভারত আক্রমণ করেছিল, তখন এই অঞ্চলের কথা শুনেছিলুম। ছোটখাট কয়েকটি শহর আছে, তার মধ্যে নাম মনে আছে একটির। বম্‌ডিলা। আর একটি তীর্থস্থানের নাম পরশুরাম কুণ্ড। এন. এফ. রেলের শেষ স্টেশন সদিয়া থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে।

কী দেখবার আছে সেখানে?

একটি কুণ্ড ছাড়া আর কী আছে তা বলতে পারব না। তবে তীর্থস্থান যখন, তখন একটা ধর্মশালা নিশ্চয়ই আছে।

স্বাতি বলল : বাইরে আর ঘুরে বেড়াব না। এবারে হোটেলেই ফেরা যাক।

এত তাড়াতাড়ি!

এখানে কিছু দিন থাকব বলে বেশ গুছিয়ে বসেছিলাম, সে সব আবার গুছিয়ে তুলতে হবে।

মিমিদের চিন্তাও আছে।

সে চিন্তা ওদেরই বেশি। ওরা আমাদের জন্যে বসে থাকবে।

কিন্তু না, হোটেলে ফিরে দেখলুম যে ওরা আসে নি। স্বাতি ঘরের দরজা খুলে আমার হাতের প্যাকেটটা ভিতরে রেখে বাইরের বারান্দায় এসে বসল। বলল: এই বারান্দার জন্যেই হোটেলটি আমাব ভাল লাগছে।

বললুম: এখন তো আর বরফের পাহাড় দেখা যাচ্ছে না!

তা না যাক, হিমালয়ের সংস্পর্শে আছি মনে হচ্ছে।

হেসে বললুম: হিমালয়ের কথা আমরা কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

ভোলা সম্ভব নয়।

একটু থেমে বলল: হিমালয় যে আমাদের এই ভাবে টানবে এ আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

আমি হেসে বললুম: কেদারনাথের মন্দির তো তুমি স্বপ্নেই দেখেছিলে!

স্বাতি বলল: খুব আশ্চর্য লাগছে না!

খানিকটা অলৌকিক মনে হচ্ছে।

কেন বল তো?

বললুম: এ পথে কেউ কেদারনাথে যায় বলে কখনও শুনি নি। কেদারনাথের যাত্রীরা চিরকাল এসেছে হরিদ্বার ও ঋষিকেশের পথে। শুধু কেদারনাথের যাত্রী নয়, যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী কেদার ও বদরী এই চার ধামের সব যাত্রী হরিদ্বারে এসে ঋষিকেশের পথে যাত্রা করে। উত্তরাখণ্ডের এইটেই পথ।

স্বাতি বলল: দেরাদুন থেকেও আসা যায় শুনলাম।

দেরাদুন থেকে ঋষিকেশের ভাল পথ আছে। আর মসুরি

থেকেও পথ তৈরি হয়েছে শুনেছিলাম। একটা পথ টেহরি এসেছে আর একটা বড়কোট। যমুনোত্রীর পথে বড়কোট নাকি একটা বড় জায়গা।

এ অঞ্চলের একটা ম্যাপ হলে তোমার খুব সুবিধে হত, তাই না? কিন্তু পাবে কোথায়?

দেখি চেষ্টা করে।

বলে স্বাতি উঠে পড়ল। আমি তাকে বাধা দেবার আগেই চলে গেল ম্যানেজারের ঘরের দিকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল। বলল: দু কাজই হল।

কোনও প্রশ্ন না করে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল: কাল ভোর বেলায় যে আমরা যাচ্ছি, সে কথাও জানিয়ে দিলাম। ভোর বেলায় চা চাই, আর বিল আজ রাতে। ম্যানেজার একখানা ম্যাপের ব্যবস্থা বোধ হয় করতে পারবে।

হেসে বললুম: খুব ভাল ব্যবস্থা।

এখন হাসছ, কিন্তু না হলে তোমারই মুখ ভার হত।

ঠিক এই সময়েই হুড়মুড় করে সন্তু উঠে এল মিমির সঙ্গে। হাঁপাতে হাঁপাতে এল। খুব পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে তাদের। স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: কী ব্যাপার?

সন্তু বলে উঠল: অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম।

আর মিমি বলল: একটু ভেতরে এসো না স্বাতিদি।

বলে স্বাতিকে ডেকে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকল। অল্পক্ষণ পরেই স্বাতি একা বেরিয়ে এল। সন্তু ততক্ষণে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েছে। স্বাতিকে দেখেই বলে উঠল: বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

তা তো পাবেই।

বলে আবার সে ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে কিছু পাঠাবার কথা বলে এল।

সন্তুকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : কোথায় গিয়েছিলে ?

কোথায় ! সে অনেক দূরে বুঝলেন !

থাক, আর বুঝিয়ে কাজ নেই।

বলে স্বাতি তাকে থামিয়ে দিল। সন্তু অপ্রতিভ হল খানিকটা, কিন্তু মনে হল যেন একটা কঠিন পরীক্ষার হাত থেকে বেঁচে গেল।

মিমির অনেকটা সময় লাগল বেরোতে। কিন্তু যখন বেরোল তখন আর সেই ক্লান্তির চিহ্ন নেই দেহে। মুখ হাত ধুয়ে কাপড়টা গুছিয়ে পরেছে। চুল আঁচড়েছে, ঘাড়ের কাছে পাউডার দেখা যাচ্ছে খানিকটা। আর একটা সৌরভ। এ সৌরভটি আমার খুব পরিচিত। স্বাতি হেসে বলল : এসো।

মিমি বেশ সলজ্জ ভাবে স্বাতির কাছে এসে বসল।

খাওয়া শেষ হতেই স্বাতি বলল : মিমিকে এবারে পৌঁছে দিতে হবে নাকি ?

মিমি যেন কৃতার্থ হয়ে গেল, বলল : আমার খুব ভয় করছে।

মিমির সঙ্গে সন্তুও উঠে দাঁড়াল। তাদের খানিকটা এগিয়ে দিতে গিয়ে বলল : আমার কথা জিজ্ঞেস করলে—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : কৌসানি গেছে বলব তো ?

সন্তু বোধ হয় হেঁট হয়ে স্বাতির পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিল। কিন্তু স্বাতি সরে গিয়ে বলল : অতি ভক্তি হল চোরের লক্ষণ।

চোরই তো !

বলল মিমি।

কিন্তু স্বাতি বলল : চুরির ধন চোর ফেরৎ দেয় না।

বলে নিচে নেমে গেল। আর সন্তু ফিরে এল আমার কাছে।

কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ তো !

আমি ! হ্যাঁ, যাচ্ছি বৈকি। কিন্তু—

কিন্তু কী !

দরকারী জিনিসপত্র এখনও কিছু কেনা হয় নি।

বলে উসখুস করতে লাগল সন্তু। আর এই সময়ে স্বাতি এল ফিরে। বলল ঃ এই বারে নিশ্চিন্ত মনে যাও।

নিশ্চিন্ত মনে!

হ্যাঁ, মিমি সারা দিন আমার কাছেই ছিল।

আর আমি?

তুমি কৌসানিতে। এই মাত্র কৌসানির একখানা বাস ফিরল।

গ্র্যাণ্ড!

বলে সন্তু এক মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি স্বাতির মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে তাকে। তার কারণ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলুম ঃ কী ভাবছ বল তো!

একটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে স্বাতি বলল ঃ কত দয়ার পাত্র এরা।

কেন?

ভালবাসতেও ভয় পায়!

অতীতের কথা আমার মনে পড়ে গেল। স্বাতি কোন দিন কাউকে ভয় পায় নি। সবার সামনে সে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। দিনে রাত্রে, যখন ইচ্ছে তখন। তার আচরণে এমন একটা ভাব ছিল যে তার ব্যক্তিত্বকে আমি শ্রদ্ধা করেছি, ভালবেসেছি তার ভালবাসাকে, আর সম্মান করেছি তার সম্মানকে। আমি তাকে ছোট হতে দিই নি, সেও আমাকে বড় থাকবার সুযোগ দিয়েছে। পরস্পরকে অনুভব করেছি আমরা হৃদয় দিয়ে।

কেন জানি না, বম্বের একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। জো রায় স্বাতিকে বিয়ে করবার জন্যে উৎসুক হয়েছিল। আর তাকে খুশী করবার জন্যে বলেছিল, আপনি বেশ অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস্।

স্বাতি বলেছিল, গোপালদার মতো নই। আজ এখানে, কাল

শুনবেন খাজুরাহোর ভাঙা মন্দিরে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। তাই না গোপালদা ?

সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল যে স্বাতি আমাকে ফিরে যেতে বলছে। একটু আগে আমারও এই কথা মনে হয়েছিল। আমি ফিরে গেলে স্বাতির মা নিশ্চিন্ত হবেন, খুশী হবে জো রায়। কিন্তু স্বাতির মনের কথাটি জানি নে বলেই এ প্রস্তাব করতে সাহস পাই নি। এই বারে বলে ফেললুম, ভাবছি—

স্বাতি বলল, আজই ফিরবে ?

আমি চমকে উঠেছিলুম, বুকেব ভিতরটায় একটা বেদনা মুচড়ে উঠেছিল। কিন্তু মুখে বলেছিলুম, আজই।

তার পরে কারও অনুরোধ শুনি নি। এক রকম জোর করেই ফিরেছিলুম বম্বে থেকে। স্বাতি নিজে গিয়ে টিকিট কেটে এনেছিল। তার বাবা মা'র সামনে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল আমাকে। তার পরে মুখ তুলে হেসেছিল। এমন সুন্দর হাসি আমি অনেক দিন দেখি নি। কিন্তু আনন্দের বদলে মন আমার বেদনায় ভরে গিয়েছিল। বড় অসহায় মনে হয়েছিল নিজেকে।

স্বাতি বলল : হঠাৎ এমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলে কেন বল তো ?

একটা পুরনো কথা মনে পড়েছে।

কী কথা ?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : সে বারে বম্বে স্টেশনে গাড়িতে তুলে দিয়ে আমাকে বলেছিলে—

থাক সে কথা।

বলেছিলে, নিজের ঐশ্বর্যের পরিমাণ তুমি জানো না। তাই এমন ভয় পাও। তোমার সম্পত্তি কি কেনা হয়ে যায় নি !

স্বাতি আজ যেন লজ্জা পেল। কিন্তু সেদিন আমি তার দু

চোখের দৃষ্টি বাষ্পে আচ্ছন্ন দেখেছিলুম। সমস্ত ভয় আমার দূর হয়ে গিয়েছিল। জো রায়ের সঙ্গে স্বাতি যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াক। তার মন নিশ্চয়ই আমার মনে বাঁধা পড়ে গেছে। প্রসন্ন হাসি দিয়ে স্বাতির উত্তর আমি দিয়ে এসেছিলুম।

স্বাতি বলল: মিমি এ রকম কথা বলতে পারবে না। সন্তুও পারবে না আমাদের সঙ্গে যেতে।

কিন্তু সন্তু যে যাবে বলে গেল!

সে মুখের কথা। মনে তার দৃঢ়তা নেই।

কেন?

ভাবছে, দূরে গেলেই তার ধন হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

আমি বললুম: কাল বোঝা যাবে, তোমার ধারণা সত্যি কিনা।

২২

ভোর ছটার আগেই আমরা গরম জলে স্নান করে সামান্য কিছু খেয়ে কর্ণপ্রয়াগের বাসে এসে উঠলুম। স্বাতি কাল রাতেই হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়েছিল, এমন কি সকালের চা ও গরম জলের পয়সা পর্যন্ত। হোটেলের গাইডও আমাদের সাহায্য করেছে। সেও তার প্রাপ্যের অতিরিক্ত পেয়েছে বলে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। শেষ নমস্কারটি জানাবে বাস ছাড়বার পরে।

ড্রাইভার যখন গাড়িতে স্টার্ট দিল, তখন স্বাতি বলল : দেখলে তো, সন্তু এল না।

ঠিক এই সময়ে সন্তুকে দেখা গেল ছুটতে ছুটতে আসছে। কিন্তু সঙ্গে কোনও মালপত্র নেই। কাছে এসে চেঁচিয়ে বলল : কেউ আমাকে যেতে দিচ্ছে না গোপালদা।

এ কথার উত্তর দিল স্বাতি, বলল : আমি তা আগেই জানতাম।

কিন্তু বাস ছেড়ে দিয়েছিল বলে সে কথা বোধ হয় সন্তু শুনতে পেল না। আমার দিকে চেয়ে স্বাতি বলল : দুর্গা দুর্গা।

এবারে আমরা নতুন পথে যাব। রাতে হোটেলের ম্যানেজার একখানা মানচিত্র সংগ্রহ করে দিয়েছিল। কোনও ট্রাভেল এজেন্সির ছাপা, কিন্তু অনেক দিনের পুরনো বলে বুঝতে কষ্ট হয়েছে, কোন্ পথে আমরা যাব। রানীখেত থেকে দ্বারা হাট ও গলাইএর উপর দিয়ে যে পথ কর্ণপ্রয়াগে গেছে, সেটা পায়ে হাঁটা পথ দেখানো আছে। আর একটা পথ আছে গরুড় গোয়ালভামের উপর দিয়ে। সে দিকেও অনেকখানি পায়ে চলার পথ। শেষ পর্যন্ত এক স্থানীয় সহযাত্রীর শরণ নিতে হল। তিনি বললেন : রামনগর থেকে গলাই আর রানীখেত থেকে গলাই পর্যন্ত মোটর পথ অনেক দিন আগে থেকেই আছে। আবার কর্ণপ্রয়াগ থেকে সিম্‌লি আদি বদরীর

উপর দিয়ে লোভা পর্যন্ত মোটর পথও ছিল। গলাই থেকে লোভা সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে। এখন মোটর চলছে, আগে হাঁটতে হত।

আমার মনে হল যে এইটেই বোধ হয় রামনগরের পথ। গলাই থেকে যে পথ রামনগরে গেছে, সেই পথের সঙ্গে এই পথের যোগ আছে। নতুন পথে চলবার সময়ে একখানি ভাল মানচিত্র যে একেবারে অপরিহার্য, মনে মনে তা আমি বিশ্বাস করলুম।

খানিকক্ষণ চলবার পরে স্বাতি বলল: একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে।

হেসে বললুম: যে কথা জিজ্ঞেস করবে না ভেবেছিলে, সেই কথা তো?

আর কোনও কাজ নেই বলেই কথা বলার প্রয়োজন হয়েছে।

কী জানতে চাও বল।

স্বাতি বলল: বদ্রীনাথের যাত্রীরা তো হরিদ্বার থেকে আসেন, কর্ণপ্রয়াগে আসতে কত সময় লাগে জানো?

বিপদের কথা।

কেন?

এ পথে তো কোন দিন যাতায়াত করি নি, সময়ের হিসেব কী করে জানব!

স্বাতি চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তার পরে বলল: শুনেছি, ঋষিকেশ থেকে ভোর বেলায় যাত্রা করলে সন্ধ্যে বেলায় পৌঁছনো সম্ভব বদ্রীনাথে। তা না হলে যোশীমঠে রাত্রিবাস করতে হয়।

অনেক সময় যোশীমঠেও পৌঁছতে পারে না বলে শুনেছি।

কর্ণপ্রয়াগ তো মাঝ পথে?

ঠিক বলতে পারব না।

মনে হয়, কর্ণপ্রয়াগে আমাদের পড়ে থাকতে হবে না। এ বাস থেকে নেমে অন্য বাসে আমরা এগিয়ে যেতে পারব।

এতক্ষণে স্বাতির দুর্ভাবনা আমি বুঝতে পারলুম। হেসে

বললুম : পড়ে থাকতে হলেই বা ক্ষতি কী ! তীর্থের পথে আনন্দের কোন অভাব নেই।

স্বাতি বলল : অভাব হল বাসে জায়গার। যাত্রীরা শুনেছি, দিনের পর দিন বাসের টিকিটের জন্য ঋষিকেশে পড়ে থাকে। ধর্মশালার ভিড় বাড়ে, সর্বত্র স্থানাভাব। এক একজনের কাছে শুনেছি যে যাত্রীর মরশুমে ঋষিকেশ নাকি নরকে পরিণত হয়।

এ হল সুখী লোকের কথা। যাত্রীরা এমন কথা বলে না।

আরও কিছুক্ষণ পড়ে স্বাতি বলল : তুমি নিশ্চয়ই এ দিকের অনেক ভ্রমণ কাহিনী পড়েছ ?

কেন বল তো !

এমনিই জানতে চাইছি।

বললুম : বেড়াতে ভালবাসি বলে ভ্রমণের বই যত্ন করেই পড়ি। আর বলেছি তো, হিমালয়ের উপরে লেখা বই খুব যত্ন করে পড়েছি।

স্বাতি আমার হাত থেকে ম্যাপখানা কেড়ে নিল। বলল : তবে অমন গোমরা মুখে বসে আছ কেন !

হেসে বললুম : তুমিই তো বলেছিলে, এ পথে কোনও কথা শুনবে না, শুধু দেখবে !

দেখবার সময় কারও কথা শোনা যায় না নাকি !

বলে আমার মুখের দিকে তাকাল।

তা যায়। কিন্তু কানের কাছে কেউ বকবক করলে বিরক্ত বোধ হয়।

নাও, আর দাম বাড়াতে হবে না। আমি না হয় কিছুক্ষণ চোখ বুঁজেই থাকব।

সর্বনাশ! ঠিক এই সময়ে চোখ বুঁজতে চাও !

কেন ?

রানীখেত থেকে তো আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। তের

মাইল না কুড়ি মাইল তা বলতে পারব না। এই বারে দুধারে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগোতে হবে।

কেন, তা তো বলবে!

বললুম: অনেক দিন আগে দ্বারা হাটে ছিল প্রাচীন কাত্যুরি রাজাদের রাজধানী। পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে একটি ছোট্ট, সুন্দর শহর। পুরনো মন্দিরের জন্যে এখনও বিখ্যাত। শহরের নানা জায়গায় এই সব মন্দির, আর এক এক জায়গায় অনেক কটি মন্দির পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। মন্দির-শৈলী নাকি রাজস্থান বা গুজরাতের মতো।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: এ কথা কোথায় শুনলে?

বললুম: তোমার কাগজপত্রের মধ্যেই পড়েছি।

তাহলে একটু নজর রাখতে হবে।

বলে স্বাতি জানালা দিয়ে চেয়ে রইল।

অল্পক্ষণ পরেই আমরা দ্বারা হাটে পৌছলুম, কিন্তু বাস থেকে নামবার সুযোগ পেলুম না। এক দল মেয়ে পুরুষ বাসের অপেক্ষা করছিল। বাস দাঁড়াতেই চেঁচিয়ে উঠল: বদরি বিশাল কি জয়!

আমাদের দৃষ্টি অবিলম্বে আকৃষ্ট হল তাদের দিকে। ঝকমকে জামা কাপড় পরা নানা বয়সের মেয়ে পুরুষ। পুরুষের চেয়ে মেয়ের সংখ্যাই বেশি। দেখতে দেখতেই আমাদের বাস ভরে গেল। বড় বড় পোটলা পুঁটলি নিয়ে সমস্ত বাস তারা অধিকার করে বসল।

বাস যখন ছাড়ল, তখন নিচের কয়েকজন লোক চেঁচিয়ে উঠল: বদরি বিশাল কি জয়!

ভিতরের যাত্রীরাও সমস্বরে উত্তর দিল: বদরি বিশাল কি জয়!

এতক্ষণে আমাদের বিশ্বাস হল যে আমারা তীর্থের পথে যাত্রা করেছি। কিন্তু দ্বারা হাটের মন্দিরের কথা যখন মনে পড়ল, তখন আমরা অনেক দূরে এগিয়ে এসেছি।

স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: তোমার মন্দির দেখতে পেলাম না।

বললুম: প্রাণবন্ত মানুষ সব কিছু ভুলিয়ে দিতে পারে।

বাসের ভিতরে কলরব তখনও কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নি। তবু স্বাতি আমাকে তাড়া দিয়ে বলল: এই বারে নিজেদের তীর্থযাত্রী মনে হচ্ছে তো, তীর্থের কথায় মন লাগবে।

কেন জানি না, ছেলেবেলা থেকেই ম্যাপ দেখতে আমার ভাল লাগত। খুব মনোযোগ দিয়ে ম্যাপ দেখতুম, বিশেষ করে আমাদের দেশের ম্যাপ। ভ্রমণ কাহিনীর বইএ যে সব ম্যাপ থাকে, তাও দেখতুম খুঁটিয়ে। মাইলের হিসেব থাকলে তাও মনে রাখবার চেষ্টা করতুম। কেদার-বদরী যাবার ইচ্ছে যে আগে হয় নি, তা নয়। গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী দেখবার শখও হয়েছিল প্রবল। চিঠি লিখে টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্টের কাগজপত্রও আনিয়েছিলুম। কিন্তু ভাল সঙ্গীর অভাবে এত দিন সে সুযোগ হয় নি। পয়সার অভাবও ছিল এত কাল। সে অভাব তো সম্প্রতি দূর হয়েছে। সঙ্গীও পেয়েছি। আর অভাবনীয় ভাবে এই সব তীর্থ দর্শনের সুযোগও এসেছে জীবনে। কোন্ খান থেকে শুরু করব, তাই আমি ভাবছিলুম। স্বাতি বলল: দেরি করছ কেন?

বললুম: সেবারে পুজোর সময় হরিদ্বারে এসেছিলুম। হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশ লছমনঝুলা।

জানি সে কথা।

কলকাতা থেকে যে দেরাদুন এক্সপ্রেস ছাড়ে, তা হরিদ্বারের উপর দিয়ে দেরাদুনে যায়। হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশ অবধি ব্রাঞ্চ লাইন আছে দেখেছি। আবার এ অঞ্চলের পথ ঘাটও সুন্দর। হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশ বা দেরাদুন থেকে ঋষিকেশ আসতে ট্রেনে চড়বার দরকার নেই। তার পরে মোটরের পথ। আর ঋষিকেশ থেকে উত্তরাখণ্ডের প্রধান রাজপথ হল দুটি—একটি নরেন্দ্রনগর টেহরির

উপর দিয়ে যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রীর পথ, আর একটি দেবপ্রয়াগ কীর্তিনগর শ্রীনগরের উপর দিয়ে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের পথ।

যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রীর পথ দু ভাগ হয়েছে টেহরির উত্তরে ধরাসু থেকে। ধরাসু থেকে একটি পথ বড়কোটের উপর দিয়ে যমুনোত্রী গেছে, আর গঙ্গোত্রীর পথ উত্তরকাশীর উপর দিয়ে গঙ্গোত্রী ছাড়িয়ে গোমুখ পর্যন্ত গেছে। মসুরি থেকে যারা যমুনোত্রী যাবে, তারা এখন সরাসরি বড়কোটে আসতে পারে মোটরে। তার পরে যমুনোত্রী দেখে ধরাসু উত্তরকাশী হয়ে গঙ্গোত্রী। যারা শুধু কেদার-বদরী যাবে, তারা অন্য পথে সোজা টেহরি এসে সেখান থেকে কীর্তিনগর ও শ্রীনগরের মূল পথ ধরবে। শ্রীনগরের পর কেদার-বদরীর পথ আলাদা হয়েছে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে। কুণ্ড গুপ্তকাশীর পথে কেদারনাথ, আর কর্ণপ্রয়াগ যোশীমঠের পথে বদ্রীনাথ।

যখন পায়ে হেঁটে চলতে হত, তখন এক তীর্থ থেকে অন্য তীর্থে যাবার সংক্ষিপ্ত পথ ছিল। এখনও আছে। বড়কোটের কিছু উত্তরে গাংগানির কাছ থেকে নাকোরি পর্যন্ত একটি পথ আছে। নাকোরি ধরাসু ও উত্তরকাশীর মাঝখানে। তেমনি উত্তরকাশীর উত্তরে মালা থেকে ত্রিযুগী নারায়ণের পথে সোনপ্রয়াগে পৌঁছনো যায়। সোনপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথ খুব কাছে। আবার কেদার-নাথ ও বদ্রীনাথের পথেও এমনি যোগ আছে কুণ্ড থেকে চামোলি পর্যন্ত উখীমঠ ও গোপেশ্বরের উপর দিয়ে। এ পথে এখন মোটর বাস চলছে।

বদ্রীনাথে এখন বাস যাচ্ছে, কেদারনাথের পথে কিছু পথ হাঁটতে হয়। গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথও ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো সর্বত্রই মোটর পৌঁছবে।

স্বাতি বলল : পথের দূরত্ব বোধ হয় তোমার মনে নেই !

বললুম : মাইলের হিসেব মনে রাখা সম্ভব নয়।

পরে বইপত্র ঘেঁটে এই সব হিসাব আমি জেনে নিয়েছিলুম।

ঋষিকেশ থেকে যমুনোত্রী এক শো সাঁইত্রিশ মাইল, আর ঋষিকেশ থেকে গঙ্গোত্রী এক শো পঞ্চান্ন মাইল। যমুনোত্রী থেকে ঋষিকেশে না ফিরে ধরাসুতে বাস বদল করে গঙ্গোত্রী গেলে যমুনোত্রী থেকে গঙ্গোত্রীর দূরত্ব হবে এক শো চল্লিশ মাইল। ঋষিকেশ থেকে কেদারনাথের দূরত্বও এক শো চল্লিশ মাইল, আর বদ্রীনাথ এক শো চুয়াত্তর মাইল দূরে। কেদারনাথ থেকে বদ্রীনাথে যেতে আগে রুদ্রপ্রয়াগে ফিরে আসতে হত। আজকাল তার প্রয়োজন নেই। কুণ্ড থেকেই উখীমঠের পথে চামোলী পৌঁছনো যায়। কুণ্ড কেদারনাথের পথে, আর বদ্রীনাথের পথে চামোলি। অবশ্য মাঝ পথে বাসে ওঠানামার চেয়ে রুদ্রপ্রয়াগে এসে বাস বদল করাই সুবিধে। কিন্তু যাঁরা তুঙ্গনাথে যাবেন, তাঁদের উখীমঠের পথেই যেতে হবে। এই পথেই রুদ্রনাথ ও অনসূয়া দেবী। চামোলি জেলার সদর শহর গোপেশ্বরও এই পথের উপরে।

এখন আর মাইলের হিসেবের খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। যাত্রীরা পথের দূরত্ব জানতে চায় না, তাদের দরকাব সময়ের হিসেব আর ভাড়ার পরিমাণ। রানীখেত থেকে কর্ণপ্রয়াগের দূরত্ব আমরা জানতে চাই নি, শুধু জেনে নিয়েছিলুম যে দুপুর নাগাদ পৌঁছতে পারব। পরে জেনেছিলুম যে রানীখেত থেকে কর্ণপ্রয়াগ ষাট মাইল দূরে। আর ঋষিকেশ থেকে তার দূরত্ব এক শো ন মাইল। তার মানে আমরাই কর্ণপ্রয়াগে আগে পৌঁছব।

দ্বারা হাট থেকে গনাইএর দূরত্ব মাত্র ন মাইল। গল্পে গল্পে আমরা গনাই পৌঁছে গেলুম। বাস এখানে নাকি বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াবে। তাই আমরা নেমে পড়লুম। জায়গাটা বেদখল না হয়ে যায়, তার জন্যে ব্যাগটা তুলে রাখলুম বসবার জায়গায়।

দূরে কোথাও যাবার সাহস ছিল না। কাছাকাছি ঘুরে লোকজনদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলুম অনেক কথা। গনাইকে অনেকে চৌখুটিয়া বলে। রামগঙ্গার তীরে এই ছোট শহর। বাজার পোস্ট অফিস হাসপাতাল আছে, আছে ধর্মশালা।

আর স্টেজিং বাংলো। এখান থেকে ভিকিয়াসাইন নামে একটি জায়গার উপর দিয়ে রামনগর স্টেশন পর্যন্ত মোটর পথ গেছে। কর্ণপ্রয়াগের দিকে লোভা বা গৈরসাইন পর্যন্ত মোটর পথ সম্প্রতি তৈরী হয়েছে। অনেক স্থানে খুব সাবধানে যেতে হয়। লোভার পথ থেকে আবার পুরনো মোটর পথ। এই নতুন পথটুকু অতিক্রম করতে বেশি সময় লাগে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গরম চা খেয়ে আমরা বাসে ফিরে এলুম। আবার যাত্রা শুরু হল।

মাইল সাতেক দূরে পানুয়া খালে আলমোড়া জেলা শেষ হয়ে গেল, শুরু হল চামোলি জেলা। তার পরে মেহেল চৌরা। আরও মাইল পাঁচেক এগিয়ে ধুলার ঘাট। রামগঙ্গা বয়ে গেছে এর খুব কাছ দিয়ে। এর পরে লোভা। যাত্রীদের জিজ্ঞাসা না করলে এ সব নাম জানা যায় না।

লোভা ছাড়বার পরে শুনলুম আদ্‌বদ্রীর নাম। প্রায় সাড়ে বারো মাইল দূরে একটি তীর্থস্থান। নাম শুনেই বোঝা যায় যে এই স্থান আদিবদ্রী বলে চিহ্নিত। তার মানে যে বদ্রীনাথে আমরা চলেছি, তার আগে এই স্থানের মাহাত্ম্য প্রচলিত ছিল। যাত্রীদের কাছেই জানলুম যে এই অঞ্চলে পাঁচটি বদ্রী আছে। যেখানে আমরা চলেছি তার নাম বিশাল বদ্রী। সামনে আদি-বদ্রী। কর্ণপ্রয়াগ থেকে যোশীমঠের দিকে যেতে পিপলকোটি ছাড়িয়ে অনিমঠে বৃদ্ধবদ্রী। তার পরে পাণ্ডুকেশ্বরে যোগবদ্রী। ভবিষ্যবদ্রী ধৌলি নদীর উপত্যকায়। যোশীমঠ থেকে আট মাইল দূরে তপোবন ছাড়িয়ে সুভাইনে।

আমাদের বাস যখন এই আদিবদ্রী এসে পৌঁছল, তখন যাত্রীরা সবাই হুড়মুড় করে নেমে পড়ল। কেন জানি না, অসংখ্য যাত্রীর ভিড় হয়েছিল এইখানে। পথের ধারে আদিবদ্রীর পুরনো মন্দিরে আজ প্রচণ্ড ভিড়। ছোট ছোট দোকান পাট বসেছে। নানা স্থানে মেয়ে পুরুষ এসেছে নানা রঙের জামা কাপড় পরে। ভিড়ের

মধ্যে এগোতে আমরা সাহস পেলুম না। দূর থেকেই প্রণাম করলুম আদিবদ্রীর বদ্রীনাথকে। বাসের যাত্রীরা আরেক বার চেঁচিয়ে উঠল : বদ্রী বিশালকি জয়!

কর্ণপ্রয়াগ এখান থেকে এগারো মাইল দূরে, কিন্তু এক ভদ্রলোক বললেন : পথের ধারে একটু নজর রাখবেন।

কেন বলুন তো ?

এখান থেকে আড়াই মাইল দূরে একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় পুরনো দুর্গ আছে। পথের ধার থেকেই এই পাহাড়টা উঠেছে।

তার পরে এই দুর্গের ইতিহাসও বললেন। এই দুর্গ থেকেই গাড়োয়ালের রাজারা প্রায় সাত শো বছর রাজত্ব করেছিলেন। তার পর পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তাঁদের রাজধানী তুলে নিয়ে যান শ্রীনগরে। দুর্গের নাম ছিল চাঁদপুর দুর্গ। এখন তার ভগ্নাবশেষ আছে।

এই শ্রীনগর কাশ্মীরের শ্রীনগর নয়, এ হল গাড়োয়ালের শ্রীনগর। কেদার-বদ্রীর পথে এই শ্রীনগরের অনেক গুরুত্ব। চারি ধার থেকে চারটি পথ এসে এই শ্রীনগরে মিলেছে। ঋষিকেশ থেকে দেবপ্রয়াগের উপর দিয়ে শ্রীনগরে আসে কেদার-বদ্রীর মূল পথ, কোটদ্বার রেল স্টেশন থেকে পৌড়ির উপর দিয়েও শ্রীনগরে আসে। শ্রীনগর থেকে টেহরির পথ ধরে মসুরি যাওয়া যায়, যাওয়া যায় গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথে। আবার শ্রীনগর থেকে রুদ্র-প্রয়াগ হয়ে কেদারনাথ, আর কর্ণপ্রয়াগ যোশীমঠ হয়ে বদ্রীনাথ। শ্রীনগর ও কীর্তিনগর পাশাপাশি দুটি শহর অলকনন্দার এপারে ওপারে।

এক সময় আমরা চাঁদপুর দুর্গ পেরিয়ে এলুম। তার পরে সিম্‌লি। হঠাৎ এক সময়ে পথের ধারে নদী দেখতে পেয়ে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : এ কোন্ নদী ?

বললুম : পিণ্ডার। পিণ্ডারি গ্লেসিয়ার থেকে বেরিয়ে এই নদী

গরুড় উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বয়ে এসে কর্ণপ্রয়াগে মিলেছে অলকনন্দার সঙ্গে।

বাস থেকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে এই নদী। ঝর্ণার মতো স্বচ্ছ জল অগভীর। পাথুরে বুকের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে, কিন্তু বাসের গর্জনে তার কলস্বর শুনতে পাচ্ছি না।

স্বাতি বলল: এ দিকেও অনেক প্রয়াগ আছে দেখছি।

বললুম: পাঁচটি প্রয়াগের নাম জানি। যোশীমঠ ও বদ্রীনাথের মাঝে বিষ্ণুপ্রয়াগে অলকনন্দার সঙ্গে ধৌলি নদীর সঙ্গম, নিচে নন্দপ্রয়াগে এই অলকনন্দার সঙ্গে মিলেছে নন্দাকিনী, তার নিচেই কর্ণপ্রয়াগ। আরও নিচে মন্দাকিনীর সঙ্গে অলকনন্দার মিলন হয়েছে রুদ্রপ্রয়াগে। আর তারও নিচে দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীব সঙ্গে অলকনন্দার সঙ্গম। এই মিলিত ধারার নামই গঙ্গা। লছমনঝুলায় ঋষিকেশে, হরিদ্বারে তার গঙ্গা নাম।

এখন আমরা কর্ণপ্রয়াগের কাছাকাছি এসে গেছি। খানিকটা ব্যস্ত হয়ে উঠল স্বাতি। বলল: এখানে পড়ে থাকলে চলবে না, এগিয়ে আমাদের যেতেই হবে।

বললুম: নিশ্চয়ই এগোব। লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারলেও চেষ্টার ত্রুটি করব না।

উত্তপ্ত মধ্যাহ্নের দিকে তাকিয়ে স্বাতি হাসল।

২৩

কেউ বলে না দিলেও বুঝলুম যে আমরা কর্ণপ্রয়াগে এসে পৌঁছলুম। আর আশ্চর্য হলুম রাস্তার এক পাশে অসংখ্য বাস সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। সামনে কোনও বাধার জন্যে তারা এগোতে পারছে না বলে মনে হল। এ সমস্ত বাস যে বদ্রীনাথের দিকে চলেছে তাতে সন্দেহ নেই। স্বাতি বলল: তুমি বাসে জায়গা দেখ, আমি মালপত্র নামাচ্ছি।

বললুম: এই বাসের পাশেই দাঁড়িয়ে থেকো।

বাস থেকে নেমে আমি সামনের দিকে ছুটলুম। সমস্ত বাস ভর্তি, তিলার্ধ জায়গা নেই। 'না, জায়গা নেই' ছাড়া অন্য কোনও উত্তর পেলুম না কারও কাছে। শুধু একজন বলল: টিকিট ঘরে গিয়ে খোঁজ করুন।

টিকিট ঘর কোথায়?

সামনেই পথের ধারে দেখতে পাবেন।

আর কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে ছুটে গেলুম সেখানে। কাউণ্টারের লোক বলল: কখানা টিকিট?

বললুম: দুখানা।

লোকটি একটি বাসের নম্বর বলে বলল: চলে যান পিছনে।

বললুম: টিকিট?

টিকিট বাসেই পাবেন।

আবার পিছনে ছুটলুম। আমাদের পুরনো বাসের কাছাকাছি এসে দেখি, স্বাতি মালপত্র নামিয়ে ফেলেছে। আর পিছনের একখানা বাসের দিকে এগোচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়েই বলল: এই বাসে জায়গা আছে।

আমি দেখলুম সেই নম্বর। আশ্চর্য হয়ে বললুম: এ নম্বর তুমি কোথায় পেলে?

স্বাতি হেসে বলল : খুব তাড়াতাড়ি উঠতে হবে বলছে।

মানে ?

এ কথার উত্তর পাবার আগেই সামনে একটা সোরগোল শুনতে পেলুম। পথের অন্য ধারে, একখানা বাস এসে দাঁড়াল উল্টোদিক থেকে, তার পিছনে আর একখানা, তার পরে আরও একখানা। আমাদের সামনের বাসগুলো সব স্টার্ট দিল। হৈ-হৈ রৈ-রৈ রব। যেন একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধতে চলেছে। আমাদের বাসের কণ্ডাক্টর কুলিকে তাড়া দিয়ে বলল : জল্‌দি উঠা।

স্বাতি বলল : হোল্ডলের একটা স্ট্র্যাপ খুলে বেঁধে দিও রেলিঙের সঙ্গে। তা না হলে গড়িয়ে পড়ে যাবে।

মাথায় সুটকেস আর কাঁধে হোল্ডল নিয়ে কুলি তরতর করে উঠে গেল। কণ্ডাক্টর আমাদের তাড়া দিয়ে বলল : উঠিয়েঁ।

কিন্তু ওঠা কি সহজ কাজ! ভিতরেও এত লটবহর যে সে সব ডিঙিয়ে উঠতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। কোন রকমে স্বাতিকে এগিয়ে দিয়ে আমিও উঠে পড়লুম।

আমাদের বাসও স্টার্ট দিল। উপর থেকে কুলি তখনও নামে নি। বললুম : তাড়াতাডি পয়সা বার কর। কুলির পয়সা।

সামনের বাসখানা দাঁড়িয়ে আছে বলে আমাদের বাস এগোতে পারছে না। হঠাৎ জানালা দিয়ে কুলির মুখ দেখতে পেয়ে স্বাতি বলে উঠল : ভাল করে বেঁধে দিয়েছ তো ? এই নাও পয়সা।

আমাদের সামনের কয়েকখানা গাড়ি আটকে আছে দেখে বাসের ড্রাইভার অকথ্য ভাষায় চিৎকার করছে। শেষ পর্যন্ত সবাই এগিয়ে গেলুম। আর খানিকটা এগিয়েই থেমে গেলুম সবাই।

কী হল ?

গেট। গেটে আটকে গেল বাস।

কী একটা কথা বলে ড্রাইভার নেমে পড়ল বাস থেকে।

আগের দু একটা বাসের ড্রাইভারও নেমেছে। পুলিসের সঙ্গে কথা বলছে তারা।

কী হল ?

না। গেট খুলবে না বলছে।

তবে উপায় কী হবে ?

অপেক্ষা করতে হবে।

বলে আমাদের কণ্ডাক্টর নেমে পড়ল। আমিও ব্যাপারটা বুঝবার জন্যে নেমে পড়লুম।

আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে লাইনের সমস্ত বাস অদৃশ্য হয়ে গেছে। গোটা দুই ট্রাকের পিছনে আমরা আটকা পড়েছি। ট্রাকের ড্রাইভারদের গড়িমসির জন্যেই নাকি এমন হল। সময় মতো ওরা চলতে পারে নি।

জিজ্ঞাসাবাদ করে ব্যাপারটা আমি বুঝে ফেললুম। এ দিকে পাহাড়ের রাস্তায় এক দিক থেকে গাড়ি চলে। উপর থেকে গাড়ি আসছে বলে আমবা এতক্ষণ গেটে দাঁড়িয়েছিলুম। এই গেট রক্ষা করে পুলিস। ও ধার থেকে সব গাড়ি এসে পৌঁছবার পর গেট খুলে এ ধারের গাড়িকে উপরে উঠতে দেয়। প্রথম গাড়িতে থাকে লাল নিশান, আর সবুজ নিশান সব শেষের গাড়িতে। সবুজ নিশান ওয়ালা গাড়ি পৌঁছবার পরে অন্য ধারের গাড়ি যাবে। তারও প্রথম গাড়িতে লাল নিশান আর সবুজ নিশান সব শেষের গাড়িতে। সব গাডিতে দু রকমের নিশান আছে। পুলিসের হুকুমে লাল আর সবুজ নিশান লাগানো হয়। আমরা দেরি করেছি বলে আটকে গেছি। সবুজ নিশানওয়ালা গাড়ি এগিয়ে গেছে।

ফিরে আসতেই স্বাতি বলল : কী বুঝলে ?

বললুম : অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। যে বাসগুলো ছেড়ে গেল, তা তের মাইল দূরে নন্দপ্রয়াগে পৌঁছবার পরে

ও ধার থেকে বাস আসবে এ ধারে। তার পরে আমরা রওনা হব।

স্বাতি আর কথা না বলে নিচে নেমে এল। আমি ভেবেছিলুম যে দেরি হবার জন্যে হয়তো দুঃখ করবে। কিন্তু তার বদলে বলল: এসো, কিছু পাওয়া গেলে খেয়ে নেওয়া যাক।

ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের বাসের ড্রাইভার এল আমাদের কাছে। একটু ইতস্তত করে যা বলল তার মানে হল, আমরা পুলিসকে অনুরোধ করলেই সে ছেড়ে দেবে। কথাটা ঠিক বুঝতে না পারলেও আমরা এগিয়ে গেলুম। পুলিসও খানিকটা এগিয়ে এসে বলল: পাহাড়ের রাস্তায় এ রকম কাজ খুব বিপজ্জনক। অনেকে অনেক সময় পয়সার লোভে নিয়ম মানে না বটে, কিন্তু তা উচিত নয়। সে এখানে নতুন এসেছে, নিয়ম কানুন মেনে চলতে সে চেষ্টা করছে।

এর পরে আর কিছু বলা চলে না। তাই জিজ্ঞাসা করলুম: এখানে কি কিছু খাবার পাওয়া যায়?

পুলিস আশ্চর্য হয়ে বলল: এখন!

আশ্চর্য হয়ে আমরাও দেখলুম যে তখন দুপুর দুটো বেজে গেছে, তা খেয়ালই করি নি। তারই কথায় বুঝতে পারলুম যে অনেক আগেই আমাদের ক্ষিধে মরে গেছে।

পুলিস বলল: চা বিস্কুট ছাড়া এখন আর কী পাওয়া যাবে!

স্বাতি আমাকে একটা চায়ের দোকানের সামনে ডেকে আনল। চা খেলুম আর দিশি বিস্কুট, অন্য খাবার খেতে প্রবৃত্তি হল না। কোন ফলমূলও পাওয়া গেল না। তার পরে আমরা পথের ধারে দাঁড়িয়ে কর্ণপ্রয়াগের সঙ্গম দেখলুম—অলকনন্দার সঙ্গে পিণ্ডার গঙ্গার মিলন। সঙ্গমের নিকটে নাকি উমাদেবীর মন্দির আছে। শুনলুম যে মহাভারতের কর্ণ এখানে সূর্যের তপস্যা করেছিলেন। তাই তাঁরই নামে জায়গার নাম হয়েছে কর্ণপ্রয়াগ।

স্বাতি বলল : বাসে জায়গা না পেলে আজ আমাদের এখানেই রাত্রিবাস করতে হত।

কিন্তু রাত্রিবাসের জায়গা কোথায় ?

খোঁজ নিয়ে তা জেনে নিলুম। কর্ণপ্রয়াগে চামোলি জেলার সাবডিভিসনাল শহর। কাজেই থাকবার জায়গার অভাব নেই। পি. ডব্লু ডি.র বাংলো আছে। ধর্মশালা আছে কালিকম্‌লিওয়ালার।

স্বাতি বলল : কালিকম্‌লিওয়ালার নাম শুনেছি অনেকের কাছে, কিন্তু মানুষটা কে জানো ?

বললুম : একজন আশ্চর্য মহাপুরুষ। সারাক্ষণ কালো কম্বল গায়ে দিয়ে থাকতেন বলে নাম হয়েছিল কালিকম্‌লিওয়ালা। আসল নাম বিশুদ্ধানন্দ স্বামী।

পরে জেনেছিলুম যে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক ক্ষেত্র স্থাপন করেন ঋষিকেশে। এখন সেই ক্ষেত্রের নব্বুইটি ধর্মশালা, পঞ্চাশটি সদাব্রত, সত্তরটি পিয়াও, ছটি মন্দির, স্থায়ী ও মরসুমি হাসপাতাল আটটি, পাঁচটি গোশালা, দুটি অনাথ আশ্রম এবং আয়ুর্বেদিক ও সংস্কৃত পাঠশালা একটি। তীর্থের পথে অনেক পুল ও পথ ঘাটও নির্মাণ করে দিয়েছেন। উত্তরাখণ্ডের তীর্থে এসে কালিকম্‌লিওয়ালার নাম শোনেনি এমন যাত্রী নেই।

আরও একটি ক্ষেত্রের নাম শুনলুম আমরা। পাঞ্জাব সিন্ধ ক্ষেত্র। এদেরও ধর্মশালা সদাব্রত আছে ; আছে সংস্কৃত পাঠশালা, হাসপাতাল ও গোশালা। সদাব্রতে সাধু মহাত্মাদের বিনামূল্যে খাবার দেওয়া হয়—ডাল আর রুটি। পিয়াওএ পানীয় জলের ব্যবস্থা। এই সব সদাব্রত আছে বলেই হিমালয়ে এত সাধু মহাত্মা তপস্যায় দিন যাপন করতে পারছেন। জীবনের সামান্য প্রয়োজনের জন্য তাঁদের ভিক্ষা করতে হয় না।

ঘুরে ঘুরে কতটা সময় আমরা অতিবাহিত করেছিলুম জানি না। হঠাৎ আবার হৈ হৈ রব উঠল : গেট আসছে।

মানে লাল নিশানওয়ালা বাস। আমাদের কর্তব্য আমরা জেনে ফেলেছি। আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে লাফিয়ে বাসে উঠে পড়লুম। ড্রাইভারও ছুটে এসে বাসে স্টার্ট দিল, প্রায় এক সঙ্গে গর্জে উঠল সমস্ত বাস ও ট্রাক। এবারে খুব বেশি নয়, অল্প কয়েকখানা গাড়ির পরেই সবুজ নিশান দেখা গেল। আর তা পাশ দিয়ে যাবার আগেই আমরা উর্ধ্বশ্বাসে যাত্রা করলুম।

পাহাড়ের গা বেয়ে যাত্রা। কোন নূতনত্ব বা বৈচিত্র্য নেই। বেলার দিকে তাকিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছিলুম যে আজ আমরা বদ্রীনাথে পৌঁছতে পারব না। বদ্রীনাথ এখান থেকে অনেক দূরে। যোশীমঠের দূরত্বই প্রায় পঞ্চাশ মাইল। সেখানে পৌঁছতে পারব কিনা, সে সম্বন্ধেই অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। অন্ধকার হবার পরে বাস আর চলবে না।

ইতিমধ্যে আমরা অনেক খবর সংগ্রহ করেছি। কর্ণপ্রয়াগ থেকে নন্দপ্রয়াগ তেরো মাইল দূরে। ত্রিশূল শৃঙ্গের পশ্চিমের ঢালু থেকে নন্দাকিনী নদী বেরিয়ে এইখানে মিলেছে অলকনন্দার সঙ্গে। এখানে মন্দির আছে চণ্ডিকা দেবী লক্ষ্মী-নারায়ণ মহাদেব ও গোপালজীর। থাকবার জন্যে ডাক বাংলো ও ফরেস্ট রেস্ট হাউসও আছে।

আগেই জেনেছিলুম যে এখান থেকেও নন্দাদেবীর তীর্থযাত্রা হত। গরুড় উপত্যকায় তালোয়ারি পর্যন্ত পায়ে হাঁটা পথ আছে ঘাট ও থরালির উপর দিয়ে। দূরত্ব তেত্রিশ মাইল। তার পর বাসে চেপে গোয়ালডাম ও গরুড়ের উপর দিয়ে রানীখেত বা আলমোড়ায় আসা যায়। এ পথেও এক দিন হয়তো মোটর চলবে।

নন্দপ্রয়াগ পৌঁছতে আমাদের বেশিক্ষণ সময় লাগল না। গেটের জন্যে অপেক্ষাও করতে হল না। একটুখানি দাঁড়িয়েই আমরা এগিয়ে গেলুম চামোলির দিকে। চামোলি এখান থেকে সাত মাইল দূরে।

চামোলি উত্তরাখণ্ডের একটি জেলা, কিন্তু এর সদর শহর গোপেশ্বর এখান থেকে তিন মাইল দূরে কেদারনাথের পথে। চামোলি থেকে রুদ্রপ্রয়াগের বাসে চাপলে গোপেশ্বরে পৌঁছনো যায়। এই বাসেই উখীমঠ ও কুণ্ডের উপর দিয়ে রুদ্রপ্রয়াগে যায়। এই পথেই তুঙ্গনাথ রুদ্রনাথ ও অনসূয়া দেবী। উখীমঠ থেকে মধ মহেশ্বরেও যাওয়া যায়।

গোপেশ্বরে দেখবার কী আছে তাও জেনে নিয়েছিলুম। একটি প্রাচীন শিব মন্দির আর তার অঙ্গনে একটি লোহার ত্রিশূল। তার দণ্ডের উপরে যে লিপি উৎকীর্ণ ছিল, এখন আর তা পড়া যায় না। দক্ষিণ ভারতের রাওয়াল এই মন্দিরের অধিকারী।

ভেবেছিলুম যে চামোলিতেই আজ আমাদের রাত্রিবাস করতে হবে। তাই থাকবার জায়গার খোঁজ খবরও নিয়েছিলুম। একটি পি. ডব্লু. ডি. রেস্ট হাউস আর একটি প্রশস্ত যাত্রী নিবাস। কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভাল, আমরা আরও এগিয়ে যাবার সুযোগ পেলুম। যাত্রীরা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, পিপলকোটিতেই আজ রাত্রিবাস করতে হবে। পিপলকোটি চামোলি থেকে দশ মাইল দূরে।

মাইল পাঁচেক এগিয়ে যাবার পরে আমরা একটি নদীর পুল পেরোলুম। নদীর নাম শুনলুম বিরেহী গঙ্গা। এই নাম শুনেই অনেক কথা আমার মনে পড়ে গেল। অনেক কথা পড়েছি ভ্রমণ কাহিনীতে। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাতেই আমি হাসলুম।

স্বাতি বলল : জানা নাম বুঝি!

বললুম : হ্যাঁ।

তবে বল না যা জানো।

বললুম : লোকে বলে শিবের চোখের জলে জন্ম হয়েছে এই নদীর।

এত চোখের জল!

বললুম : সতীর মৃত্যুর খবর পেয়ে শিব চোখের জল কিছু কম ফেলেন নি। আর এই যুগে এই নদীই একবার প্রলয় এনেছিল এই অঞ্চলে। গত শতাব্দীর শেষের দিকের এই ঘটনা।

স্বাতি সাগ্রহে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আর আমি সংক্ষেপে সেই ঘটনা তাকে বললুম।

এখান থেকে মাইল দশেক দূরে গোহ্‌লা গ্রামের কাছে পাহাড়ের এক বিরাট ধস্ নেমে নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর জলে ভেসে গিয়েছিল পিছনের দিকটা। প্রায় বছর খানেক পরে হঠাৎ এই বাঁধ ভেঙে প্রচণ্ড বেগে জল নিচের দিকে ছুটল। অলকনন্দায় বন্যা এল সেই জলস্রোতে, ভেসে গেল চামোলি নন্দপ্রয়াগ কর্ণপ্রয়াগ রুদ্রপ্রয়াগ আর শ্রীনগর। এই ভীষণ বন্যার কথা লোকের মুখে মুখে এখনও শোনা যায়।

তার পর ?

বললুম : বিরেহী নদীর পুল থেকে লোকে এখন দশ মাইল হেঁটে গোহলা লেক দেখতে যায়। ৬৪০৩ ফুট উঁচুতে এই লেক নাকি কুমায়ুনের সব চেয়ে বড় লেক, সব চেয়ে সুন্দর। লেকের পিছনেই দেখা যায় বরফাচ্ছন্ন ত্রিশূল শৃঙ্গ। এখন এই লেকের ধারে একটি বোট হাউস আছে, আর নৌকো আছে লেকের জলে ভেসে বেড়াবার জন্যে। বিদেশীরা আসে ট্রাউট মাছের লোভে।

আরও অনেক কথা আমার মনে পড়ে গেল। গোহ্‌লা লেক থেকে একটি ঘন অরণ্যময় পথে আট মাইল দূরে রম্‌নি নামে একটি জায়গায় পৌঁছনো যায়। লোকে বলে এর চেয়ে বন্য বন পৃথিবীতে আর নেই। গরুড় উপত্যকার গোয়ালডাম এই রম্‌নি থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে। অন্য ধারে কুয়ারি তপোবনের পথ। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন এসেছিলেন এই অঞ্চলে। ভ্রমণে তাঁর শখ ছিল, আর এই পার্বত্য অরণ্যের সৌন্দর্য তাঁকে আকর্ষণ করে এনেছিল।

স্বাতি বলল: কুয়ারির নাম শুনেছি, কিন্তু কোন্ দিকে তা জানি নে।

বললুম: যোশীমঠ থেকে লোকে কুয়ারি গিরিপথে যায়। বেশি দূরে নয়, কিন্তু উঁচু ১২৪০০ ফুট। এখান থেকে যে সব অভিযাত্রী দল মাউণ্ট কামেট ও ত্রিশূল অভিযানে গেছেন, তাঁরা পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছেন এই গিরিপথের। মধ্য হিমালয়ের গিরিশ্রেণীর শোভা নাকি আর কোনখান থেকে এত সুন্দর দেখা যায় না। রম্‌নি থেকে কুয়ারির পথেও একটি জায়গা থেকে খুব সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। ওক গাছের অরণ্যের মধ্য দিয়ে উঠতে উঠতে মনে হবে যেন বিলেতের সাসেক্সের পাহাড়। ওপারে ওক পাইন আর রডোডেন-ড্রনের বন। ঘাসে আচ্ছন্ন একটি পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখা যাবে সেই অপরূপ দৃশ্য—চোখের সামনে বিস্তৃত হয়ে আছে তুষারাচ্ছন্ন গিরিশ্রেণী—কেদারনাথ বদ্রীনাথ নীলকণ্ঠ কামেট মালা রতবন গৌরী-পর্বত হাতীপর্বত দ্রুলাগিরি নন্দাঘুন্টি ও ত্রিশূল। একজন অভিযাত্রী বলেছেন যে কুয়ারি গিরিপথ থেকেও এই গিরিশ্রেণী এত সুন্দর দেখা যায় না।

যোশীমঠ থেকেও তপোবন ও কুয়ারি গিরিপথ হয়েও গোহ্‌লা লেকে আসা যায়। বিরেহী নদীর পুল পর্যন্ত এই পথের দূরত্ব একান্ন মাইল। হিমালয়ের এক আশ্চর্য রূপ দেখার অভিজ্ঞতা হয় এই পথে।

স্বাতি বলল: তপোবন কোথায় জানো?

বললুম: শুনেছি ধৌলি উপত্যকায়। ধৌলি গঙ্গা একটি নদীর নাম। এই নদী বিষ্ণুপ্রয়াগে এসে অলকনন্দায় মিলেছে। যোশী-মঠ থেকে যখন হেঁটে বদ্রীনাথে যেতে হত, তখন যোশীমঠ থেকে প্রায় হাজার দেড়েক ফুট নিচে এই বিষ্ণুপ্রয়াগে নামতে হত, তার পর পাণ্ডুকেশ্বরের পথে বদ্রীনাথ। যাত্রীদের যত কষ্ট হত, আনন্দও হত তত।

কষ্টের আনন্দ!

কতকটা তাই। আমরা যে বাসে বসে পথ চলেছি, কতটুকু আনন্দ পাচ্ছি বল!

মনে হচ্ছে, পিপলকোটি পৌঁছতে আর দেরি নেই। রাতে কোথায় থাকব আমরা?

বললুম: জায়গার অভাব হবে না। যাত্রীবাহী বাস যেখানেই থামবে, সেখানেই থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে।

আকাশ ঘিরে তখন অন্ধকার নেমেছে। আমাদের বাস এসে দাঁড়াল বাজারের কাছে। দোকান পাট তখন বিজলীর আলোয় সরগরম। কণ্ডাক্টর আমাদের জানিয়ে দিল যে ভোর ছটায় যাত্রা, যেখানেই থাকি সময় মতো বাসে এসে উঠতে হবে।

কিন্তু থাকব কোথায়?

পাশের একটা টিলার মতো পাহাড় দেখিয়ে বলল: ওর উপরে চমৎকার থাকবার জায়গা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে স্বাতি বলল: এখনও তো যাবার সময় হয় নি, ওর উপরে উঠলে খাবার জন্যে আর নামতে পারব না।

কণ্ডাক্টর আমাদের বাঙলা কথা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল, বলল: নামবেন কেন! দোকানে বলে গেলে ওরাই পৌঁছে দেবে।

সত্যি!

বলেই সে এগিয়ে গিয়ে একটা দোকানে খাবার অর্ডার দিয়ে দিল। রাত আটটায় খাবার পৌঁছে দেবে। আমরা একটা কুলির পিঠে মালপত্র দিয়ে উপরে উঠে এলুম।

পাহাড়ের মাথায় চমৎকার ব্যবস্থা। অনেকগুলি ঘর, বাথরুম। অনেক পরিবার পাশাপাশি ঘরে থাকতে পারে। ফুলের বাগান আছে। ক্যাকটাসের একটি সুন্দর ফুলও দেখলুম টবে। পি. ডব্লু.

ডি.র ডাক বাংলো না টেম্প্‌ল্ কমিটির রেস্ট হাউস, তা বুঝতে পারলুম না। কিন্তু ব্যবস্থা পছন্দ হল। প্রথমেই আমরা স্নান করে সারা দিনের ক্লান্তি দূর করলুম।

স্বাতি বলল : আবহাওয়াটি ভারি সুন্দর, তাই না!

বললুম : পাহাড় খুব উঁচু বলে মনে হচ্ছে না।

পরে জেনেছিলুম যে পিপলকোটির উচ্চতা মাত্র ৪০০০ ফুট। যোশীমঠ এখান থেকে উনিশ মাইল দূরে, তার উচ্চতা ৬১৫০ ফুট। সেখানে যে এ সময়ে শীতে কাঁপতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

২৪

ভোর ছটার আগেই আমরা তৈরি হয়ে নিচে এলুম। তখনও বাসের ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টরের দেখা নেই। জানতে পারলুম যে বাস ছটা পঞ্চাশ মিনিটে ছাড়বে। পিপলকোটির এইটেই প্রথম গেট।

ভালই হল।

বলে স্বাতি আমাকে চায়ের দোকানে ডেকে আনল। আমরা চা খেয়ে নিলুম। আর এখানেই জানতে পারলুম অনেক কথা। গরম কালের গেট টাইম টেবল চালু হয়েছে ১লা মে থেকে। ঋষিকেশের প্রথম বাস লছমনঝুলায় ছটার গেট ধরে। দু জায়গায় গেটের জন্মে দাঁড়িয়ে দেবপ্রয়াগে আসে পৌনে নটায়। দূরত্ব একচল্লিশ মাইল। পনর মিনিট পরে দেবপ্রয়াগ ছেড়ে তেইশ মাইল দূরে শ্রীনগরে আসে দশটা দশে। বাস এখানে আধ ঘণ্টা দাঁড়ায়। তার পর আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রুদ্রপ্রয়াগে আসে দুটো দশে, আর দশ মিনিট পর ছেড়ে মাঝ পথে একবার দাঁড়িয়ে কর্ণপ্রয়াগে পৌঁছয় পৌনে দুটোয়। গেট খোলে পাঁচ মিনিট পরে। রানীখেত থেকে ঠিক এই সময়ে আমরা এসে পৌঁছেছিলুম। কিন্তু কোন থ্রু বাস ধরতে পারিনি। একখানা লোকাল বাসে যে জায়গা পেয়েছি, তা এইখানেই জানতে পারলুম। আমাদের এ বাস হয়তো যোশীমঠ পর্যন্তই যাবে। তার পরে অন্য বাস ধরতে হবে।

কাল কর্ণপ্রয়াগে আমরা পৌনে তিনটের গেট পেয়ে সোয়া ছটায় এখানে এসে পৌঁছেছি। ছটা পঞ্চাশে এ বাস ছাড়বে। কর্ণ-প্রয়াগ থেকে সময় মতো ছাড়লেও আমরা বদ্রীনাথে পৌঁছতে পারতুম না। আমাদের আগের বাসগুলি ছটায় পৌঁছেছে যোশী-মঠে। তারা সকাল ছটা দশে ছেড়ে বদ্রীনাথে পৌঁছবে আটটা চল্লিশ মিনিটে।

আমাদের বাসের কথাও আমরা জেনে নিলুম। এ বাস বেলা-কুচিতে দশ মিনিট দাঁড়াবে, আব হেলাং ছুঁয়ে যোশীমঠ পোঁছবে সাড়ে আটটায়। এই বাসই যদি বদ্রীনাথ যায় তো পনর মিনিট পরে ছেড়ে বেলা এগারটায় বদ্রীনাথে পোঁছবে।

আর একটি কথা শুনে আশ্চর্য হলুম। সব জায়গায় বাসের ক্রসিং হয় না। লছমনঝুলা থেকে প্রথম গেটে বেরোলে আট জায়গায় ক্রসিং আর ছ জায়গায় ক্রসিং হয় দ্বিতীয় গেট ধরলে।

রাতের কুলিকে আমাদের বলাই ছিল। সময় মতো এসে সে আমাদের মালপত্র বাসেব মাথায় তুলে দিয়ে পয়সা নিয়ে গেছে। চা খেয়ে আমরাও এখন যাত্রার জন্য তৈরি। যাত্রীরাও এসে গেছে। বেশির ভাগই আসছে কেদারনাথ থেকে। কালকের যাত্রীদের আর দেখতে পাচ্ছি না।

শুনলুম যে এখানেও আছে কালিকম্‌লিওয়ালার ধর্মশালা, আর দোকানেও থাকবার ব্যবস্থা মন্দ নয়। খেয়ে দেয়ে দোকানের বড় ঘরে চাটাইএর উপরেই অনেক যাত্রী ঘুমিয়ে পড়ে। সামান্য পয়সা দিতে হয় দোকানদারকে।

এই বারে বাসের হর্ন শুনে আমরা লাফিয়ে বাসের ভিতর উঠে পড়লুম। যাত্রীরা খোঁজ খবর নিচ্ছে, এ বাস বদ্রীনাথ অবধি যাবে কিনা। জানতে চাইছে অনেকে। কণ্ডাক্টরের উত্তর শুনে মনে হল যে যাত্রী হলেই যাবে। নিশ্চিত ভাবে কিছুই বলছে না। আমরা কতকটা নিরুপায়। যোশীমঠে পোঁছেই বদ্রীনাথের বাস পাওয়া যাবে কিনা জানি না। পনর মিনিট মাত্র সময়। এই বাসে গেলে নিশ্চিন্ত। তা না হলে আবার 'নামা-ওঠা। হয়তো দেরি হয়ে যাবে, বেলা এগারোটায় বদ্রীনাথে পোঁছতে পারব না।

বাস ছাড়ল। বেলাকুচিতে কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়িয়ে আবার ছুটল যোশীমঠের দিকে। যাত্রীদের কাছে জানতে পারলুম যে বেলাকুচি থেকে মাইল ছয়েক দূরে ত্রিবেণী নামে একটি জায়গা

আছে। সেখানে অলকনন্দার উপরে পুল আছে একটা। সেই পুল পেরিয়ে ন মাইল হেঁটে গেলে কল্পেশ্বরের মন্দির। কল্পেশ্বর হলেন পঞ্চম কেদার। যেমন পঞ্চ বদ্রী, তেমনি পঞ্চ কেদার। কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ মধ মহেশ্বর ও রুদ্রনাথ অন্য দিকে, এ দিকে শুধু কল্পেশ্বর। দুর্গম উপত্যকায় এই মন্দিরটি প্রাকৃতিক শোভার জন্যে বিখ্যাত। কিন্তু যাতায়াতের পথে নয় বলেই অনেকের কাছে অপরিচিত।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আমরা যোশীমঠে পৌঁছে গেলুম। স্বাতি বলল: এরা যাবে কিনা, বুঝে নেওয়া দরকার।

বললুম: বলছে তো যাবে।

কিন্তু কখন যাবে তা তো বলছে না!

বাস থেকে নেমে চারি দিকে আমরা চেয়ে দেখলুম। না, আর কোনও পথ দেখতে পাচ্ছি না। এই বাজার এলাকায় শুধু আমাদের বাসখানিই দাঁড়িয়ে আছে। আর দু একজন করে যাত্রী আসছে। দূরে অন্য কোনখানে আরও বাস আছে কিনা জানি না। এগিয়ে যাবার সাহসও হল না। কণ্ডাক্টরের এক কথা—এই বাসই বদ্রীনাথে যাবে।

কিন্তু গেটের সময় পেরিয়ে গেল, বাস ছাড়ল না। খবর নিয়ে জানলুম যে পরের গেট অনেক দেরিতে। সেই গেটেই আমাদের যেতে হবে। বদ্রীনাথে পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে।

এই বারে কণ্ডাক্টর এসে বলল: আপনারা শহরটা দেখে নিন, আর সময় মতো খেয়েও নেবেন।

স্বাতি বিরক্ত ভাবে বলল: বুঝেছি।

আমি বললুম: ভালই হল। যোশীমঠ দেখার তো কথা ছিল না। ভাগ্যের গুণেই এ জায়গটা দেখা হচ্ছে, এ আমাদের উপরি লাভ।

কিন্তু যাবে কোথায়?

খোঁজ খবর নিতে সময় লাগল না। এখানে প্রাচীন মন্দির আছে

কয়েকটি—নরসিংহ বাসুদেব ও নবদুর্গার মন্দির। সাত ফুট উঁচু, কালো পাথরের বিষ্ণুর মূর্তি নাকি অপরূপ সুন্দর।

শঙ্করাচার্যের যোশীমঠের কথা আমি জানতুম। জিজ্ঞাসা করলুম। সে কোথায়?

জ্যোতেশ্বর ঐ পাহাড়ের মাথায়। শহর থেকে আধ মাইল দূরে।

দেখলুম সেই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু সেখানে যাবার কথা ভাবতে পারলুম না।

চামোলি জেলায় যোশীমঠও একটি সাবডিভিসনাল শহর। সব কিছুই আছে। কালিকম্‌লিওয়ালার ধর্মশালা, পি. ডব্লু. ডি. রেস্ট হাউস, টেম্পল্‌ কমিটির গোটা তিনেক রেস্ট হাউস আছে যাত্রীদের জন্যে। একটি বেদ-বেদাঙ্গ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ও আছে। শীতের সময় বদ্রীনাথের পূজা হয় এইখানে।

স্বাতি বলল: বাজারের পথে দাঁড়িয়ে থেকে তো লাভ নেই, চল একটু বেড়িয়ে আসি।

কোথায় যাবে?

মন্দিরেই যাওয়া যাক।

বলে মন্দিরে যাবার পথ সে জেনে নিল। বাজার থেকেই একটা পথ পিছনের দিকে গেছে, তার পরে খানিকটা নেমে যেতে হয়। আমরা সেই পথে এগিয়ে পাহাড়ের অন্য ধারে এসে পৌঁছলুম। তার পরে দেখলুম সেই সুন্দর দৃশ্য। চোখের সামনে বরফের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। কোনও বিখ্যাত গিরিশৃঙ্গ যে নয় তা বুঝতেই পারছি। শীতের সময় বরফে আচ্ছন্ন হয়েছিল ঐ চূড়াটি, এখনও বরফে ঢেকে আছে। ধীরে ধীরে ঐ বরফ হয়তো গলে যাবে। কিন্তু এখন এর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হলুম।

খানিকটা এগিয়ে একটা ছোট রেস্ট হাউসও চোখে পড়ল। ভারি সুন্দর পরিবেশ। স্বাতি বলল: এ রকম জায়গায় কিছু দিন থাকতে ইচ্ছা করে।

আমি হেসে বললুম: মালপত্র নিয়ে আসব?

স্বাতি কোন উত্তর না দিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। দূরে অনেকটা নিচে আমরা মন্দিরের চূড়ো দেখতে পাচ্ছি। যেতে আসতে অনেক সময় লাগবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ দিকের লোক বলে, খুব কাছে।

মন্দিরে যাবার সাহস আমাদের হল না। আমরা ফিরে এলুম। তার পরে বাজারের রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে একটা হোটেলে খেতে বসলুম। এত আগে খাবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বদ্রীনাথে কখন পৌঁছব জানি নে বলেই অসময়ে খেয়ে নিলুম। তার পরে ফিরে এলুম বাসের কাছে।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে আমাদের ভাল লাগছিল না। তাই বিশ্রামের জন্যে বাসে উঠে বসলুম। ভাত খেয়ে একটু ঘুম ঘুম ভাব এসেছিল। স্বাতি বলল: ঘুমিয়ে নাও। বাস ছাড়লেই ঘুম ভেঙে যাবে।

জানি না, কতক্ষণ আমি ঘুমিয়েছিলুম। যাত্রীদের হৈচৈএ ঘুম ভেঙে গেল। স্বাতি জেগেই ছিল, আমাকে চমকে উঠতে দেখে হেসে ফেলল।

আমি কিছুটা লজ্জা পেয়ে সোজা হয়ে বসলুম।

স্বাতি বলল: জানো, এই অঞ্চলের সব চেয়ে সুন্দর জায়গায় এখান থেকেই যেতে হয়।

কোন্ জায়গায়?

ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স।

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম: জানি।

জানো?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: সে যোশীমঠ থেকে নয়। বদ্রীনাথের পথে গোবিন্দ ঘাট নামে একটা জায়গায় বাস থেকে নামতে হয়। এর এক মাইল

পরেই পাণ্ডুকেশ্বর। বিষ্ণুপ্রয়াগে ধৌলি নদী ও অলকনন্দার সঙ্গম প্রায় দেড় হাজার ফুট নিচে, যোশীমঠ থেকে ছ মাইল দূরে। সেখান থেকে পাঁচ মাইল এগিয়ে গোবিন্দ ঘাট। গোবিন্দ ঘাট শিখদের কাছে তীর্থস্থান। একটি সুন্দর গুরুদ্বার আছে এখানে। এই গুরুদ্বারে রাত্রিবাস করে শিখ যাত্রীরা হেমকুণ্ড লোকপালে যায়। অলকনন্দার উপরে একটি ঝোলানো পুল পেরোতে হয় এইখানে।

আমাদের বাস তখন বদ্রীনাথের পথে চলতে শুরু করেছে।

স্বাতি বলল : আমার মনে হয়, এ দিকে এলে হাতে প্রচুর সময় নিয়ে আসতে হয়।

হেসে বললুম : সারা জীবন হিমালয়ে কাটালেও হিমালয় দেখা শেষ হয় না।

তাই বলে কি কিছুই দেখব না!

সব কিছু দেখবার চেষ্টা করব না।

স্বাতি বলল : আর তর্ক নয়, এই বারে গোবিন্দ ঘাটের পরের কথা বল।

বললুম : অলকনন্দার পুল পেরিয়ে পায়ে হাঁটার একটি পথ ঘাংগারিয়া পর্যন্ত গেছে। গোবিন্দ ঘাট থেকে ছ মাইল দূরে ভ্যুন্দর হল এই পথের শেষ গ্রাম। ওক উইলো চেস্টনাট আর রডোডেনড্রন গাছের অরণ্যময় এই গ্রামে শীতের সময় বাস করা সম্ভব নয়। অগস্ট মাসেই লোকেরা নিচে নেমে আসে। ঘাংগারিয়া এখান থেকে তিন মাইল দূরে। এর উচ্চতা হল দশ হাজার ফুট। আর এর পর আর কোনও গাছ দেখা যায় না। অল্প দূরে একটি সুন্দর ঝর্ণা আছে, আর একটি ছোট্ট পাহাড়ী নদীও বয়ে গেছে। রাত্রি-বাসের জন্যে একটি ফরেস্ট রেস্ট হাউস ও একটি ধর্মশালা আছে এইখানে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স ?

বললুম : ঘাংগারিয়া থেকে ছু দিকে দুটো পথ গেছে। পূর্ব

দিকে আড়াই মাইল দূরে হেমকুণ্ড লোকপাল, আর উত্তরে তিন মাইল দূরে ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স।

তার পরে এই দুটি জায়গার কথাও আমি সংক্ষেপে বললুম। ১৪২০০ ফুট উঁচুতে হেমকুণ্ড লোকপাল হল একটি জলাশয়, তার চারি ধারে বরফের পাহাড়। শিখদের এটি পরম তীর্থ। তাদের গুরুদ্বার ও ধর্মশালা আছে। কিন্তু এই জায়গাটি তারা আবিষ্কার করেছে ১৯৩৬ সালে। প্রবাদ আছে যে দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ তার পূর্বজন্মে এইখানে তপস্যা করে ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছিলেন পরজন্মে খাল্‌সা পন্থা প্রবর্তনের। ব্যাপারটা অভাবনীয় বলে শুনেছি। এক ভক্ত এই তপস্যার স্থানের বর্ণনা পড়েছিলেন। তিনি এই অঞ্চলে বেড়াতে এসে সেই বর্ণনার সঙ্গে মিল দেখে এ কথা প্রচার করলেন। তার পর থেকেই হেমকুণ্ড লোকপাল শিখদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এর অনেক আগে থেকেই এখানে একটি ছোট মন্দির আছে—লক্ষ্মণজীর মন্দির। জন্মাষ্টমীর সময় এখানে একটি মেলা হয়। শুধু স্থানীয় লোক নয়। ধৌলি উপত্যকা থেকেও ভোটিয়া পুরুষ ও মেয়েরা আসে ভ্যুন্দর গিরিপথ অতিক্রম করে। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে এই গিরিপথ ১৬৭০০ ফুট উঁচু। এখানে ভ্যুন্দর উপত্যকা, আর ওপারে ধৌলি উপত্যকা। মাঝখানে ভ্যুন্দর কান্তা পান। ধৌলি উপত্যকায় নিতি গ্রাম। গ্রীষ্মকালে ভোটিয়াদের বাস এই-খানে। তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য এক সময় প্রসিদ্ধ ছিল এই গ্রামের অধিবাসীরা। যোশীমঠ থেকে ধৌলি নদীর উপত্যকা ধরে তেতাল্লিশ মাইল দূরে এই গ্রামের উপর দিয়ে এক সময় তিব্বতে যাবার পথ ছিল। নিতি গিরিপথ অতিক্রম করে তিব্বতে যাবার পথ এখনও আছে, কিন্তু যাত্রীদের সেখানে যাবার অধিকার নেই। বদ্রীনাথ থেকেও মানা গ্রামের উপর দিয়ে মানা গিরিপথ অতিক্রম করেও যাত্রীরা তিব্বতে যেত। আলমোড়ার মতো এ দিক দিয়েও বহু তীর্থযাত্রী একদা মানস সরোবর ও কৈলাসে গেছে।

বারো হাজার ফুট উঁচু এই ভ্যুন্দর উপত্যকার সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছিলেন কামেট অভিযাত্রী দল। ১৯৩১ সালে এই অভিযানের নেতা ছিলেন এফ্. এস্. স্মাইজ। তাঁর দলবল এই উপত্যকার শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। একজন বলেছিলেন যে হিমালয়ে অবসর যাপনের এমন চমৎকার জায়গা আর নেই। হিমালয়ের একই জায়গায় যদি নদী ও তৃণভূমি আবার পাথর ও বরফ দেখতে হয়!তো এই উপত্যকাতেই আসতে হবে। ছ বছর পরে দলের নেতা স্মাইজ সাহেব আবার এসেছিলেন। এডিনবরার বটানিকেল গার্ডেনের জন্য সংগ্রহ করেছিলেন দু শো পঞ্চাশ জাতের ফুল বীজ ও মূল। 'দি ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স' নামে একখানি বইও লিখেছিলেন। সেই থেকে এই উপত্যকার নাম হয়েছে ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স। স্থানীয় লোকেরা শুনেছি এই নাম জানে না। তাদের কেউ বলে বম্নি-ধার, আর কেউ বলে কুন্দালিয়া-সাইন। ইচ্ছা করলে আমরা নন্দন কানন বলতে পারি।

এই সুন্দর উপত্যকার সঙ্গে আরও একটি নাম জড়িয়ে আছে। স্মাইজ সাহেবের দু বছর পরে লণ্ডনের কিউ গার্ডেন থেকে এক মহিলা লেডি জোয়ান লেগে এসেছিলেন ফুল বীজ ও বাল্ব সংগ্রহ করতে। আনন্দ করে ফুল সংগ্রহ করতে করতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারার জন্যে তিনি নিচে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সমাধিও ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

কিন্তু এই ফুল দেখবার একটা সময় আছে। জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে অগস্ট মাস পর্যন্ত সময় হল প্রশস্ত। শীতের পরে বরফ গলবার পর থেকে ফুলের মরশুমের শুরু। বম্নি-ধার থেকে ছ মাইল দূরে একটা গ্লেসিয়ার থেকে জন্ম হয়েছে ভ্যুন্দর নদীর। শীতে জমে যায়, আর বইতে শুরু করে গ্রীষ্মে। গ্রীষ্মের প্রকোপ যত বাড়ে, ততই সুন্দর হয় এই উপত্যকা।

এক সময় আমরা গোবিন্দ ঘাট পেরিয়ে এলুম। তার পরে পাণ্ডুকেশ্বর। যোশীমঠের মতোই এর উচ্চতা।

স্বাতি বলল : পাণ্ডু রাজার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে নাকি?

বললুম : পাণ্ডবদের নামেই নাকি এর নাম হয়েছে।

তাঁরা এখানে কী করেছিলেন?

এই তো মহাপ্রস্থানের পথ। হিমালয়ের অনেক অঞ্চলে তাঁদের নাম জড়িয়ে আছে।

পাণ্ডুকেশ্বরে দুটি প্রাচীন মন্দির আছে। লোকে বলে মন্দির দুটি পাণ্ডবদেরই তৈরি। একটিতে আছেন যোগবদ্রী। রাত্রিবাসের জন্যে এখানে ধর্মশালা আছে, কালিকম্‌লিওয়ালার। টেম্পল্ কমিটিরও ধর্মশালা আছে, আর পি. ডব্লু. ডি.র ডাক বাংলো। কিন্তু এ সব ছোট ছোট জায়গার আদর আর নেই। আগের মত পায়ে হেঁটে চলে না বদ্রীনাথের যাত্রীরা, বাসে চেপেই পেরিয়ে যায়। কিছু দেখতে পায় না, জিজ্ঞাসাবাদ না করলে কিছু জানতেও পারে না। অদূর ভবিষ্যতে এ সব জায়গার নাম দূরের যাত্রীদের কাছে কোন অর্থই হয়তো বহন করবে না।

স্বাতি বলল : তোমার মন হঠাৎ অপ্রসন্ন হল কেন?

বললুম : কিছু দিন আগেও মানুষ এই পথে হাঁটত বলে আমরা এ সব জায়গার নাম ধাম জানি। কিন্তু আমাদের পরে যারা আসবে, তারা জানবেও না যে এই পথে এক দিন হাঁটতে হত তখন কি তারা মনে রাখবে এই সব জায়গার নাম?

স্বাতি এ কথার উত্তর দিতে পারল না।

২৫

আমাদের বাস এখন ক্রমাগত উপরে উঠছে। যোশীমঠ থেকে চার হাজার ফুট উপরে উঠলে বদ্রীনাথ। যখন পায়ে হাঁটা পথ ছিল, তখন উনিশ মাইল হাঁটতে হত। এখন মোটরে সাতাশ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়। হনুমান চটি আট হাজার ফুট উঁচুতে। তার পরে আর কোনও চটি নেই। হনুমান চটিতেও এখন আর দাঁড়াবার দরকার নেই। যাত্রীরা এখন প্রসন্ন মনে কথাবার্তা বলছেন। আর কোন চিন্তা ভাবনা নেই। এবারে আমরা বদ্রীনাথে গিয়েই নামব।

এক সময় স্বাতি বলল : পাহাড়ে বেড়াতে এসে যে আমরা তীর্থযাত্রী হয়ে যাব, তা ভাবতে পারি নি।

বললুম : তীর্থদর্শন ভাগ্যে হয়।

ভাগ্যে তুমি বিশ্বাস কর ?

বিশ্বাস করি বলতে পারলুম না, স্বাতি কুসংস্কার বলবে। অথচ মনের মধ্যে এমন একটা বিশ্বাস গভীর হয়ে আছে যে বিশ্বাস করি না বলাও সম্ভব নয়। তাই বললুম : জোর করে পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া যায়, কিন্তু তীর্থদর্শন হয় না। কখনও পথে বাধা আসে, কখনও মন্দিরের দ্বার বন্ধ হয়ে যায়।

স্বাতি বলল : তুমি কি ভাবছ, বদ্রীনাথে আমরা পৌঁছতে পারব না !

বললুম : সে রকম ভাববার কোন কারণ নেই।

তবে কি মন্দিরের দ্বার আমরা খোলা পাব না !

তাও সম্ভব নয়।

তবে ?

হিমালয়ের অনেক যাত্রীর কাছে নানা রকমের গল্প শুনেছি।

অলৌকিক মনে হয়েছে সেই সব গল্প। কিন্তু সত্য ঘটনা বলে অবিশ্বাস করতে পারি নি।

স্বাতি নিঃশব্দে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বললুম : এক কেদার যাত্রীর কথা জানি। শক্ত সমর্থ স্বাস্থ্যবান পুরুষ সঙ্গী এক বন্ধু। কেদারনাথের পথে পায়ে হেঁটে চলেছেন। ঠিক কোন্ জায়গায় মনে নেই, পথের ধারে একটি গুহার মধ্যে ধুনির আগুনের ধোঁয়া দেখে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। এক সাধু সেখানে তপস্যারত। কিন্তু মৌনী তিনি। পায়ের শব্দে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন, তার পরে মাটিতে একটা আঁচড় কাটলেন। দু জনেই আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে সাধু তাঁদের ফিরে যেতে বলছেন।

কেন?

সে কথা তিনি বললেন না। দু তিনবার জিজ্ঞাসা করে কোন উত্তর না পেয়ে দুই বন্ধু বেরিয়ে এলেন। বললেন, পাগল। তার পরে এগিয়ে চললেন।

তার পর?

বললেন : বিশ্বাস করবে না সেই কথা।

করব।

ভদ্রলোকের সঙ্গীর নিঃশ্বাসের কষ্ট হতে লাগল, তার পরে বুকে একটা ব্যথা। বাঁ হাতে সেই ব্যথা শিরশির করে উঠল।

চোখে কৌতূহল নিয়ে স্বাতি বলল : করোনারি নাকি!

বললুম : ঠিক তাই। চেষ্টা করেও তাঁরা এগোতে পারেন নি, অনেক কষ্টে ফিরে এসেছিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছিলেন, অল্পের ওপর দিয়ে গেছে।

সেই স্বাস্থ্যবান বন্ধুর কী হল?

কেদারনাথে যাবার নাম আর করেন না।

ভয়!

সে কথাও মানেন না।

বাসের যাত্রীরা হঠাৎ উচ্চস্বরে চীৎকার করে উঠলেন: বদ্রী-বিশাল কি জয়!

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে স্বাতি বলল: ব্যাপার কী!

আমি সামনে একটি ছোট লোকালয় দেখতে পেলুম। তাই আশ্চর্য হয়ে তাকালুম একজন যাত্রীর দিকে। তিনি বললেন: হনুমান চটি।

তার মানে, এর পরেই বদ্রীবিশাল।

কিন্তু একি! গোঁ গোঁ করে বাস থামছে কেন! এই লোকালয় পেরোবার আগেই বাস থেমে গেল। মনে হল, কারও নির্দেশে এই বাস থামল।

ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বাসের ড্রাইভার নেমে পড়ল, নামল কণ্ডাক্টারও। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে কয়েকজন যাত্রীও নেমে পড়লেন। একটা আতঙ্কের ভাব সমস্ত যাত্রীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেল। স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল: কী হল?

আমি খবর নিয়ে জানলুম, বাস আর এগোবে না।

কেন?

সামনে পাহাড় থেকে ধ্বস নেমে পথ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কী সর্বনাশ!

কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ঘটনা জানাজানি হয়ে গেল। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের লোক আমাদের বাস আটকেছে। আমাদের আগে যেসব বাস গেছে, তারা আটকে আছে কয়েক মাইল দূরে। ও ধার থেকে বদ্রীনাথের বাসও এ ধারে আসতে পারে নি। মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে আছে দু ধারের বাস।

স্বাতি ব্যাকুল ভাবে বলল: তাহলে কি এখান থেকেই আমাদের ফিরতে হবে!

এ প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া গেল, ফিরতে হবে না। ব্রিগেডিয়ার

সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে পথ মেরামত করছেন। তাঁর গাড়িও আটকে আছে।

মানে, পথ মেরামত না হওয়া পর্যন্ত এ ভাবেই সব গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে। এগোবার পথ নেই, পিছোতেও পারবে না। যাত্রীদের কথা অবশ্য আলাদা। তাঁরা নিজেদের মালপত্র নিজে বইতে সক্ষম হলে পায়ে হেঁটে এগোতে পারেন।

একটু আগেই যাঁরা উৎফুল্ল মনে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন বদ্রী-বিশাল কি জয়, তাঁরাই সবার আগে পথের ধারে বসে পড়লেন। চিন্তাক্লিষ্ট তাঁদের মন। কিন্তু স্বাতি প্রসন্ন মনে বলল: তুমি ঠিকই বলেছ, ভাগ্যে থাকলেই তীর্থদর্শন হয়।

বলে সেও বাস থেকে নেমে পড়ল।

আমি তাকে অনুসরণ করে বললুম: এখন কী করবে?

স্বাতি বলল: এসো, এই জায়গাটার সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করি।

বলে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। সময় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছি আমরা। পথ মেরামত হবে, বদ্রীনাথের বাস এদিকে আসবে, তার পরে আমরা রওনা হব। সেও ভাগ্যের কথা। কাজেই এখন আমাদের কোনও উদ্বেগ নেই, তাড়াও নেই কোনও। বেশ লাগছে হেঁটে এগিয়ে যেতে। মধ্যাহ্নের রৌদ্র ঝলমল করছে চারি দিকে, কিন্তু উত্তাপ নেই। স্নিগ্ধ বাতাসে শরীর ও মন জুড়িয়ে যাচ্ছে।

স্বাতি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: একটা নদী দেখতে পাচ্ছ?

দেখতে পেয়েছি। পথের ডান ধারে পাহাড়। আর বাঁয়ে নিচে দিয়ে একটি ছোট নদী কলস্বরে বয়ে যাচ্ছে। পরে জেনেছিলুম, এই নদীর নাম কাঞ্চন গঙ্গা। নদীর ধারে দু একটি ঝাউগাছ, আর ওপারেও পাথরের পাহাড়। পিছনে বরফের পাহাড় সম্পূর্ণ আড়াল করতে পারে নি।

স্বাতি তার ক্যামেরা বার করল। বলল : এই পথে দ্বিতীয় বার বরফ দেখতে পেয়েছি। যোশীমঠে ঠিক মতো তুলতে পেরেছি কিনা জানি না। এখানেও একটা ছবি নিয়ে রাখি।

বলে পথের নিচে খানিকটা নেমে গিয়ে ছবি তুলল।

দেখতে দেখতেই সূর্য পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল। ছায়া পড়ল পথের উপরে। কিন্তু ওধার থেকে কোন গাড়ি আসার লক্ষণ দেখা গেল না। ফেরার পরে দেখলুম যে আমরা একাধিক বাসের যাত্রী আটকা পড়েছি। বাসের মুখ ঘুরিয়ে যোশীমঠে ফেরাও বোধ হয় সম্ভব নয়। স্বাতি কতকটা উদ্বিগ্ন স্বরে বলল : এসো, রাতে থাকবার মতো একটা জায়গা খুঁজে দেখি।

দূরে যেতে হল না। যেখানে বাস দাঁড়িয়েছে সেখানেই দেখলুম একটি পরিত্যক্ত ধর্মশালা। একটি মহাবীরের মন্দির ও কালিকম্‌লিওয়ালার দুটি ধর্মশালা আছে এখানে। একটা চায়ের দোকানে বসেই এই খবর পাওয়া গেল। চায়ের সঙ্গে আমরা পকৌড়াও খেলুম। তার পরে গেলুম ধর্মশালা দেখতে। দোতলা বাড়ি, কিন্তু দরজা জানালা নেই। আর অব্যবহারের জন্যে মেঝের উপরে অনেক আবর্জনা জমে আছে। স্বাতি বলল : এই বেলা পছন্দ মতো একটা জায়গা আমরা পরিষ্কার করে রাখি।

কিন্তু পরিষ্কার করবে কী করে!

এসো না।

বলে স্বাতি আমাকে চায়ের দোকানে টেনে আনল। আর দোকানদারের কাছেই চাইল একটা ঝাঁটা। ঝাঁটা পাওয়া গেল। স্বাতি তার আঁচল কোমরে জড়িয়ে বলল : তুমি এইখানে থাকো। আমি ঘরটা পরিষ্কার করে তোমাকে ডাকব। বাসের উপর থেকে বিছানাটা নামিয়ে নিয়ে উপরে এসো।

আমাকে দাও।

বলে ঝাঁটাটা আমি কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু

স্বাতি একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করে তরতর করে উপরে উঠে গেল।

ঠিক এই মুহূর্তে যাত্রীদের মধ্যে একটা সোরগোল উঠল। উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে স্বাতি বলল: কী হল?

বললুম: উপর থেকে বোধ হয় বাস আসছে।

স্বাতি হুড়মুড় করে নেমে এসে বলল: সত্যি নাকি!

সাগ্রহে সবাই সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একটা বাস নাকি দেখতে পাওয়া গেছে, তার পিছনে আরও বাস আছে। পাহাড়ের বাঁকের জন্যে এখন দেখা যাচ্ছে না, সামনের বাঁক ঘুরলেই দেখা যাবে। যাঁরা সামনে ছিলেন,তাঁরাই প্রথমে চেঁচিয়ে উঠলেন: বদ্রীবিশাল কি জয়!

স্বাতি আর অপেক্ষা না করে ঝাঁটা ফিরিয়ে দিয়ে এল। বলল: পথে আর বাধা বিঘ্নের কথা বোলো না।

আমি হাসলুম তার কথা শুনে।

একটি একটি করে অনেকগুলি বাস সামনে দিয়ে চলে গেল। শেষ বাসটি থামল কিছুক্ষণের জন্যে। তার কাছেই জানা গেল যে পথ পুরোপুরি মেরামত হয় নি, খুব সাবধানে বাস যেতে দেওয়া হচ্ছে। খানিকটা জায়গা খুব সতর্ক ভাবে পার হতে হবে, সামান্য অসাবধান হলেই কয়েক হাজার ফুট নিচে গড়িয়ে পড়তে হবে।

কথাটা মিথ্যা নয়। সেখানে পথ আর নেই। ধ্বসে-পড়া পাহাড়ের একটা অংশ চেঁচে-ছুলে পথের মতো করা হয়েছে। বহু লোক কাজ করছে এখনও। পাহাড় আর খাদের দিকে তাকিয়ে প্রাণ কণ্ঠাগত হল। চোখ বুঁজে বদ্রীবিশালের নাম করলেন যাত্রীরা। তার পরে অত্যন্ত মন্দ গতিতে সেই জায়গাটি পেরোবার পরেই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, বদ্রীবিশাল কি জয়!

আমাদের আর কোনও বাধা নেই। আমরা এখন ক্রমাগতই উপরে উঠছি। কিন্তু দু একজন যাত্রী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন পথের উপরে।

তাঁদের ধারণা এ পথ নূতন বলে এখনও মজবুত হয় নি। পাহাড়ে এই রকমই হয়। তার গা কেটে নতুন পথ তৈরি করলে বারে বারে পাহাড় নিজেই সে পথ নষ্ট করে দেয়। অনেক দিন ধরে শক্ত হয় পথ, নিরাপদ হয়। যোশীমঠ পর্যন্ত পথ এখন নিরাপদ, যোশীমঠ থেকে বদ্রীনাথের পথ নিরাপদ হতে আরো কয়েক বছর সময় লাগবে। চামোলি থেকে উখীমঠের পথও নতুন। সে পথেও ধ্বস নামছে, দুর্ঘটনা ঘটছে। সে পথ এখনও নিরাপদ হয় নি।

এক সময় যাত্রীরা আবার সজাগ হয়ে উঠলেন। স্বাতি বলল: আবার কী হল?

আমি অন্যের দিকে তাকালুম।

একজন যাত্রী বললেন: দেবদেখনি।

তার মানে, এই চড়াইয়ের মাথা থেকে বদ্রীনাথ দেখা যাবে। তাই এই জায়গার নাম হয়েছে দেবদেখনি। পুরাকালের পদযাত্রীরা এইখানে পৌঁছেই জীবন সার্থক হয়েছে ভাবতেন। বদ্রীনাথের প্রথম দর্শন পেতেন এইখানে। কিন্তু বাসের ভিতরে বসে আমরা ঠিক বুঝতে পারলুম না। এই জায়গার পরে আমরা যেন একটি উপত্যকায় নেমে এলুম। কিন্তু পথের ধারে অলকনন্দার ধারা দেখতে পেলুম না। শুনেছিলুম এই দেবদেখনির কাছে অলকনন্দা বরফে আবৃত থাকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত। অথচ চারি দিকে তাকিয়ে বরফ কোনও দিকে দেখতে পেলুম না।

অল্পক্ষণ পরেই আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে এসে নামলুম। আকাশে রোদ নেই, কিন্তু অন্ধকার এখনও হয় নি। মেঘলা আকাশে মনে হল এক পশলা বৃষ্টির পরে এখন থমথম করছে। শীত বিশেষ নেই। তবু আমরা ব্যাগ থেকে আমাদের গরম চাদর বার করে নিলুম। কুলীরা মাল নামাল বাসের ছাদ থেকে।

কয়েক জন পাণ্ডা এগিয়ে এল। আমাদের বাসস্থান নাম

গোত্র জানতে চাইল তারা। স্বাতি বলল: পাণ্ডা আমাদের চাই নে।

সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিল তারা। আর আমরা খুব আশ্চর্য হলুম। আমি বললুম: একজনকে সঙ্গে নিলে খুব ভাল হত।

স্বাতি স্বীকার করল: তা হত।

কিন্তু তখন আর কাউকে দেখতে পেলুম না। ছোটখাটো একটি বাজার গড়ে উঠেছে এই বাসের আড্ডায়। আর অনেক বাস দাঁড়িয়ে আছে। লোকজনও অনেক। তাদের মধ্যেই পাণ্ডারা মিলিয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত কুলীকে অনুসরণ করে আমরা এগোলুম। অনেকটা পথ যে আমাদের হাঁটতে হবে তা দেখতে পাচ্ছি। এই উপত্যকার দু দিকেই পাহাড়। এ ধারের পাহাড়ে ঘর বাড়ি দেখতে পাচ্ছি না, বদ্রীনাথ শহর দেখতে পাচ্ছি ও ধারের পাহাড়ের গায়ে। অলকনন্দা নদীও ওই দিকে।

টেম্পল কমিটির একটা রেস্ট হাউসে আমরা আশ্রয় পেলুম। নতুন বাড়ি, স্যানিটারি বাথরুম। বিজলির তার লেগেছে, কিন্তু বাতি জ্বলছে না। একটা ঘরে জিনিসপত্র রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। এখনও অনেক সময় আছে। অন্ধকার হবার আগেই আমরা শহরটা দেখে নিতে পারব।

কতকটা নিশ্চিন্ত মনে বাহিরে এসে আশ্চর্য হলুম খানিকটা। আমাদের খুব কাছেই দুখানা বাস ও ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়ে আছে। স্বাতি বলল: তবে আমাদের অত দূরে নামিয়ে দিল কেন?

এর উত্তর পেলুম একজনকে জিজ্ঞাসা করে। সরকারী বাস এই পর্যন্ত আসে, আসে নানা প্রতিষ্ঠানের টুরিস্ট বাসও। ট্যাক্সিও প্রায় সর্বত্রই যেতে পারে। আমরা পাবলিক বাসে এসেছি বলে শহরের উপকণ্ঠে আমাদের নামতে হয়েছে।

অলকনন্দার এপার থেকেই ওপারে পাহাড়ের গায়ে বদ্রীনাথ

শহর দেখা যাচ্ছে। লোহার সরু পুল পেরিয়ে ওপারে যেতে হয়। কোনও যানবাহন চলে না এর উপর দিয়ে। স্বাতি বলল : এই দিকে এসো। এখান থেকে আমরা শহরটা চেনবার চেষ্টা করি।

অলকনন্দার পরপার থেকেই ধাপে ধাপে ঘর বাড়ি উঠেছে। বদ্রীনাথের মন্দিরের বিশাল তোরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তার পিছনে একটি গম্বুজ। উঁচু একটি দণ্ডের উপরে নিশান উড়ছে। এই গম্বুজের নিচেই বদ্রীনাথের বিগ্রহ আছে বলে মনে হচ্ছে। আর মন্দিরের সামনে থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে এসেছে নিচে অলকনন্দার তীরের দিকে। কিন্তু জল পর্যন্ত পৌঁছয় নি। উপরের রাস্তার কাছাকাছি এসেই শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। এই ধাপের নিচেই যে তপ্তকুণ্ড, পরে সেই কথা জেনেছিলম।

এই সিঁড়ি দিয়ে যাত্রীদের ওঠানামাও দেখতে গেলুম। অনেকে এই অবেলায় স্নান করে উঠছেন বলেও মনে হল। উষ্ণ জলের কুণ্ড বলেই যাত্রীরা এখানে স্নান করতে ভয় পায় না। অলকনন্দার জল নিশ্চয়ই বরফের মতো শীতল, আর তার কিছু উপরেই উষ্ণ জলের কুণ্ড আছে জেনে আশ্চর্য লাগছে। স্নানেরও ভাল ব্যবস্থা আছে। যাত্রীরা এই গরম জলে স্নান করে পথশ্রম দূর করে। যখন তাদের পায়ে হেঁটে আসতে হত, স্নান তখন অপরিহার্য ছিল। গা হাত পায়ের ব্যথা দূর হত এই গরম জলে স্নান করে। স্বাতির দিকে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : স্নান করবে ?

সংক্ষেপে স্বাতি বলল : না।

আজ সকালে আমরা স্নান সেরেই বেরিয়েছি। বাসে চেপে এসেছি বলে শরীরে ব্যথাও হয় নি। তাই আমাদেরও স্নানের আগ্রহ ছিল না। মেঘলা আকাশ তখন জলভারে থমথম করছে। মনে হচ্ছে, ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামবে। তাতেও শীত বাড়বে না। পাহাড়ে এই রকমের আবহাওয়া বেশ আরামপ্রদ। এর পরে যখন রোদ উঠবে, তখন বাতাস বইবে কনকনে। শীতে জড়সড় হবে

শরীর। স্বাতি এই আকাশের দিকে চেয়ে একখানা ছবি তুলে নিল। তার পরে বলল : চল, তাড়াতাড়ি গিয়ে মন্দিরের ছবি তুলে নিই। বৃষ্টি নামলে ছবি ভাল হবে না।

কিন্তু খানিকটা এগোতে না এগোতেই বৃষ্টি নামল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। মাথার উপরে তার চাদর তুলে দিয়ে আমাকে বলল : তুমিও মাথাটা ঢেকে নাও।

আশ্চর্য পরিবেশ। বৃষ্টিকে আমরা এতটুকু ভয় পেলুম না। অলকনন্দার পুল পেরিয়ে নির্ভয়ে আমরা মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলুম।

২৬

খানিকটা উপরে উঠেই বাজারের পথ পাওয়া গেল। ডান দিকে মন্দিরের বিশাল দরজা দেখা যাচ্ছে। সিংহদ্বার। সেই দিকে এগিয়ে স্বাতি বলল : আগে একখানা ছবি তোলা যাক।

বললুম : এই বৃষ্টিতে কি ছবি হবে ?

স্পষ্ট না হলেও মনে রাখবার মত কিছু হবে।

এই বিশাল সিংহদ্বারের ছবি সাধারণ ক্যামেরায় পুরোপুরি নেওয়া সম্ভব নয়। অনেকখানি পেছিয়ে এ দিকে সে দিকে ফিরে স্বাতি বলল : ওয়াইড্ অ্যাঙ্গল্ লেন্স্ থাকলে সুবিধা হত।

বলেই ছবি তুলে নিল। তার পরে বলল : আমার টুরিস্টের কাজ ফুরিয়েছে, এইবারে আমি তীর্থযাত্রী।

বলে ক্যামেরাটা আমার কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে বলল : বদ্রী-বিশালের পুজো দিতে হবে।

শুকনো ফল মূল ও পূজার সমস্ত উপকরণ সামনের দোকান-গুলিতেই পাওয়া যায়। অল্প সময়েই তা সংগ্রহ করা সম্ভব হল। এইখানেই আমরা জুতো মোজা খুলে রাখলুম। তার পরে মন্দিবে প্রবেশের জন্য এগিয়ে গেলুম।

প্রশস্ত সিঁড়ির ধাপ রাস্তা থেকে দোতলা পর্যন্ত উঠে গেছে। তার দু ধারে রেলিঙ। তোরণ তো নয়, একটি দোতলা গৃহ। নিচের তলায় কী আছে জানি নে। এদিক থেকে উপর তলাতে যাবার পথও নেই। ভিতরে যাবার যে পথ তার দু ধারে নানা রকমের কারুকার্য। সকলের উপরে রাজস্থানী শৈলীতে নির্মিত নহবৎখানার আকারের তিনটি ঘর। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে গেলুম। চারি ধারে আরও কয়েকটি মন্দির ও মন্দির কমিটির অফিস। আমরা প্রবেশ করলুম বদ্রীনাথের মন্দিরে।

যে মন্দিরের গর্ভগৃহে বদ্রীনারায়ণ, সেখানে যাত্রীর প্রবেশ নিষেধ। দক্ষিণ ভারতের মতো দূর থেকে দেবতাকে দর্শন করতে হয়। শুনেছিলুম যে বিষ্ণুর এখানে পদ্মাসন মূর্তি, যেন যোগে বসেছেন। কিন্তু তা বুঝতে পারলুম না। সামনে একজন ব্রাহ্মণ বসে আছে। দেবতার ভোগের জন্য স্বাতি যে শুকনো ফল ও মিষ্টান্ন সংগ্রহ করেছিল, দেবতার নিকটে তা পৌঁছল না। স্বাতির হাত থেকে থালাটি নিয়ে সেই ব্রাহ্মণ খানিকটা নিজের কাছে রেখে বাকিটা ফিরিয়ে দিল। কোন পূজা নয়, মন্ত্রপাঠ নয়। হাতজোড় করে নমস্কার করে আমরা বেরিয়ে এলুম।

তিরুপতির কথা আমার মনে পড়েছিল। কিন্তু ঠিক সে রকম নয়। সেখানে যাত্রীর চাপ এত বেশি যে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়েছিল দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর। আর ভিতরে একটি মুহূর্তের বেশি দাঁড়াতে পারি নি। তাড়া দিয়ে বার করে দিয়েছিল মন্দিরের ব্রাহ্মণ। ভগ্ন-মনোরথে আমরা বেরিয়ে এসেছিলুম। কিন্তু এখানে যাত্রীর ভিড় নেই। মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে বলে নি কেউ। অবেলার দর্শন বলেই বোধ হয় খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে পেরেছিলুম। কিন্তু মন ভরল না। এক রকমের বেদনা বুকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলুম।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। তার বেদনার্ত দৃষ্টি আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করলুম। বললুম: এসো, অন্য মন্দিরগুলো দেখি।

প্রথমেই লক্ষ্মীকে প্রণাম করলুম তাঁর মন্দিরে। তার পরে দেখলুম ভোগমণ্ডি। এই ভোগমণ্ডিতে দেবতার জন্যে ভাতের ভোগ রান্না হয়। টেম্পল্ কমিটির অফিসে আমরা একখানি বই কিনলুম 'কল্ অফ্ বদ্রীনাথ'। এই অঞ্চলের সম্বন্ধে অনেক সংবাদ আছে এই বইএ। তার পরে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এলুম।

প্রথমেই সেই দোকানে গিয়ে তাদের রেকাবিটি ফেরৎ দিলুম।

বদ্রীনাথের প্রসাদ স্বাতি কাগজে মুড়ে তার ব্যাগের মধ্যে পুরে রাখল। নিজেরাও নিলুম এক এক টুকরো। তার পরে জুতো মোজা পরে বেরিয়ে পড়লুম।

ছোটখাট একটি পাহাড়ী শহর এই বদ্রীনাথ। ছ-মাস খোলা থাকে আর বন্ধ হয়ে যায় শীতের ছ মাস। সব কিছুই তখন বরফে আছন্ন হয়ে যায়। কার্তিকের শেষে অগ্রহায়ণের প্রথম থেকে বৈশাখের শেষ জ্যৈষ্ঠের প্রথম পর্যন্ত এই অঞ্চলের সমস্ত তুষার তীর্থই বন্ধ থাকে। দেবতার ভোগমূর্তির পুজা তখন নিচের কোনও শহরে হয়। বদ্রীনাথের পূজা হয় যোশীমঠে।

এখন এখানে বাসস্থানের কোন অভাব নেই। ভাল ধর্মশালা আছে অনেক, টেম্পল্ কমিটির রেস্ট হাউস আছে। পাণ্ডাদের বাড়িতেও থাকবার ব্যবস্থা আছে। আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের বাসস্থান আছে। চিঠি লিখে রিজার্ভ করানো যায়। পাণ্ডারা লেপ কম্বল দেয়, দোকানেও ভাড়া পাওয়া যায়। কাজেই শীতে কাবু হতে হয় না কোনও যাত্রীকে। শুনতে পেলুম যে বদ্রীনাথে শীঘ্রই হোটেল খোলা হবে, কেদারনাথেও হোটেল হবে। টুরিস্টদের তখন আর কোন অসুবিধা থাকবে না।

বদ্রীনাথের পথে তখন অন্ধকার নেমেছে, কিন্তু বাজারের পথে অন্ধকার নেই। বিজলির বাতি জ্বলছে। বৃষ্টি পড়াও বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। স্বাতি বলল: কিছু খেয়ে নিলে মন্দ হত না।

হেসে বললুম: বিকেলের চায়ের কথা তো আমরা ভুলেই গিয়েছিলুম।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল: তুমি কি রাতের খাবারের কথা ভাবছ!

বললুম: রাতে আর বেরোবার উৎসাহ থাকবে না।

কেন ?

বদ্রীনাথের উচ্চতা জানো তো! ১০২৪৪ ফুট। একটু পরেই শীতে জড়সড় হতে হবে।

স্বাতি বলল : আরতি দেখতে আসবে না ?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই আমরা একটি ভোজনাগারে পৌঁছে গেলুম। ভাল চা পাওয়া যায়। অনেক যাত্রী এখানে খেতে বসেছে। খাচ্ছে পুরি বা কচুরি, সঙ্গে তরকারি আছে। কোনও ইতস্তত না করে আমরাও এখানে খেতে বসলুম। প্রথমে চা খাব, তার পর পুরি কচুরি। জনকয়েক যাত্রীর দিকে তাকিয়ে স্বাতি বলল : বদ্রীনাথে আর কী দেখবার আছে, সে খবরও এইখানে পাওয়া যাবে।

এই সংবাদ সংগ্রহের জন্য খুব বেশি চেষ্টা করতে হল না। খানিকটা তফাতে উপবিষ্ট এক ভদ্রলোকের দিকে ফিরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আপনি এখানে দিন কয়েক থেকে আছেন মনে হচ্ছে ?

কী করে বুঝলেন ?

বলে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন।

হেসে বললুম : আপনার হাব-ভাব দেখেই মনে হচ্ছে যে এই জায়গাটি আপনার বেশ পরিচিত।

খুশী হয়ে ভদ্রলোক বললেন : শুধু বদ্রীনাথ নয়, বদ্রীনাথের আশেপাশেও আমি সব ঘুরে দেখেছি।

তাঁর উত্তর শুনে স্বাতিও তাঁর দিকে ফিরে বসল। আর আমার দিকে তাকাল বেশ বিস্ময় নিয়ে। আমি বললুম : দেখলুম ইনি এখানকার বাসিন্দার মতো এসে নিজের পছন্দের জায়গাটি খুঁজে বসলেন। আর নাম ধরে ডাকলেন এঁদের একজনকে।

তার পরে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললুম : আমরা এখান থেকেই ফিরে যাব বলে ভাবছি—

কী ভাবছেন ?

আপনার মতো কাউকে পেলে জানবার কথা সব জেনে নেব।

ভদ্রলোক কী ভেবে বললেন : বদ্রীনাথে ক দিন আছেন ?

বললুম : আজ বিকেলে এসেছি। কাল সকালেই হয়তো ফিরে যাব।

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে তাকালেন আমাদের মুখের দিকে। ভাবখানা এই রকম যে তবে এসেছিলুম কেন! কিন্তু তা না বলে বললেন : হ্যাঁ, বদ্রীনাথ দর্শন যখন হয়েছে, তখন আর থাকবার দরকার কী!

তার পরে গম্ভীর হয়ে বললেন : কিন্তু সত্যি কথা কী জানেন! বদ্রীনাথ হলেন এখানে আসবার একটা উপলক্ষ, আসল লক্ষ্য হল হিমালয়। তা না হলে বারো শো বছর আগে শঙ্করাচার্য এখানে এসেছিলেন কেন! তিনি তো বদ্রীনাথ দর্শনে আসেন নি! তপ্ত কুণ্ডের ধারে যে গরুড় গুহা, সেই গুহায় বসে তিনি তপস্যা করেছিলেন। লোকে গল্প তৈরি করেছে যে স্বপ্নে তিনি জানতে পেরেছিলেন বদ্রীনাথের বিগ্রহ পড়ে আছে নারদ কুণ্ডে। সেই বিগ্রহ পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্য আকাশবাণী হয়েছিল। তাই শঙ্করাচার্য সেই বিগ্রহ মূর্তি উদ্ধার করে একটি বদরী বা কুলগাছের নিচে স্থাপন করেছিলেন। এই জন্যেই দেবতার নাম হয়েছে বদরীনারায়ণ বা বদ্রীনাথ।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললুম : মহাভারতের কালেও বদরিকাশ্রম ছিল বলে শুনেছি।

ছিল!

বলে ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম : মহাভারতের বনপর্বে আছে যে বিষ্ণুর আশ্রম ছিল এইখানে। ভৃগুতুঙ্গ পর্বতের বিশালা বদরীতে অবস্থিত ছিল বলে নাম বদরিকাশ্রম। গঙ্গা এখানে শীতল ও উষ্ণ জল প্রবাহিণী

ছিলেন আর নদীর বালি ছিল সুবর্ণময়। বিষ্ণুকে লাভ করবার জন্য দেবতা ও ঋষিরা এইখানেই আসতেন। কর্ণপ্রয়াগে ছিল কণ্ব মুনির আশ্রম আর দুষ্মন্ত শকুন্তলার মিলন হয়েছিল সেইখানে।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : তাহলে তো এই প্রয়াগের কণ্বপ্রয়াগ নাম হওয়া উচিত।

বললুম : হয়তো তাই ছিল। কণ্ব নামই কালক্রমে কর্ণ হয়েছে।

ভদ্রলোক বললেন : হঠাৎ কর্ণপ্রয়াগের নাম করছেন কেন ?

বললুম : সত্য পথ বা শতপন্থ বদ্রীনাথ থেকে পনর মাইল দূরে। কর্ণপ্রয়াগ বা নন্দপ্রয়াগ থেকে শতপন্থ পর্যন্ত এই ভূমি বদরী বিশাল ক্ষেত্র নামে পরিচিত ছিল। বেদে এই তীর্থের উল্লেখ বোধ হয় নেই, কিন্তু লোকে বলে বেদের কিছু শ্লোক ও উপনিষদের অনেক অংশ এইখানেই প্রথম গীত হয়েছিল। অসম্ভব নয়, সত্য যুগের অনেক মুনি ঋষির বাস ছিল এইখানে। পুরাণে এই স্থানের অনেক উল্লেখ আছে। বদ্রীনাথের নিকটে মানা গ্রামে আছে ব্যাস গুহা। ব্যাস-দেব নাকি সেই গুহায় বাস করে বেদ বিভাগ করেছিলেন, আর পুরাণও রচনা করেছিলেন। এ হল দ্বাপরের কথা। কৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে এখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন।

তার পরে তাঁদের পূর্বজন্মের তপস্যার কথা বললুম। মহাভারতেই এই গল্প আছে। পূর্বজন্মে কৃষ্ণ ও অর্জুন ছিলেন নারায়ণ ও নর ঋষি। বিষ্ণুর অংশে তাঁদের জন্ম। ধর্ম তাঁদের পিতা ও মাতা হলেন দক্ষ কন্যা মূর্তি। এখনকার গন্ধমাদন পর্বতে তাঁরা কঠোর তপস্যায় নিরত হয়েছিলেন, আর দেবতারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁদের তপোভঙ্গের নানা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অপ্সরাদের পাঠালেন। ঋষিরা তাদের দেখে বিচলিত হলেন না। নিজেদের তপোবলে দেবতাদের সঙ্গে কৌতুক করবেন বলে স্থির করলেন। নারায়ণ ঋষি একটি ফুল নিয়ে নিজের উরুর উপরে

রাখলেন, আর সেই উরুর ফুল থেকে যে অপ্সরার জন্ম হল তারই নাম উর্বশী।

স্বাতি বলে উঠল: সে কি! উর্বশীর জন্ম তো সমুদ্র মন্থনের সময়!

বললুম: জন্ম নয়, লক্ষ্মীর সঙ্গে তিনিও উঠেছিলেন। আর আমার গল্পের শেষটুকু বলি। উর্বশীর রূপ দেখে স্বর্গের অপ্সরাদের মাথা হেঁট হয়ে গেল। দেবতাদেরও। তাই দেখে নারায়ণ ঋষি আরও অনেক সুন্দরী নারী সৃষ্টি করলেন। তার পরে অপ্সরাদের বললেন এদের সবাইকে নিয়ে ইন্দ্রের কাছে ফিরে যেতে। ইন্দ্র পরাস্ত হলেন নর নারায়ণ ঋষির কাছে।

ভদ্রলোক খানিকটা বিস্মিত ভাবে বললেন: এই জন্যেই বুঝি এখানকার দুটি পাহাড়ের নাম নর ও নারায়ণ পর্বত!

স্বাতি বলল: তাই নাকি!

ভদ্রলোক বললেন: অলকনন্দার এক দিকে নর পর্বত। অন্য দিকে নারায়ণ পর্বত।

আমার দিকে চেয়ে স্বাতি বলল: পুরাণের কথা পরে শুনব। এখন এঁর কাছে কিছু শুনি।

বলে ভদ্রলোককে বলল: আর কী দেখবার আছে এখানে?

ভদ্রলোক বললেন: পঞ্চ শিলা আর পঞ্চতীর্থ আছে এখানে। তপ্ত কুণ্ড ও নারদ কুণ্ডের মধ্যে নারদ শিলা। শীতে যখন এই পুরী জনশূন্য হয়ে যায়, তখন দেবর্ষি নারদ পূজো করেন বদ্রীনাথের। নারদ শিলার কাছে অলকনন্দা নদীতে আছে বরাহ শিলা। হিরণাক্ষ্যকে বধ করবার পরে বরাহ এসে এইখানে বদ্রীনাথের পূজা করেছিলেন। আদি কেদারেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের কাছে আছে গরুড় শিলা। মা বিনতাকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত করে গরুড় এইখানে এসে বিষ্ণুর বাহন হয়েছিলেন। মার্কণ্ডেয় শিলা তপ্ত কুণ্ডের নিচে। মার্কণ্ডেয় ঋষি এইখানে বসে তপস্যা করেছিলেন। নরসিংহ শিলাও

দূরে নয়। হিরণ্যকশিপুকে বধ করে নৃসিংহ এখানে ঋষিদের অনুরোধে বিপুল কায়া ধারণ করেছিলেন।

খেতে খেতে আমরা এই ভদ্রলোকের কাছে পঞ্চ তীর্থের কথাও শুনলুম। তপ্ত কুণ্ডের নাম বহ্নিতীর্থ। অগ্নির অধিষ্ঠান এইখানে। আর এরই নিকটে প্রহ্লাদ কুণ্ড। এটি একটি ঈষতুষ্ণ জলের ধারা। নারদ কুণ্ড ও তপ্ত কুণ্ডের কাছে অলকনন্দার গর্ভে একটি পাথরের আড়ালে এই জলের কুণ্ডে যাত্রীরা নিরাপদে স্নান করতে পারে। একটি শীতল জলের ধারার নাম কূর্মধারা। এই ধারায় স্নান করে কূর্মাবতার বিষ্ণুর পূজা করেছিলেন। পঞ্চতীর্থের শেষ তীর্থ হল ঋষিগঙ্গা। নীলকণ্ঠ উপত্যকা থেকে এই নদী বয়ে এসে অলকনন্দায় পড়েছে।

ভদ্রলোক বললেন: বদ্রীনাথে দ্রষ্টব্য স্থান আরও আছে। সূর্য কুণ্ড একটি উষ্ণ জলের পুষ্করিণী। ব্রহ্মকপালে ব্রহ্মার অধিষ্ঠান, পিতৃপুরুষের তর্পণ করে যাত্রীরা। চতুর্ভুজ বিষ্ণু এখানে ভক্তদের দেখা দিয়েছিলেন। আর অনেকে নাকি কুম্ভযোগে এখনও তাঁকে নীলকণ্ঠ পর্বত শৃঙ্গে দেখতে পায়। আর—

ভদ্রলোক থামতেই আমি বললুম: বলুন।

বদ্রীনাথের নতুন তীর্থ হল গান্ধী ঘাট। তপ্ত কুণ্ড ও ব্রহ্ম-কপালের মাঝে অলকনন্দার জলে মহাত্মাজীর অস্থি বিসর্জন করা হয়েছিল। সেই ঘাটের নাম এখন গান্ধী ঘাট।

তার পরে বললেন: কেদারনাথে গান্ধী সরোবর দেখেছেন তো?

বললুম: কেদারনাথে আমরা যাই নি।

সে কি!

বললুম: এখান থেকে কেদারনাথেই যাব।

ভদ্রলোক বললেন: সেখানে চোরাবারি তালের নাম হয়েছে গান্ধী সরোবর। কিন্তু মানস সরোবরের নাম বদলেছে কিনা জানি না।

কেন?

মানস সরোবরের জলেও তো মহাত্মাজীর অস্থি বিসর্জন করা হয়েছিল!

হেসে বললুম: মানস সরোবর তো আর ভারতবর্ষে নয়, সে তিব্বতে। সেখানে এখন চীনের শাসন।

আমি ভেবেছিলুম যে বদ্রীনাথের কথা বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ভদ্রলোক বললেন: বদ্রীনাথের আশেপাশে আরও অনেক তীর্থ আছে। সে সব দেখতে হলে দু তিন দিন থাকতে হয়। মাইল খানেক দূরে অলকনন্দার পরপারে আছে শেষনেত্র। একটি পাথরের উপরে শেষনাগের নেত্র। চরণ পাদুকা অন্য ধারে। দু মাইল পশ্চিমে নীলকণ্ঠ পাহাড়ের পাদদেশে ভগবানের পায়ের চিহ্ন আছে একটি পাথরের উপরে। আর উত্তরে দু মাইল গেলে মাতা মূর্তি, বদ্রীনাথের মায়ের মন্দির মানা গ্রামের উল্টো দিকে।

ভদ্রলোকের স্মৃতিশক্তি দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছিলুম। বললুম: আপনি দেখছি তীর্থের টানেই এখানে এসেছেন।

ভদ্রলোক আপত্তি করলেন না, বললেন প্রথমবারে এসেছিলাম তীর্থ দর্শনেই। পাণ্ডার বাড়িতেই উঠে বদ্রীনাথ দর্শন করলাম। দেবতাকে ভাল করে দেখবার জন্যে রাওল সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করলাম। রাওল সাহেব কে জানেন তো?

বললুম: না।

রাওল সাহেব হলেন প্রধান পুরোহিত। শঙ্করাচার্যের দেশের নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ। পূর্বে আজন্ম ব্রহ্মচারী দণ্ডি সন্ন্যাসীরা পুজো করতেন। এখন এই পুজো নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের হাতে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: বদ্রীনাথের মূর্তি কি আপনি ভাল করে দেখেছেন?

ভদ্রলোক বললেন: দেখেছি বৈকি। কালো পাথরের মূর্তি প্রায় দু ফুট উঁচু। যোগাসনে আসীন, হাত দুটি কোলের উপরে

ন্যস্ত, পায়ে পথচিহ্ন। মাথায় জটা, গলায় উপবীত, ভৃগুপদ চিহ্নিত বিশাল বক্ষ, ক্ষীণ কটি সৌম দর্শন নারায়ণ।

স্বাতি বলল : নারায়ণের দু হাত কেন ?

ভদ্রলোক বললেন : আমিও এই প্রশ্ন করেছিলাম। তার উত্তর পেয়েছি যে এক সময় চতুর্ভুজ মূর্তি ছিল, অপর দুটি হাত থাকার নিদর্শন নাকি আছে। অন্তত বৈষ্ণবরা এই কথা বিশ্বাস করতে বলেন। কিন্তু শৈবরা বলেন, এই মূর্তি তপস্যায় রত জটাধারী শিবের। জৈনরা তীর্থঙ্কর বলেন আর বৌদ্ধরা মনে করেন যে এটি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি, তিব্বত থেকে এই মূর্তি এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

কোন্‌টা সত্যি ?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু ভদ্রলোক বললেন : শুনে আরও আশ্চর্য হবেন যে শক্তি উপাসকেরা এটি পুরুষ মূর্তি বলে স্বীকারই করেন না। তাঁরা বলেন, এটি দেবী ভদ্রকালীর মূর্তি।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বললুম : এটি বদ্রীনাথেরই মূর্তি। অনেক দিনের বিশ্বাস দিয়ে আমরা এঁকে বদ্রীনাথ করেছি।

আমার কথা শুনে স্বাতি কতকটা আশ্বস্ত হল।

ভদ্রলোক বললেন : বদ্রীনাথ দর্শনের পর ভেবেছিলাম যে এখানকার সব দেখা হয়ে গেল, সার্থক হল বদ্রীনাথে আসা।

একটু থেমে বললেন : তখনও জানতাম না যে বদ্রীনাথের চেয়েও বড় হল হিমালয়। কিন্তু—

বলে ভদ্রলোক আবার থামলেন।

বললুম : বলুন।

ভদ্রলোক আমাদের দিকে চেয়ে লজ্জিত ভাবে বললেন :

আপনাদের খাওয়া তো হয়ে গেছে, আমার জন্যেই আপনাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

বললুম: দোকানে ভিড় তো নেই, কারও ক্ষতি হচ্ছে না। অথচ লাভ হচ্ছে আমাদের।

কিন্তু ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন: কোথায় উঠেছেন আপনারা?

নিজেদের বাসস্থানের কথা বললুম।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: সে তো ভাল জায়গা। আপনারা এগোন, আমি একটু পরেই আপনাদের কাছে পৌঁছে যাব।

স্বাতি বলল: সেই ভাল।

বিদায় নেবার আগে ভদ্রলোক বললেন: রাতে এখানে খুব ঠাণ্ডা পাবেন। আপনাদের চৌকিদারকে বলবেন, খান দুই নতুন লেপ ভাড়া করে আনবে। তাতে বেশ আরাম পাবেন।

বলে তিনি নিজের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আমাদের আগেই নেমে গেলেন।

২৭

রেস্ট হাউসে ফিরে স্বাতি বলল: কেন জানি নে, মন ভরল না।

বললুম: কী করে ভরবে!

কথাটা বুঝতে না পেরে স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তাই দেখে বললুম: দেবতার স্পর্শ না পেলে মন আমাদের ভরে না। দেবতার পায়ে আমরা মাথা ঠুকতে চাই, চোখের জলে অভিষেক করতে চাই তাঁর, আর দু হাতে জড়িয়ে ধরতে চাই তাঁকে। দক্ষিণ ভারতে সে সুযোগ পাই নি বলেই সে দেশের দেবতা আমাদের ভাল লাগে নি।

স্বাতি বলল: বিষ্ণুকে আমরা ছুঁতে পারি না কেন?

তিনি অপবিত্র হয়ে যাবেন যাত্রীর স্পর্শে।

কিন্তু শিবের বেলায় তো কোন নিয়ম কানুন নেই!

সেই জন্যেই তো তিনি আমাদের মনের ঠাকুর, আর নারায়ণ থাকেন আমাদের ঠাকুরঘরের সিংহাসনে।

অসংখ্য বৈষ্ণব ভক্তের কথা তুলে স্বাতি আমার কথার প্রতিবাদ করল না। নিঃশব্দে সে যে আমার কথা মেনে নিয়েছিল, তা বুঝতে পারলুম খানিকক্ষণ পরেই। আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বেজে উঠল মন্দিরে। পাশের কয়েকটি ঘরে যাত্রীরা তৎপর হয়ে উঠলেন বেরোবার জন্যে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আমরা বেরোব না?

বাহিরে এখন বৃষ্টি পড়ছে না, শীতও নয় বেশি। কিন্তু মন আমাদের দুলে ওঠে নি। আরতির ঘণ্টা মনে কোনও প্রতিধ্বনি তোলে নি। স্বাতি নিঃশব্দে বসে রইল, আমার প্রশ্নের কোন উত্তর সে দিল না।

হঠাৎ আমাদের ভেজানো দরজাটা একটু ফাঁক হল। দেখলুম সেই ভদ্রলোক উঁকি দিলেন এবং আমাদের দেখতে পেয়েই দরজা

ঠেলে ভিতরে এলেন। আশ্চর্য হয়ে বললেন: আরতি দেখতে আপনারা বেরোলেন না?

আমি কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু হাসলুম।

ভদ্রলোক বসে বললেন: এখান থেকে আপনারা কেদারনাথে যাবেন। কিন্তু তার চেয়ে বদ্রীনাথের মন্দির অনেক বড়, অনেক বেশি যাত্রী আসেন এখানে, মন্দিরের আয় কেদারনাথের ছ গুণ বেশি। কেদারনাথের মতো শুধু দরিদ্র যাত্রীই এখানে আসেন না, দলে দলে বড়লোকও আসেন। পরিশ্রম করে আসতে হয় না বলে বদ্রীনাথ এখন শহরে পরিণত হয়েছে। হোটেল খোলা হচ্ছে—হোটেল দেওলোক।

একটু থেমে বললেন: কেদারনাথেও শুনছি হোটেল খোলা হবে—হোটেল হিমলোক। এবারে আপনারা ফাটা থেকে উনিশ মাইল হাঁটবেন। পরের বছর হাঁটতে হবে এগারো-বারো মাইল। বাস থেকে নেমে এক দিনেই যাত্রীরা পৌঁছে যাবে কেদারনাথ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক বললেন: কিন্তু তখন কেদার-নাথের আকর্ষণ যাবে কমে।

কেন?

বদ্রীনাথের কি আর সে রকম আকর্ষণ আছে!

স্বাতি বলল: এইবারে আপনি হিমালয়ের কথা বলুন।

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত থামলেন, তার পরে বললেন: হিমালয়ের কথা আমাকে কে বলেছিলেন জানেন? আপনাদের মতোই একজন বাঙালী ভদ্রলোক। বয়স হয়েছে অনেক, কিন্তু সাধুর মতো সৌম-দর্শন সক্ষম মানুষ। প্রতি বছর পায়ে হেঁটে হিমালয় দেখেন।

আমি চিনতে পারি তাঁকে, তাই নাম আর জানতে চাই নে। এই ভদ্রলোকের নামও জানি নে, কোন্ দেশের মানুষ তাও জিজ্ঞাসা করি নি। কথা হচ্ছে হিন্দীতে। বললেন: সেই ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন, দেবতার দর্শন পেতে হলে হিমালয়ের আরও

গভীরে যেতে হবে। সত্যিই তাই, মানুষের অত্যাচারে দেবতা দূরে সরে যাচ্ছেন।

তার পরে বললেন : আপনারা যদি দূরে যেতে না চান তো ভোর বেলায় উঠে নীলকণ্ঠকে দেখবেন। নীলকণ্ঠ শৃঙ্গ সাড়ে একুশ হাজার ফুট উঁচু। এখান থেকে উড়ে গেলে মাইল পাঁচেক দূরে, কিন্তু তার তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গটিই শুধু দেখা যায়, সামনের পাহাড়ে ঢাকা থাকে তার সবটুকু। বিদেশীরা শুনেছি সাতবার এসে এই নীলকণ্ঠ পর্বত জয় করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারে নি, ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। ১৯৬১ সালে এই পর্বত পরাজয় স্বীকার করেছে রাজস্থানের এক স্কুল মাস্টারের কাছে—ও. পি. শর্মা তার নাম। তিনিই বদ্রীনাথের দর্শন পেয়েছেন, আমরা দেখেছি দেবতার পাথরের রূপ।

স্বাতি বলল : আমাদের সে সৌভাগ্য হবে না।

ভদ্রলোক বললেন : ইচ্ছা করলে যা পারবেন, সেই কথা আপনাদের বলি। বদ্রীনাথ থেকে দু মাইল দূরে মানা গ্রাম। এখন আর হেঁটে যেতে হয় না। গাড়ি যাচ্ছে মানা গ্রামে। তিব্বত যখন স্বাধীন ছিল, তখন এই গ্রামের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৮৪০২ ফুট উঁচু মানা গিরিপথ দিয়ে তার বাণিজ্য ছিল পশ্চিম তিব্বতের সঙ্গে। ভারতের কাপড় খাদ্যশস্য প্রভৃতি পণ্যের বিনিময়ে তারা তিব্বতের পশমি কাপড় নুন প্রভৃতি নানা জিনিস আনত। এরা চাষবাস করে, ভেড়া ছাগল পোষে আর ব্যবসা করে। এদের বলে মার্চা। কিন্তু এক সময় নাকি এদের বলত গন্ধর্ব।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল : পুরাণের গন্ধর্ব জাতি!

ভদ্রলোক বললেন : সেই রকমই শুনেছি।

স্বাতি আমার দিকে তাকাল। পরে এ নিয়ে আলোচনা করব ভেবে আমি কোন উত্তর দিলুম না।

ভদ্রলোক বললেন : মানা গ্রামে সরস্বতী নদী এসে মিলেছে অলকনন্দার সঙ্গে। এই সঙ্গমের নাম কেশবপ্রয়াগ। আর একটি

দর্শনীয় স্থান হল ব্যাসগুহা। মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস এই গুহায় বসে বেদ বিভাগ করেছিলেন, আর কয়েকখানি পুরাণও রচনা করেছিলেন। এক সময় তীর্থযাত্রীরা সরস্বতী নদীর পথ ধরে মানস সরোবর ও কৈলাসে যেত। এখন সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। যাত্রীরা এখন বসুধারা দেখতে আসে মানার পথে।

স্বাতি বলল: বসুধারা কী?

একটি সুন্দর জলপ্রপাত, প্রায় চার শো ফুট ওপর থেকে নেমেছে। মানা থেকে বাঁ হাতে একটা পায়ে চলা পথ ধরতে হয়। খানিকটা এগিয়েই সরস্বতী নদীর পুল। মানুষের তৈরি নয়। পাহাড়ের একখানা বিরাট পাথর এমন ভাবে আছে যে তার ওপর দিয়ে যাতায়াত করা যায়। সমুদ্রতল থেকে বারো হাজার ফুট ওপরে এই জলপ্রপাতে যাত্রীরা তীর্থস্নান করে। বদ্রীনাথ থেকে এক দিনেই যাতায়াত করা যায়। পায়ে হেঁটে সকাল আটটায় বেরিয়ে বিকেল চারটেয় ফেরা সম্ভব।

তার পরে বললেন: বসুধারা থেকে পাঁচ মাইল দূরে আর একটি সুন্দর জায়গা হল অলকাপুরী।

অলকাপুরী!

বলে স্বাতি তার বিস্মিত দৃষ্টি আমার মুখের উপরে ফেলল। বললুম: অলকাপুরী হল কুবেরপুরী। কালিদাসের মেঘদূতে আমরা এর বর্ণনা পেয়েছি।

সেই অলকাপুরী!

মানায় যদি গন্ধর্বের বাস হয় তো কুবেরের অলকাপুরী তো এখানেই হবে।

ভদ্রলোকও কিছু বিস্মিত হয়েছিলেন, বললেন: অসম্ভব নয়। তার কারণ অলকাপুরীর অল্প দূরেই মানা গিরিসঙ্কট, আর সেই পথেই যেতে হত মানস সরোবর ও কৈলাস।

এখন সেখানে কী আছে?

বলে স্বাতি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাল।

ভদ্রলোক বললেন: এই অলকাপুরীতেই অলকনন্দার জন্ম। শতোপন্থ ও ভগীরথ খরক নামের দুটি হিমবাহের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে এই নদী। অন্য ধারে গোমুখ থেকে বেরিয়েছে ভাগীরথী। দেবপ্রয়াগে এই দুই নদীর মিলন। আর সেখান থেকেই গঙ্গা নাম।

এর পরে ভদ্রলোক শতোপন্থের কথা বললেন। অলকাপুরী থেকে পাঁচ মাইল দূরে ১৪৪০০ ফুট উঁচুতে অপরূপ সুন্দর একটি সরোবর। এর পরিধি হবে এক মাইলের তিন চতুর্থাংশ, আর গাছে গাছে ঘিরে আছে তার চারি ধার।

স্বাতি বলল: বরফ নেই!

আছে বৈকি। চারি ধারের পাহাড়ে হিমবাহগুলি যেন শতোপন্থের দিকেই ঝুলে আছে।

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: এই শতোপন্থের পথে লক্ষ্মীবন ও চক্রতীর্থে আর লেকের ধারে যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা হলে এই অঞ্চলটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। বদ্রীনাথ থেকে লক্ষ্মীবন সাড়ে সাত মাইল দূরে। মাতা মূর্তির মন্দির দেখে চামটোলির উপর দিয়ে যেতে হয়। ভূর্জ বৃক্ষের বন দেখেছেন? ইংরেজীতে যাকে বার্চ বলে?

স্বাতি বলল: দার্জিলিঙে বার্চ হিল নাম শুনেছি।

বার্চ গাছের জন্যেই বোধ হয় বার্চ হিল নাম হয়েছে। লেখার জন্যে কাগজ আবিষ্কার হবার আগে এই ভূর্জ গাছের খুব কদর ছিল। ভূর্জ পাতার ওপরেই বই পুঁথি লেখা হত। সেই সব পুরনো পুঁথি এখনও অনেক লাইব্রেরি ও জাদুঘরে দেখতে পাবেন।

তার পরে এই গাছের বর্ণনা দিলেন ভদ্রলোক। ভূর্জ গাছের সাদা ডালপালা আর পাতা ধূসর রঙের, কিন্তু বাকল রক্তাভ। রঙীন কাগজের মতো সেই বাকল কোথাও গাছের ডালে লেগে আছে, কোথাও বা খুলে ঝুলছে। একটুখানি টানলেই উঠে আসে। আর

আশ্চর্যের ব্যাপার যে এই বাকল পরতে পরতে ওঠে। কাগজের মতো বেছালে একখানা ছবি বলে মনে হবে, কেউ যেন লাল ও সাদা চন্দন দিয়ে এই ছবি এঁকেছে। বললেন: লক্ষ্মীবনে যদি এক দিন থাকেন তো এই ভূর্জ গাছ দেখেই খানিকটা সময় কাটবে, আর বাকিটা কাটবে অলকাপুরী দেখে।

অলকাপুরীর কাছেই বুঝি লক্ষ্মীবন?

লক্ষ্মীবনের পরেই তো অলকাপুরী অলকনন্দার অপর পারে। তার পরে সৌধারা পেরিয়ে চক্রতীর্থে গিয়ে থাকুন। লক্ষ্মীবন থেকে চক্রতীর্থ সাড়ে পাঁচ মাইল আর শতোপন্থ আরও আড়াই মাইল এগিয়ে। শতোপন্থের যাত্রীরা আর দেড় দু মাইল এগিয়ে সোমকুণ্ড ও বিষ্ণুকুণ্ডও দেখে। এই পথ হল অলকনন্দার দক্ষিণ তীর দিয়ে। আর ফেরার পথ শতোপন্থ হিমবাহের অপর পার দিয়ে—অলকাপুরী ও বসুধারা হয়ে এই পথ মানায় এসেছে। মানা থেকে যারা বসুধারা ও অলকাপুরীর পথে শতোপন্থে যান, তাঁরা ফেরেন চক্রতীর্থ ও লক্ষ্মীবনের পথে।

বছরে শুধু তিন চার মাস এই পথে যাতায়াত সম্ভব—জুন থেকে সেপ্টেম্বর। বদ্রীনাথ থেকে শতোপন্থ পর্যন্ত সাড়ে পনর মাইল পথে কোন গ্রাম নেই, বাসস্থান বা দোকান পাটও নেই। চার হাজার ফুটেরও বেশি চড়াই ভাঙতে হয় বলে দু দিন লাগে পৌঁছতে, কিন্তু ফেরা এক দিনেই সম্ভব। যাত্রীরা তাই শুকনো খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাঠ নিয়ে যাত্রা করে। রাত্রিবাস করে পথের ধারে ও লেকের ধারে গুহার মধ্যে। জ্বালানি কাঠের দরকার উত্তাপের জন্যে। রাতে আগুন না জ্বাললে শরীর হিম হয়ে যাবে। অথচ এই পথে কোনও গাছপালাও নেই আগুন জ্বালার মতো।

বদ্রীনাথের মন্দিরে আরতি এখন শেষ হয়ে গিয়েছিল। রাত ক্রমেই শীতার্ত হচ্ছে। ভদ্রলোক হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন: আপনাদের অনেক দেরি করে দিলাম।

না না, কিছু দেরি নয়। বলে আমিও উঠে দাঁড়ালুম।

স্বাতি বলল: আপনি না বললে এই সব কথা আমাদের জানাই হত না।

ভদ্রলোক আমাদের নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন। আমি তাঁকে নিচে অবধি পৌঁছে দিয়ে এলুম। ভদ্রলোক নিজের নাম বললেন না, কোথায় থাকেন তাও বললেন না। শুধু বললেন: দেবতা আমাদের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছেন।

উপরে ফিরে এসে দেখলুম যে স্বাতি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমাকে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল: যাক, ভদ্রলোককে যে পৌঁছতে যাও নি এই আমার ভাগ্য। তার পরে ঘরে ঢুকে বলল: অনেক নতুন কথা জানা গেল, তাই না?

বললুম: ভ্রমণ কাহিনীতে আমি আরও নতুন কথা পড়েছি।

আরও!

বললুম: হ্যাঁ। শতোপন্থই নাকি সত্যপদ হ্রদ। সেখান থেকে শতোপন্থ হিমবাহের তুষার ক্ষেত্রের উপর দিয়ে ঘণ্টা দেড়েক হেঁটে পৌঁছতে হয় একটি ছোট কুণ্ডে। তার নাম সোমকুণ্ড। সূর্যকুণ্ড আরও ঘণ্টা খানেকের পথ।

স্বাতি বলল:, ভদ্রলোক তো বললেন সোমকুণ্ডের পরে বিষ্ণুকুণ্ড।

আমি বললুম: কোন্‌টা ঠিক, আমি বলতে পারব না। তবে এই রকমের ছোট ছোট কুণ্ড এই অঞ্চলে আরও আছে। সেখান থেকে সামনে দেখা যাবে বদ্রীনাথ শৃঙ্গ, ম্যাপে যার চৌখাম্বা নাম। এ দিকে শতোপন্থের হিমবাহ, ও দিকে গঙ্গোত্রীর। ঐ গিরিসঙ্কট পেরিয়ে নাকি কেদারনাথেও পৌঁছনো যায়, যোগী সন্ন্যাসীরা নাকি যাতায়াত করেন।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: এখনও!

বললুম: মানুষ যখন চৌখাম্বা শিখরে উঠেছে, তখন ঐ গিরিসঙ্কট পেরিয়ে কি কেদারনাথে পৌঁছতে পারবে না! তবে আমরা পারব না!

তার পরেই বললুম: শুনেছি এখান থেকেই শুরু হয়েছে মহাভারতের মহাপ্রস্থানের পথ। বলে স্বর্গের সোপান স্বর্গারোহণী। ধাপে ধাপে ঐ পথে উঠে ছিলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। দেবরাজ ইন্দ্র এসেছিলেন তাঁর রথ নিয়ে।

স্বাতি বলল: ইন্দ্রের অমরাবতী কি এই দিকেই?

বললুম: এ কথা কেউ বলে নি। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে তিব্বতেই ছিল ইন্দ্রের বাসভূমি। বিষ্ণুর আশ্রম বদরিকাশ্রমে, অলকাপুরীতে কুবের, শিব কৈলাসে। বাকি রইলেন ইন্দ্র ও ব্রহ্মা। ব্রহ্মলোক সুমেরু পর্বতে। যে পর্বত উত্তর মেরুতে নয়, সে হিমালয়েরই এক গিরিশৃঙ্গ। কেদারনাথের উত্তরে এই শৃঙ্গ ২৩৭৭০ ফুট উঁচু। মেরু পর্বত তপোবনের দক্ষিণে। আর এরই নিকটে ছিল অমরাবতী। হিমালয়ে কিন্নর দেশ আমরা জানি শতদ্রু নদীর উপত্যকায় কিন্নর কৈলাস তিব্বত সীমান্তের কাছে। সিমলা থেকে নারকাণ্ডা রামপুর হয়ে এইখানে পৌঁছতে হয়। আর গন্ধর্বদের বাস ছিল মানা গ্রামে। অপ্সরারাও বোধহয় এই অঞ্চলেই থাকত। রাবণ কৈলাসে যাবার পথে রম্ভাকে দেখেছিলেন কুবেরপুরী অলকাপুরী যাবার পথে। গন্ধর্ব ও অপ্সরারা এখান থেকেই যেত ইন্দ্রের অমরাবতী। অমরাবতীর অবস্থান আমাদের আবিষ্কার করতে হবে।

স্বাতির দৃষ্টিতে আমি এক অদ্ভুত বিস্ময় দেখলুম। বললুম: এই পৃথিবীতেই ছিল স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল—হিমালয় ভারতবর্ষ ও ভারত মহাসাগর। হিমালয়বাসী ইন্দ্র এই ত্রিলোকের রাজা ছিলেন। কখনও কখনও ভারতবাসী কোন অসুর এই ত্রিলোক জয় করত। হিমালয় ও ভারতের অধিকার নিয়েই হত দেবাসুরের যুদ্ধ, আর রত্ন লাভের জন্য সমুদ্র মন্থন। এ সব পুরাণের তৈরি গল্প নয়, এ আমাদের প্রাচীন ইতিহাস।

২৮

রাত্রে আমরা খুব আরামে ঘুমোলুম। নিচে কম্বল বিছিয়ে তার উপরে শুয়েছিলুম আমরা। উপরে নিজেদের কম্বল, আর তার উপরে ভাড়া করা লেপ। ভেবেছিলুম যে এই লেপ গায়ে দিতে পারব না। কিন্তু নতুনের গন্ধ পেয়ে সব সঙ্কোচ কেটে গেল। নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম যে এ লেপ বেশি লোকের ব্যবহৃত নয়। ঘুম যখন ভাঙল, ঘরের মধ্যে অন্ধকার তখনও ঘনিয়ে আছে। বাহিরে আকাশ পরিষ্কার হয়েছে ভেবে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লুম।

স্বাতি বোধ হয় জেগেই ছিল। বলল : বাইরে বেরোবে বুঝি ?

গত সন্ধ্যার ভদ্রলোকের কথা আমার মনে পড়ল। বললুম : নীলকণ্ঠ পাহাড় দেখব।

এখন কি দেখা যাবে !

বলে স্বাতিও উঠে পড়ল। গরম জামা কাপড় গায়ে দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

বারান্দায় বাতি জ্বলছিল। সেই আলোয় আমরা নিচে নেমে এলুম। কিন্তু চারি দিকের অন্ধকার এখনও স্বচ্ছ হয় নি। পাহাড়ের গায়ে বদ্রীনাথ শহর এখনও অন্ধকারেই মিলিয়ে আছে।

দেখ, দেখ !

বলে স্বাতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

উপরে পাহাড়ের একটা অংশ দেখলুম ঝকমক করছে। চাঁদের মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, অথচ চাঁদ নয়। স্বাতি আমার হাত ধরে টানল, বলল : এই দিকে এসো।

সাবধানে পা ফেলে ফেলে আমরা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছলুম যেখান থেকে অনেকটা আলো দেখা যাচ্ছে। সামনে কালো পাহাড়। একটু একটু করে স্বচ্ছ হতে লাগল অন্ধকার, আর

স্পষ্টতর হল উপরের পাহাড়। চোখের সামনে ফুটে উঠল নীলকণ্ঠ পাহাড়ের তুষার শৃঙ্গ। ভোরের আলো সেখানেই পৌঁছেছে সকলের আগে, ধীরে ধীরে এই আলো নিচে নামবে। বিস্ময় ও আনন্দ নিয়ে আমরা এই সোনার পাহাড় দেখলুম। মনে হল, চোখের সামনে যেন জীবন্ত দেবতাকে দেখতে পাচ্ছি।

স্বাতি তার ক্যামেরা এনেছিল সঙ্গে, বলল: এইবারে একটা ছবি নিই!

বললুম: আর একটু পরে।

কেন?

সোনার পাহাড় এবারে রূপোর পাহাড় হবে, তখন তোমার ক্যামেরায় আরও ভাল করে ধরা দেবে।

তবে এসো, এর চেয়েও একটা ভাল জায়গা খুঁজে বার করি।

একটা পছন্দ মতো জায়গা খুঁজে বার করে স্বাতি ছবি তুলল। তার পরে ক্যামেরা বন্ধ করে বলল: এখন আমরা বদ্রীনাথ থেকে ফিরতে পারি।

আশ্চর্য হয়ে বললুম: আজই ফিরবে!

থেকে আর করব কী!

আমি জানি, স্বাতির মন টেনেছে কেদারনাথে। সে এখন কেদারনাথে যেতে চায়। তাই আমি প্রতিবাদ না কবে বললুম: সেই ভাল।

বদ্রীনাথের দ্বিতীয় বাস যে পৌনে নটায় ছাড়ে তা শুনেছিলুম। রুদ্রপ্রয়াগে এই বাস বিকেল পাঁচটার পরেই পৌঁছবে। রাতে কোথাও ঘুমিয়ে আমরা ভোর বেলায় কেদারনাথ যাত্রা করতে পারব। কিন্তু বাসে আমরা জায়গা পাব তো!

রেস্ট হাউসের চৌকিদার বলল, ফেরার বাসে এখন জায়গার অভাব হবে না। যাত্রী এখন বদ্রীনাথে আসছে, ফিরছে না।

কিন্তু বদ্রীনাথে তো যাত্রী বসবাস করতে আসে না। তাই

চৌকিদারের কথায় ভরসা পেলুম না। মালপত্র নিয়ে একটু তাড়াতাড়ি আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে গেলুম।

অনেকগুলো বাস ছাড়ছে। কাজেই সামান্য চেষ্টা করেই জায়গা পেয়ে গেলুম। সঙ্গী পেলুম এক ডাক্তার দম্পতিকে। তাঁদের সঙ্গে একটি কচি মেয়ে, এখনও বসতে শেখে নি। বাপ মায়ের কোলেই সারাক্ষণ থাকে।

পরিচয় হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি পৌরিতে সরকারী ডাক্তার। বোধ হয় শ্রীনগরে একটা মিটিংএ যোগ দিতে এসেছিলেন। দু দিন ছুটি নিয়ে বদ্রীনাথ দেখে গেলেন। তাঁর সরকারী গাড়ি ঐ অঞ্চলেই অপেক্ষা করছে। বাস থেকে নেমে নিজের গাড়িতে চেপে পৌরিতে ফিরে যাবেন।

পৌরি ও ল্যান্সডাউনের কথা আমরা এঁর কাছেই শুনলুম। শ্রীনগর থেকে উনিশ মাইল দূরে পৌরি শহর গাড়োয়াল জেলার সদর, কাণ্ডোলিয়া পাহাড়ের গায়ে সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গ খুব সুন্দর দেখা যায়। ভাল হোটেল বা টুরিস্ট বাংলো থাকলে চমৎকার শৈলাবাস হত। ল্যান্স-ডাউন এখান থেকে বাহাত্তর মাইল দূরে কোটদ্বারের কাছে। এর উচ্চতা ৫৬০০ ফুট। আর এখান থেকে চৌখাম্বা শিখরে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ শৃঙ্গ সুন্দর দেখা যায়।

আরেকটি নতুন কথাও শুনলুম ডাক্তারের কাছে। কণ্ব মুনির আশ্রম নাকি কোটদ্বারের নিকটেই ছিল। হরিদ্বারের পথে আট মাইল দূরে মালিনী নদীর তীরে। এই পথে আরও আটাশ মাইল এগিয়ে গেলে হরিদ্বার। এ কথা নাকি স্কন্দ পুরাণের কেদারখণ্ডে আছে। এও বললেন যে পৌরাণিক যুগে কেদারবদরী অঞ্চলের হিমালয়কেই বলত কৈলাস আর বদরী বনের নাম ছিল গন্ধমাদন।

বাস স্টার্ট করতে এখানে বেশ বেগ পেতে হয়। শীতে যেন জমে যায় ভিতরের ইঞ্জিন। খানিকক্ষণ ঠেলাঠেলি না করলে স্টার্ট

নেয় না। এই রকম কসরৎ করেই বাসগুলো সময় হবার আগেই ছাড়তে লাগল। স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: এখনও তো অনেক সময় বাকি আছে!

স্বীকার করলুম: এদের কায়দা কানুন ঠিক বুঝতে পারছি না।

কিন্তু গাড়িগুলো বেশি দূর গেল না। খানিকটা এগিয়েই সার বেঁধে দাঁড়াল। জানতে পারলুম, বদ্রীনাথের গেট এইখানে। নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত গাড়ি এইখান থেকে ছাড়বে। তার দেরি আছে বলে আমরা নেমে পড়লুম।

প্রসন্ন রৌদ্রে রাজপথ তখন ঝলমল করছে। কোন দুর্ভাবনা নেই, এমন উজ্জ্বল পরিবেশে কোন দুর্ভাবনার কথা মনে আসে না। আমরা সামনের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেলুম। ডাক্তার ভদ্রলোক তাঁর বাচ্চাকে নিয়ে নেমেছিলেন। তিনিও আমাদের সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে পথের ধারে একখানা পাথরের উপরে বসলেন। আমরা ফিরে এলুম।

ঠিক এই সময়ে বাসগুলো গর্জন করে উঠল।

ব্যাপার কী!

গেট।

কই, ওধার থেকে তো কিছু এল না!

কিন্তু কথা বলার সময় নেই। দেরি হলেই বাস ছেড়ে চলে যাবে। যাত্রীরা হুড়মুড় করে বাসে উঠতে লাগলেন। ডাক্তার ভদ্রলোক তাঁর বাচ্চাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠবার চেষ্টা করতেই পা পিছলে পড়ে গেলেন। বাচ্চাকে বাঁচালেন কোন রকমে, তার পরে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কোন রকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে বাসে উঠলেন।

তাঁর স্ত্রী বোধ হয় ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছিলেন। বললেন: চোট লাগে নি তো?

ডাক্তার গম্ভীর মুখে বললেন: না।

ওমা, লাগে নি কি গো! তোমার হাঁটুটা দেখ তো!

বলে বাচ্চাকে নিজেই কোলে নিলেন।

এক নজরে আমিও দেখতে পেলুম যে তার হাঁটুর কাছে প্যাণ্ট ছিঁড়ে গেছে। ভদ্রলোক দেখলেন, কিন্তু কিছু বললেন না।

এবারে আমরা নিচে নামছি। পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে নিচে নামতে হয়েছে। ঘন ঘন পাক খাচ্ছে গাড়ি। এক সময়ে সেই ধ্বসের জায়গাটা আমরা পেরিয়ে গেলুম। এখনও তেমনি বিপজ্জনক আছে, এখনও চোখ বুঁজে দুর্গা নাম জপ করতে হয়। তার পরে হনুমান চটি। গত কালের কথা আমার মনে পড়ে গেল। দুর্ভাবনার জন্য মহাবীর মন্দির দেখবার কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলুম।

এর একটু পরেই ডাক্তার দম্পতির দিকে আমার চোখ পড়ল। ভদ্রমহিলা বসেছিলেন জানালার ধারে। বাচ্চাকে ডাক্তারের কোলে দিয়ে জানালার বাইরে বারে বারে মুখ বাড়াচ্ছিলেন। বুঝতে পারলুম যে পাহাড়ী পথে ঘুরপাক খেয়ে তাঁর বমির ভাব হচ্ছে। স্বাতিও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল: কোন ওষুধ দেন নি?

ডাক্তার বললেন: অ্যাভোমিনে কোনও ফল হয় না।

স্বাতি বলল: আমার কাছে স্টেমাটিল আছে।

বলে নিজের ব্যাগ থেকে ওষুধ বার করে ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে দিল। ডাক্তার দ্বিধার সঙ্গে নিয়ে বললেন: এতে কি কাজ হবে!

কিন্তু কাজ হল। যোশীমঠে পৌঁছবার আগেই ভদ্রমহিলা সুস্থ বোধ করলেন। তাঁর স্বামীকে বললেন: তোমার পা তো ছড়ে গেছে, একটা কিছু লাগিয়ে নাও।

ডাক্তার চুপ করে রইলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: সঙ্গে ওষুধ আছে তো?

ডাক্তার একটু লজ্জিত ভাবে বললেন: বাক্সে আছে।

সে বাক্স তো বাসের ওপরে।

ডাক্তার উত্তর দিলেন না।

স্বাতি একটুখানি হেসে তার ব্যাগ খুলল। একটি ছোট রবারের শিশি বার করে বলল : এই নিন।

লজ্জিত ভাবে ডাক্তার এটিও হাতে নিলেন। বললেন : যোশী-মঠে পা ধুয়ে লাগিয়ে নেব।

যোশীমঠে একটা খাবারের দোকানের সামনে এসে বাস দাঁড়াল। মিনিট পনর দাঁড়াবে। যা পাওয়া যায়, তাই খেয়ে নেওয়া উচিত ভেবে আমরা নেমে পড়লুম। এর পরে কোথায় কতক্ষণ দাঁড়াবে জানি নে। পেটের দুশ্চিন্তা আছে, তা মনে না রাখলেই ডাক্তারের মতো বিপদ। কর্ণপ্রয়াগের কথা ভেবে আমরা ছুটে গিয়ে দোকানে ঢুকলুম।

পুরি তরকারি আর দই পাওয়া গেল, মিষ্টিও আছে। দোকানদার জিজ্ঞাসা করল : চা ?

স্বাতি বলল : না।

আর আমি বললুম : ভাঁড়ে দিলে বাসে বসে খাব।

তাতেই রাজী হল তারা। পয়সা মিটিয়ে আমরা বাসে উঠে বসলুম। অল্পক্ষণ পরেই চায়ের ভাঁড় পেলুম হাতে।

ডাক্তারকে এতক্ষণ দেখতে পাই নি। এইবার দেখলুম যে কিছুটা প্রসন্ন মনে ফিরে আসছেন। বাসে উঠে বললেন : আপনার এই পাউডার খুব কাজ দিল।

মনে মনে আমি বললুম : যাত্রীরা ডাক্তারের কাছেই এ সব আশা করে। কিন্তু স্বাতি বলল : বেড়াতে বেরোলে আমরা ফার্স্ট এডের সরঞ্জাম সঙ্গে রাখি।

বাস সময় মতো ছাড়ল। পরিচিত পথে আমরা কর্ণপ্রয়াগ পর্যন্ত ফিরব। তার পরে নতুন পথ। স্বাতি বলল : নতুন পথে চলার আনন্দ অন্য রকমের, তাই না ?

বললুম : এর পরে তো সবই নতুন পথ।

স্বাতি বলল : রানীখেত হয়ে আমরা নিশ্চয়ই ফিরব না!

না।

তবে কি মসুরি হয়ে ফিরব ?

মসুরির কথায় আমার পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। গত পুজোর কথা নয়, তার আগের বছরের পুজো। মনোরঞ্জনের সঙ্গে আমি হরিদ্বারে এসেছিলুম। ঋষিকেশের গীতাভবনে দ্বিতীয় বার দেখা হয়েছিল এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে। আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, এইখান থেকে কি মসুরি যাবেন ?

আশ্চর্য হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কেন বলুন তো ?

তিনি বলেছিলেন, আত্মীয় বন্ধু কেউ এখন আছেন না সেখানে ?

আমার মনে হয়েছিল, তিনি আমাকে মসুরি যেতে বলছেন। বলছেন, সেখানে গেলে কোন আত্মীয় কিংবা বন্ধুর সাক্ষাৎ পাব।

সেদিন আমার আত্মীয় কোথায় ? বন্ধুই বা কে ? তবে কি স্বাতিরা এখন মসুরিতে আছে!

হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশে আসবার পথে সেই ভদ্রলোকই আমাকে বলেছিলেন, সাধারণ বেশে অনেক মহাপুরুষ এ দিকে ঘুরে বেড়ান। তার পরেই হেসে বলেছিলেন, আমাকে যেন সে রকম কিছু ভাববেন না।

ভদ্রলোককে বড় রহস্যময় মনে হয়েছিল আমার। কে মহাপুরুষ আর কে নন, তা কি বেশ দেখে চেনা যায়!

মনোরঞ্জন আমার মসুরি যাবার কথা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, কপালে তোমার অনেক দুঃখ আছে।

আর আমি ভেবেছিলুম, দুঃখ তো সুখেরই ভূমিকা।

পর দিন ভোর বেলায় আমি হরিদ্বার ত্যাগ করেছিলুম। দেরাদুন থেকে বাসে গিয়েছিলুম মসুরি। তখন জানতুম না যে

ঋষিকেশ থেকেও বাসে বা ট্যাক্সিতে দেরাহুন যাওয়া যায়, কিংবা আরও উত্তরে গিয়ে টেহবি থেকেও মস্থুরির বাস পাওয়া যায়।

কিন্‌ক্রেগ নামে একটা জায়গায় বাস থেকে নেমে জেনেছিলুম যে এখান থেকে হু দিকে হুটো রাস্তা গেছে। একটা লাইব্রেরিব দিকে, আর একটা ল্যাণ্ডরে। এই হুটি মস্থুরির হুই প্রান্ত, একটি প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে যুক্ত। তারই উপবে বাজার হাট হোটেল সিনেমা। কিন্তু যাত্রীরা কেউই এই হুই পথে গেলেন না। আমি তাঁদের সঙ্গে একটা পায়ে চলা পথে ধাপে ধাপে উপরে উঠে গেলুম।

আমার সঙ্গে মস্থুরির একটা টুরিস্ট ফোল্ডার ছিল। তাতে আমি দ্রষ্টব্য স্থানের পরিচয় মোটামুটি দেখে নিয়েছিলুম। একদিকে লালটিব্বা আট হাজার ফুট উঁচু, অন্য দিকে ক্যামেল্‌স ব্যাক গান হিলের পিছনের রাস্তা। গান হিল সাত হাজার ফুট উঁচু একটি পাহাড়—তার উপর থেকে হিমালয়ের বরফ দেখা যায় স্থন্দর ভাবে। প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে কেম্পটি ফল্‌স্। এই জলপ্রপাত হু শো ফুট উপর থেকে পাঁচটি ধারায় নিচে নেমেছে। মসি ফল্‌স্ ও হিয়ারসে ফল্‌স্ও স্থন্দর দেখতে। মাছের জন্মে যেতে হয় অ্যাগলার ভ্যালি। সবই দূরে দূরে, কিংবা পাহাড়ের উপরে। এ সব দেখবার মতো প্রচুর সময় আমার হাতে ছিল না, উৎসাহও ছিল না। আমি যে জন্মে ছুটে এসেছিলুম, তার হদিস পাব কেমন করে তাও জানা ছিল না।

আমি জানতুম যে কোন অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে স্বাতির দেখা পাওয়া যাবে না। না, কারও দেখাই পাই নি। ফেরার পথে যখন ভাবলুম যে একটা ছোটখাট হোটেলে ঢুকে কিছু খেয়ে নেব, তখনই ঘটনাটা ঘটেছিল।

হ্যালো গোপালবাবু! বলে চাওলা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তার সঙ্গে মিত্রাও ছিল। বিয়ে করে তারা হনিমুনে এসেছিল মস্থুরি। কাল ফেরার কথা ছিল। বাসে জায়গা ছিল না বলে আজ তারা ট্যাক্সিতে ফিরছে।

আমার বুকের ভিতর এক রকম অদ্ভুত বেদনা গুমরে উঠেছিল। কাল দুপুর বেলায় বোধ হয় ঠিক এই সময়েই ভদ্রলোক আমাকে মসুরির কথা বলেছিলেন।

এরাই আমাকে দিল্লীতে টেনে নিয়ে গেল। দেখা হল স্বাতির সঙ্গে। সেখান থেকে তাদের সঙ্গেই গেলুম হিমাচলে ও কাশ্মীরে। মিত্রার কাছেই সেবারে স্বাতির মনের কথা শুনেছিলুম। মিত্রাকে নাকি সে বলেছিল, রাজার ঘরে যতক্ষণ, ততক্ষণই সে রাজকন্যে। সেকালে রাজকন্যারা যখন মুনিঋষিকে বিয়ে করত, তখন কি আর কেউ তাদের রাজকন্যে বলত! স্বাতি নাকি এও বলেছিল যে রাজার ঘরের রাজকন্যের জন্যে আমাদের কোন দুঃখ নেই, যখন সে ঘুঁটে-কুড়োনির মতো ঘুঁটে কুড়োয় তখন আর সে রাজকন্যে নয়। তখন সে আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ। তারও দুঃখ বেদনার জন্যে আমরা দায়ী হব। বলেছিল, মনের মিলনের জন্যে তো কোন উপ-ঢৌকনের প্রয়োজন নেই, অর্থ প্রতিপত্তি কেন তার প্রতিবন্ধক হবে!

মিত্রা আমাকে স্বাতির সম্বন্ধে আর একটি কথা বলেছিল। অস্পষ্ট ভাবে বলেছিল, গোপালবাবু আপনি তাকে ভুল বুঝবেন না।

কোন দিন কি আমি স্বাতিকে ভুল বুঝেছি!

স্বাতি আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল: ঘুমিয়ে পড়লে নাকি!

সত্যিই আমি খুব অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। চমকে জেগে উঠে বললুম: না।

স্বাতি হেসে জিজ্ঞাসা করল: কী ভাবছিলে বল তো?

তোমার কথা।

আমার কথা, না তোমার কথা?

দুজনের কথাই।

আমাদের বাস যোশীমঠে পৌঁছবার আগে পাণ্ডুকেশ্বরে দাঁড়িয়েছিল মিনিট পাঁচেকের জন্যে। যোশীমঠের পরে বেলাকুচিতে

পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে পিপলকোটিতে এসে পৌঁছল প্রায় পৌনে একটার সময়। এখানে প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়াবে। যাত্রীরা খাবে এইখানে, তার পর ও ধারের বাস এসে পৌঁছবার পরে চামোলির দিকে যাত্রা করবে।

এই খবর পেয়ে স্বাতি বলল : এ কথা আগে জানা থাকলে যোশীমঠে না খেয়ে আমরা এখানেই খেতে পারতাম।

আমি বললুম : এখন যা পারি, তা হল রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত না গিয়ে—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : চামোলিতে নামব না। ওটাও নতুন মোটর পথ। হনুমান চটির মতো পথে কোনখানে আটকে পড়তে পারি।

গড়িয়েও পড়তে পারি নিচে।

ছি ছি, তীর্থের পথে এমন অলক্ষুণে কথা বলতে নেই।

আমি কোন উত্তর দিলুম না। কিন্তু পরে এই পথে বাস দুর্ঘটনার কথা কাগজে পড়েছিলুম। বহু যাত্রীর প্রাণহানি হয়েছিল। কিন্তু তার জন্যে ভয় পাবার কিছু নেই। পথে দুর্ঘটনা ঘটেই। রেলে দুর্ঘটনা ঘটছে, উড়োজাহাজও ভেঙে পড়ছে। তার জন্যে ভয়ে কেউ ঘরে বসে থাকছে না।

কিছু দিন পরে আরও একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা কাগজে পড়েছিলুম। সে হল বিরেহী নদীর বন্যার কথা। বিরেহী গঙ্গা। ১৯৭০ সালের বর্ষায় গোহ্‌লা লেকের বাঁধ ভেঙে সমস্ত জল বিরেহী নদী বেয়ে অলকনন্দায় এসে পড়েছিল। এই বন্যায় পাঁচ মাইলের বেশি পথ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর যাত্রীবাহী চল্লিশখানা বাস কোথায় ভেসে চলে যায় তা কেউ বলতে পারে না। কাগজে আমি নিজে পড়ি নি, শুনেছি অন্য লোকের মুখে। এ কথাও শুনেছি যে গোহ্‌লা লেকের অস্তিত্ব আর নেই। তার বদলে বিরেহী নদীর শীর্ণ ধারা নাকি এখন প্রশস্ত বিরেহী গঙ্গায় পরিণত হয়েছে।

চামোলিতে আমাদের বাস মিনিট দশেক দাঁড়াল। তার পরে কর্ণপ্রয়াগ। এখানে আবার সেই গেট। ও ধারের বাস এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই আমাদের বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। মিনিট পনেরো দাঁড়াবে শুনে আমরা বাস থেকে নেমে চা খেয়ে নিলুম। আর অলকনন্দার সঙ্গে পিণ্ডার নদীর সঙ্গম দেখে নিলুম আর একবার।

এর পরে নতুন পথ। ছ মাইল দূরে গৌচার নামে একটি ছোট জায়গা। ডাক্তার ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে বললেন: বাইরে একটু নজর রেখো। আমাদের গাড়ি দেখতে পেলে এখানেই নেমে পড়ব।

ভদ্রমহিলা বললেন: বাস যদি না দাঁড়ায়?

দাঁড়াবে না!

তোমার ড্রাইভারকে কী বলেছ?

ডাক্তার এবারে ফাঁপরে পড়লেন। কিন্তু তা এড়িয়ে যাবার জন্যে বললেন: ঠিক আছে, আমরা রুদ্রপ্রয়াগেই নামব।

শুনলুম আমরা এখন তিন হাজার ফুটে নেমে এসেছি। চামোলি থেকেই উচ্চতা এই রকম—ওঠা-নামা খুবই অল্প। রুদ্রপ্রয়াগ আরও এক হাজার ফুট নিচে।

গৌচার ছোটখাট শহর একটি। কালিকম্‌লিওয়ালার ধর্মশালা আছে। কিন্তু তার প্রয়োজন এখন আর নেই। অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে এখানে একটি মেলা হয়। চামোলি জেলার প্রদর্শনী মেলা এক সপ্তাহ চলে। থানা ও নিতি উপত্যকা থেকে ভোটিয়ারাও ব্যবসা করতে নেমে আসে। কিন্তু গৌচারে আমরা দাঁড়ালুম না, রুদ্রপ্রয়াগের দিকে এগিয়ে গেলুম। এখান থেকে চোদ্দ মাইল দূরে রুদ্রপ্রয়াগ।

কখন এক সময় সূর্য ডুবে গিয়েছিল খেয়াল করিনি। আমাদের বাস ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। রুদ্রপ্রয়াগে এই বাস পাঁচ মিনিট দাঁড়াবে। বাইশ মাইল দূরে শ্রীনগরে তার যাত্রাভঙ্গ। সন্ধ্যা পৌনে সাতটার আগেই তাকে সেখানে পৌঁছতে হবে।

২৮

আমরা যখন রুদ্রপ্রয়াগে এসে পৌঁছলুম তখন অন্ধকার নেমেছে। পথের ধারের দোকান পাটে বিজলির বাতি জ্বলছে। বাস এসে বাজারের মধ্যে দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লুম। জিনিসপত্র নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লুম আমরা।

ডাক্তারের ড্রাইভার এইখানে অপেক্ষা করছিল। তাকে দেখতে পেয়ে তাঁরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। আমাদের নমস্কার কবে বিদায় নিলেন অবিলম্বে।

স্বাতি বলল : বাতে থাকবাব একটা ভাল জায়গা দেখতে হবে।

বললুম : ডাক বাংলোয় আগে চেষ্টা করব।

তাহলে তুমি এগোও, জিনিসপত্র নিয়ে আমি এইখানে অপেক্ষা করছি।

ডাক বাংলো বেশি দূরে নয়। বড় রাস্তার ধারেই প্রশস্ত এলাকার মধ্যে বেশ ভাল ব্যবস্থা বলেই মনে হল। কিন্তু চৌকিদার বলল, জায়গা পাওয়া যাবে না। তার কাবণ আমরা আগে থেকে রিজার্ভ করি নি।

জায়গা থাকতেও দেবে না ?

না।

চৌকিদারের সঙ্গে তর্ক করা চলে না। তার ওপরওয়ালা কে, কোথায় থাকে, এ সব জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তিও হল না। গেট খুলে আমি বেরিয়ে এলুম। আর সেই সঙ্গেই নমস্কার পেলুম একজন অপরিচিত লোকের। সে বলল : আসুন, ফরেস্ট রেস্ট হাউসে আপনি একটা ঘর পেতে পারেন।

বলে বাজারের দিকে ফিরবার পথেই একটু উঁচু জায়গার উপরে সেই রেস্ট হাউসটি দেখাল। বলল : আসুন।

খানিকটা উপরে উঠে রেস্ট হাউস দেখলুম। একটা ঘরে লোক আছে, তারা ঘরের ভিতরে। পাশের ঘরটা খালি, দুটো খাটিয়া। পিছনের দিকে বেরিয়ে বাথরুম, সেটা দুটো ঘরের জন্যেই। কিন্তু বাতি জ্বলছে না। আমি বললুম: চৌকিদার কোথায়?

লোকটি বলল: আমিই কেয়ার টেকার। আপনার মালপত্র নিয়ে আসব?

বললুম: তুমি আনবে কী করে?

সে বলল: মেম সাহেবকে খবর দেব।

বুঝতে পারলুম যে লোকটা আমাকে বাস স্ট্যাণ্ড থেকেই অনুসরণ করছে। বললুম: থাক, আমিই ডেকে আনছি। তুমি বরং একটা বাতির ব্যবস্থা কর।

বলে উপর থেকে নামবার সময়েই চমকে উঠলুম। জিনিসপত্র নিয়ে স্বাতি এই দিকেই আসছে। তার সঙ্গে আর একজন মানুষ। চলনটি পরিচিত মনে হচ্ছে, কিন্তু অন্ধকারে চিনতে পারছি না।

স্বাতির কথা শুনতে পেলুম না, কিন্তু ভদ্রলোকের উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। বললেন: জায়গা দখল করা গোপালবাবুর কম্ম নয়। জায়গা নেই বললেই ফিরে আসবেন, কিন্তু কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদার সে পাত্র নয়। ঘর খালি করিয়ে ঘরে ঢুকবে।

রুদ্রপ্রয়াগে যে হালদার মশায়ের দেখা পাব, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে উঠে আমি বললুম: এই দিকে হালদার মশাই, ওপরে উঠে আসুন।

আমাদের কেয়ার টেকারের হাতে একটা টর্চ ছিল। সে তার আলো ফেলল উপরে ওঠার পথের উপরে। আর কুলিকে ডাকল তার নিজের ভাষায়।

রুদ্রপ্রয়াগের শীতল বাতাস তখন শিরশির করে গায়ে লাগছে। সারা দিন বাসে ধকলের পরে এই বাতাস খুব আরামপ্রদ মনে হচ্ছে।

স্বাতির হাতে একটি ছোট টর্চ দেখতে পেলুম, তার আলো পড়েছে উপরের দিকে। হালদার মশাই বললেন: পথ কোথায়?

উপর থেকে আমি বললুম: ধীরে ধীরে উঠে আসুন।

তিনি থমকে দাঁড়ালেন। প্রথমে কুলি উঠল, তার পিছনে তিনি। তাঁর পায়ের উপরে আলো ফেলে সবার শেষে উঠল স্বাতি। এ কোনও পাহাড় নয়, টিলাও নয়। পথের ধারে খানিকটা উঁচুতে এই রেস্ট হাউস। কিন্তু আসলে অনেকখানি সমতল জমি।

ঘরে ঢুকে স্বাতি বলল: আর একখানা খাটিয়া চাই যে!

হালদার মশাই বললেন: দুখানায় হবে না?

আমরা তিন জন মানুষ, দুখানায় শোব কী করে?

হালদার মশাই বিহ্বল ভাবে তাকালেন আমার দিকে।

আমি বললুম: এ তো তক্তপোশ নয় যে জুড়ে নিয়ে তিনজন শোব!

হালদার মশাই যেন এতক্ষণে বুঝতে পারলেন যে আমরা তাঁর কথা ভাবছি। হা-হা করে হেসে উঠলেন। সেই পুরনো হাসি। কিন্তু এখন এই হাসি আর একটুও খারাপ লাগছে না। বললেন: আমার কথা ভাবছেন! আমি একখানা কম্বল বিছিয়ে এই বারান্দাতেই শুতে পারব। আর এই ভাবেই তো এত দূরে এসেছি!

স্বাতি তার জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে কুলিকে পয়সা দিয়ে বিদায় দিল। তার পরে বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করল: কতো দূর দেখে এলেন হালদার মশাই?

সে অনেক দূর মা। ভগবান অনেক কিছু দেখালেন।

জিজ্ঞাসা করলুম: এখন কি ফিরছেন নাকি?

হালদার মশাই বললেন: যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী দেখে কেদারনাথ যাচ্ছি। তার পরে বদ্রীনাথ দর্শন করে ফিরব।

স্বাতি বলল: তবে তো খুব ভাল হল। এক সঙ্গে আমরা কেদারনাথ দর্শন করব।

হালদার মশাই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

স্বাতি বলল : কী হল হালদার মশাই ?

না মা, তা হয় না।

কেন ?

তোমরা ফিরে এলে আমি যাব।

আমি হালদার মশায়ের হাত ধরে বললুম : আসুন আসুন। আগে একটু চা খেয়ে আসি। তার পরে ব্যবস্থা পাকা করা যাবে।

বলে সবাই আমরা নিচে নেমে বাজারের একটা চায়ের দোকানে এসে বসলুম।

স্বাতি বলল : মনে আছে হালদার মশাই, আপনার কাছে আমরা অমরনাথের গল্প শুনেছিলাম! এইবারে গঙ্গোত্রী আর যমুনোত্রীর গল্প শুনব।

হালদার মশাই গর্বিত ভাবে বললেন : গঙ্গোত্রীর গল্প তো শুনতেই হবে, এ যাত্রায় গঙ্গোত্রী দেখা তোমাদের হবে না।

কেন ?

উত্তরকাশীর পরে পথ এমন ভেঙেছে যে দু চার দিনে তা মেরামত হবে না। যাত্রীরা গিয়ে গিয়ে ফিরে আসছে। উত্তরকাশীর ধর্মশালায় আর তিলধারণের জায়গা নেই।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : আর আপনি দেখে এসেছেন!

হালদার মশাই হা-হা করে হাসলেন খানিকক্ষণ, তার পরে বললেন : বলেছি তো, ভগবান অনেক কিছু দেখালেন।

আমাদের চা এল। স্বাতি বলল : কিছু খান।

বলে গরম পকোড়া দেবার হুকুম দিল।

হালদার মশাই খুশী হয়ে বললেন : এই জন্যেই মেয়েদের বলে মায়ের জাত। মা হবার আগে থেকেই বাৎসল্য।

স্বাতির মুখ যে আরক্ত হয়ে উঠল, আমার দৃষ্টি তা এড়াল না।

কিন্তু হালদার মশায়ের সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। তিনি বললেন: এই জন্যেই আপনাদের সঙ্গে যেতে চাই নে।

প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্যে আমি বললুম: আপনি যমুনোত্রীর কথা বলুন।

হালদার মশাই অবিলম্বে বললেন: যমুনোত্রী পৌঁছবার পরে পথের কষ্টের কথা আর মনে থাকে না। দেবতার রূপ তো দেখি নি, রূপ দেখলুম তীর্থস্থানের। বুঝলেন গোপালবাবু, এ রূপের যেন তুলনা নেই।

আমি বললুম: একেবারেই যমুনোত্রী পৌঁছে গেলেন! পথের কথা কিছু বলুন।

হালদার মশাই বললেন: ঋষিকেশ থেকে অনেক কষ্টে বাসে উঠেছিলুম। উত্তরকাশীব বাসে। ঋষিকেশ তো দেখেছেন! এখন একেবারে নরককুণ্ড।

স্বাতি বলল: ছি ছি, তীর্থস্থানকে নরক বলবেন না।

তাই বলে তীর্থ করতে বেরিয়ে মিথ্যে কথাও বলতে পারব না! যাত্রীদের এমন ভিড় আর এমন অব্যবস্থা যে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছি। বাসের টিকিট কাটার চেয়ে কলকাতার সিনেমা হলের টিকিট কাটা সোজা।

স্বাতি হাসল তাঁর কথা শুনে। আর হালদার মশাই বললেন: ও দিক দিয়ে আসতে হয় নি বলেই হাসতে পারছ।

আমি বললুম: তার পরে বলুন।

হালদার মশায়ের কাছে শুনলুম এই পথের বর্ণনা। ঋষিকেশ থেকে দশ মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে নরেন্দ্রনগর। চার হাজার ফুট উঁচুতে টেহরি-গাড়োয়াল রাজ্যের এই নতুন রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল ১৯২১ সনে। উপর থেকে নিচের দৃশ্য নাকি খুব মনোরম। এক দিকে গঙ্গার আঁকাবাঁকা স্রোত, অন্য দিকে শিবালিক পাহাড়ে ঘেরা দূন উপত্যকা। কিন্তু এ সব দেখবার সময় হালদার মশাই

পান নি। বাস এত কম সময় দাঁড়ায় যে বাস ছেড়ে কোথাও যাবার সাহস হয় না।

নরেন্দ্রনগর থেকে তেতাল্লিশ মাইল দূরে টেহরি শহর। উপর থেকে বাস নেমে আসে নিচে। এ জায়গার উচ্চতা দু হাজার ফুটেরও কম, ভাগীরথী ও ভীলাঙ্গনা নদীর সঙ্গমের কাছে টেহরি হল টেহরি-গাড়োয়াল রাজ্যের পুরনো রাজধানী। চারি দিক থেকে পথ এসে মিলেছে এইখানে। ঋষিকেশের পথ উত্তরে গেছে ধরাসুর দিকে, ধরাসু থেকে যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রীর পথ পৃথক হয়েছে। টেহরি থেকে মসুরি চল্লিশ মাইল পশ্চিমে, আর শ্রীনগর আটত্রিশ মাইল পূর্বে। পঞ্চম পথ চৌত্রিশ মাইল দূরে দেবপ্রয়াগে পৌঁছেছে। এই পায়ে চলার পথে এখন মোটর চলছে কিনা জানা নেই।

টেহরি থেকে ধরাসু ছাব্বিশ মাইল দূরে। এ জায়গার উচ্চতা ৩৪০০ ফুট। ধরাসুর পথ এসেছে ভাগীরথীর তীরে তীরে, সোজা এগিয়ে গেলে উত্তরকাশী, আর যমুনোত্রীর পথ বাঁ হাতে। মসুরি থেকেও নাকি একটি পায়ে চলার পথ এসেছে ধরাসুতে।

হালদার মশাই বললেন: পথ ঘাটের ব্যাপারটা আগে জানা থাকলে উত্তরকাশীর বাসে উঠতুম না। অকারণে আমাকে ধরাসুতে নামতে হল। তার পরে অনেক কষ্টে পেলুম যমুনোত্রীর বাস, যমুনোত্রী তো যায় না, তার অনেক আগেই দেয় নামিয়ে।

ছোটখাট অনেক জায়গার নাম শুনলুম তাঁর কাছে। তার মধ্যে প্রধান হল বড়কোট। ধরাসু থেকে ছাব্বিশ মাইল দূরে। আজকাল মসুরি থেকেও বাস আসছে। সময় লাগে ঘণ্টা সাতেক। সকাল এগারোটায় রওনা হলে বিকেল ছটায় বড়কোটে পৌঁছনো যায়। আগে বড়কোট পর্যন্তই বাস আসত। আজকাল এই পথ আরও এগিয়ে গেছে। গাংগানির উপর দিয়ে কাথনোর পর্যন্ত বাস যাচ্ছে। বড়কোট যমুনার উপত্যকায়, গাংগানি তিন মাইল দূরে সাত হাজার ফুট উঁচুতে। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যমুনা আর

পাহাড়ের পরপারে বইছে ভাগীরথী। একটি পুষ্করিণীতে নাকি ভাগীরথীর জল আসে গুপ্ত পথে। গাংগানি তাই একটি তীর্থস্থান। মন্দির আছে গঙ্গা যমুনার। রাত্রিবাসের জন্যে ফরেস্ট রেস্ট হাউস আছে, ধর্মশালাও আছে। কাথনোর আরও চার পাঁচ মাইল এগিয়ে।

হালদার মশাই বললেন: বাসের পথ যে রকম দ্রুত এগোচ্ছে, তাতে হাঁটার পথ আরও সংক্ষেপ হবে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দশ বারো মাইলের বেশি হাঁটতে হবে না।

হালদার মশাই ঠিকই বলেছিলেন। কিছু দিন পরেই শুনেছিলুম যে বাসের পথ সিয়ানা চটি পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। যমুনোত্রী সেখান থেকে এগারো মাইলের কিছু বেশি দূরে। কাথনোরের পরে যমুনা চটি আট হাজার ফুট উঁচুতে। আর সিয়ানা চটির পরে হনুমান চটির উচ্চতা দশ হাজার ফুট। কালি-কম্‌লিওয়ালার ধর্মশালা আছে সেখানে।

তার পরে হনুমান গঙ্গার পুল পেরিয়ে চার মাইল দূরে খরশানি গ্রাম। যমুনোত্রীর পথে শেষ গ্রাম এটি। পাণ্ডাদের বাস এইখানে। যাত্রীরা যারা শীতের ভয়ে যমুনোত্রীতে বাস করতে চায় না, তারা এখানেই রাত্রিবাস করে।

যমুনার এ পারে খরশানি আর ও পারে বীফ গ্রাম। এরই নাম মার্কণ্ডেয় তীর্থ। গন্ধকের উষ্ণ প্রস্রবণ আছে একটি। আর যমুনার তীরে চমৎকার পরিবেশ।

আমাদের চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। স্বাতি বলল: আর একটু চা দিক হালদার মশাইকে।

হালদার মশাই হেঁ হেঁ করে হেসে বললেন: আরও!

যে ছেলেটি পেয়ালা নিতে এসেছিল, স্বাতি তাকেই বলল চা দিতে।

হালদার মশাই যেন নতুন উদ্যম পেলেন। বললেন: খরশানির

পরে এক মাইল পথ একেবারে সমতল, তার পরে মাইল দেড়েক চড়াই। শেষ পথটুকু আবার সমতল। দূরত্ব মোট চার মাইল।

হালদার মশাই যা বলেন নি, পরে আমি সে কথাও শুনেছিলুম। ফরেস্ট রেস্ট হাউস আর ধর্মশালা ছিল আগে থেকেই। এখন ট্রাভ্‌লার্স লজ হয়েছে বড়কোট, সিয়ানা চটি আর বীফ গ্রামে। মসুরি থেকে বড়কোটে এসে এই ট্রাভ্‌লার্স লজে রাত্রিবাস করা যায়। তার পর আবার বাসে উঠে সিয়ানা চটি। সেখানেও রাত্রিবাসের ভাল ব্যবস্থা। সকাল বেলায় পায়ে হেঁটে যমুনোত্রী যাত্রা, সাত-আট মাইল দূরেই বীফ গ্রাম। বীফের ট্রাভ্‌লার্স লজে রাত কাটিয়ে এক দিনেই যমুনোত্রী দেখে ফিরে আসা যায়। যাতায়াতে পথ মোটে আট মাইল।

হালদার মশাই বললেন: যমুনোত্রীতেও থাকবার জায়গার অভাব নেই। ফরেস্ট রেস্ট হাউস আছে, আর ধর্মশালাও অনেকগুলি। দশ বছর আগে যাত্রী যেত দশ হাজার, এখন যাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। মোটর পথ এগিয়ে এলে আরও বেশি যাত্রী আসবে।

আর এক পেয়ালা চা এল হালদার মশায়ের জন্যে। স্বাতি বলল: যমুনোত্রীর বর্ণনা একটু দেবেন না?

মুখে এক চুমুক চা নিয়ে হা-হা করে হাসলেন হালদার মশাই। বললেন: আমি কি গোপালবাবু যে যমুনোত্রীর বর্ণনা দেব!

স্বাতি দমল না, বলল: কিছু বলবেন তো!

হালদার মশাই বললেন: যমুনোত্রীর মন্দির নাকি ১০৮০০ ফুট উঁচুতে। কিন্তু মজার কথা হল, আমরা সেই মন্দির দেখলুম ওপর থেকে নিচে যমুনার তীরে। তারই কাছে সব ধর্মশালা।

যমুনোত্রীর কথা আমার মনে পড়ে গেল। ২০৭৩১ ফুট উঁচু বন্দরপুঞ্চ পর্বতমালা চিরতুষারে আবৃত। তারই পশ্চিম ধারের এক হিমবাহ থেকে বেরিয়েছে এই যমুনা। চার মাইল উপরে এই হিমবাহ। তারই তলদেশ দিয়ে যমুনার ধারা গলে নেমে আসছে।

মাইল খানেক দূরে জাহ্নবী ও যমুনা জলপ্রপাতের মিলনের দৃশ্যও নাকি যমুনোত্রী থেকে দেখা যায়।

হালদার মশাই বললেন: চারি দিক পাহাড়ে ঘেরা বলে জায়গাটা খুব ঠাণ্ডা। তাই এখানে পাণ্ডার বাস নেই। তারা খরশানি গ্রাম থেকে এসে যাত্রীদের পূজা পাঠ করিয়ে ফিরে যায়। কিন্তু যাত্রীরা সবাই ফেরে না। যমুনার তীরে কয়েকটি গরম জলের কুণ্ড আছে। ফুটন্ত জল। চাল ডাল আলু গামছায় বেঁধে জলে ফেলে দিলেই সেদ্ধ হয়ে যায়।

ভারি আশ্চর্য তো!

ঠিক এ রকমটি আর কোথাও দেখি নি।

স্বাতি বলল: মন্দিরটি খুব সুন্দর তো!

হালদার মশাই ঠোঁট উল্টে বললেন: ছাই সুন্দর।

আমরা আশ্চর্য হলুম তাঁর কথা শুনে। তাই দেখে বললেন: একখানা ছাপরা ঘরের মতো। চার কোণার বদলে তাকে সাত আট কোণা করে একখানার উপরে আর একখানা চালা দিয়ে চূড়ো লাগিয়ে তাকে মন্দিরের আকার দেওয়া হয়েছে। তারই ভেতর যমুনার মূর্তি।

তার পরে হালদার মশাই যা বললেন, তা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। বললেন: কিন্তু মন্দির দেখতে তো এখানে কেউ আসে না। আর যমুনার মূর্তি দেখতেও না। যাত্রীদের চোখের সামনে হলেন সাক্ষাৎ যমুনা। বরফের পাহাড় থেকে প্রচণ্ড ধারায় নেমে আসছেন। যমুনার এই রূপ কি আমরা মন্দিরের মূর্তির মধ্যে দেখতে পাই! বাইরের যমুনাই হলেন প্রত্যক্ষ দেবতা।

খুব সত্য কথা। দেবতা এখানে বড় নয়, বড় এই সুন্দর পৃথিবী। যা সুন্দর, তাই তীর্থ। সুন্দরের সাধনা করেই আমরা দেবতাকে পাই। দেবতাও যে সুন্দর!

১০

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে স্বাতি বলল : আপনার জিনিস-পত্র কোথায় হালদার মশাই ?

হালদার মশাই বললেন : কিন্তু মা, আমি তো তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব না।

কেন ?

এই বুড়ো সঙ্গে থাকলে পদে পদে তোমাদের রস ভঙ্গ হবে।

আমি হেসে বললুম : তা হোক।

হালদার মশাই বললেন : একটা কথা দেবেন ?

বলুন।

কথা দেবেন বলুন, তবেই বলব।

আমি ইতস্তত করছি দেখে বললেন : ভয় পাচ্ছেন কেন ! আমি কি আপনাকে খেয়ে ফেলতে চাইব !

স্বাতি বলল : আমি আপনার কথা রাখব।

উহুঁ, আমি গোপালবাবুর কাছে কথা চাই।

বলে আমার দিকে তাকালেন। আর কোনও উপায় না দেখে বললুম : রাখব আপনার কথা।

হালদার মশাই যেন আনন্দে গলে গেলেন, বললেন : আপনাদের এই ভ্রমণকে কি যেন বলে ! মানে—কী চাঁদ ?

স্বাতি বেশ লজ্জা পেয়েছিল। তাই তা ঢাকবার জন্যে একটু ধমকের সুরেই বলল : যাই বলুক। আপনি কী চান তাই বলুন না।

হালদার মশাই সকৌতুকে বললেন : নতুন বিয়ে করে ছেলে মেয়েরা নির্জন পাহাড়ে যায়, সমুদ্রের ধারে পৌঁছয়, কিন্তু কেদারনাথে কেউ যায় না।

স্বাতি খিল খিল করে হেসে বলল : কেদারনাথ কি হনিমুনের জায়গা !

হালদার মশাই বললেনঃ আমি তো সেই কথাই গোপাল-বাবুকে বলছি। কেদারনাথের বর্ণনা এমন করে দেবেন যেন বিয়ে করেই তারা কেদারনাথে ছোটে।

আমি হেসে বললুমঃ আপনি একটু সাহায্য করবেন লেখার সময়।

আমি!

বলে হালদার মশাই হা-হা করে হাসতে লাগলেন। তার পরে একটুখানি এগিয়েই একটা দোকান থেকে তাঁর কম্বল আর ঝোলাটি সংগ্রহ করে নিলেন। বললেনঃ চলুন এবারে।

স্বাতি বললঃ আবার আমাদের বাজারে আসতে হবে।

কেন?

রাতে কিছু খেতে হবে তো!

হালদার মশাই বললেনঃ এর পরে কপালে কী জুটবে জানা নেই তো, খাবার লোভ এখানেই মিটিয়ে নিতে হবে।

আমরা এবারে পথ ঘাট এক রকম চিনে ফেলেছি। দু ধারের গাছপালায় বেশ অন্ধকার হয়ে আছে পথ। কিন্তু পথ চলতে অসুবিধা আর হচ্ছে না। অল্প সময়েই আমরা রেস্ট হাউসে পৌঁছে গেলুম।

টর্চ হাতে স্বাতি সকলের আগে উপরে উঠেছিল। কিন্তু খানিকটা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল।

কী হল?

বলে আমিও দাঁড়ালুম।

রেস্ট হাউসের বারান্দায় একটা লণ্ঠন জ্বলছিল। সেই আলোয় এক দম্পতিকে দেখতে পেলুম। তাদের পোশাক দেখেই আমার নৈনিতালের সাধন গুপ্ত ও তাঁর স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেল। ঠিক সেই রকম ভাবেই বারান্দায় বসে কিছু খাচ্ছিলেন।

হালদার মশাই আমাকে তাড়া দিয়ে বললেনঃ দাঁড়ালেন কেন?

কিছু না।

বলে আমি স্বাতির সঙ্গে এগিয়ে গেলুম।

অন্ধকারেও সাধন গুপ্ত আমাদের চিনতে পারলেন। লাফিয়ে উঠে ডান হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: আপনারা!

আমার নিজের হাতও বাড়িয়ে দিতে হল। কিন্তু কোন উত্তর দেবার আগে তাঁর স্ত্রী ম্যানিলা স্বাতিকে বললেন: আপনারাও যে আসবেন, তা তো বলেন নি!

স্বাতি বলল: হঠাৎ চলে এলাম।

কেদারনাথে যাচ্ছেন তো! আপনাদের জিনিসপত্র কোথায়?

বললুম: পাশের ঘরে।

স্বাতি বলল: আপনারা কি কেদারনাথ দেখে ফিরছেন?

ম্যানিলা তার উত্তর দিতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেললেন। বললেন: কি যে বিপদে পড়েছি, কী বলব! পথে আমাদের স্টেশন ওয়াগন বিগড়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে এখানে এসে পৌঁছেছি।

সাধন গুপ্ত বললেন: ঋষিকেশে টেলিফোন করেছি একটা ভাল স্টেশন ওয়াগনের জন্যে। কাল হয়তো এসে যাবে।

হালদার মশাই একবার আমার দিকে আর একবার স্বাতির দিকে তাকালেন। তার পরে নিঃশ্বাস নিয়ে বাতাসের গন্ধ শুঁকলেন। বললেন: বাসে উঠলে বুঝি জাত যাবে!

তাড়াতাড়ি আমি বললুম: বাসে বড় কষ্ট।

ম্যানিলা বললেন: আপনারা কী ভাবে এলেন?

স্বাতি সংক্ষেপে বলল: বাসে।

কদিন থাকবেন এখানে?

কাল ভোরের বাসেই রওনা হব।

আমাদের উত্তর শুনে গুপ্ত দম্পতি যে চমকে উঠেছিলেন, আমি

তা লক্ষ্য করেছিলুম। কিন্তু হালদার মশাই আমাদের এক ধমক দিয়ে বললেন: চলে আসুন।

আর নিজে গটগট করে আমাদের ঘরের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ঘরের দরজায় স্বাতি তার নিজের তালা লাগিয়েছিল। সেই তালা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। বলল: দেশলাই আছে হালদার মশাই?

হালদার মশায়ের কণ্ঠস্বর তখন মোলায়েম হয়েছে। বললেন: দেশলাই তো আমি কিনি না মা, পরের দেশলায়েই বিড়ি ধরাই।

বলেই পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করলেন।

একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনাকে দেশলাই দিচ্ছি।

বলে স্বাতি সুটকেশ খুলে একটা মোমবাতি ও দেশলাই বার করল। মোমবাতিটি জ্বেলে বলল: এইবার আপনার বিড়ি ধরিয়ে এই খাটিয়ায় বসুন।

তার পরে মোমবাতিটি বসিয়ে দিল একটা তাকের উপরে।

হালদার মশাই বিড়িটি ধরিয়ে খাটিয়ায় বসলেন, তার পরে খানিকটা ধোঁয়া মুখে নিয়ে বললেন: এই না হলে মা বলেছি কেন!

আমি বললুম: অমন সুখ্যাতি করবেন না হালদার মশাই, কোনও মতলব আছে বুঝতে পারছি।

তা যাক। মায়ের মতলবে ছেলের কোনও ক্ষতি হয় না।

স্বাতি বলল: খেয়ে দেয়ে এসে আমরা বিছানা বেছাব। এখন এই খাটিয়ায় বসে আপনার কাছে গল্প শুনব।

বললুম: গঙ্গোত্রীর গল্প তো?

হালদার মশাই বললেন: সে আমি না জিজ্ঞেস করলেও বলতুম। এ যাত্রায় যেখানে যেতে পারবেন না, তার কথা আমাকে বলতেই হবে।

গঙ্গোত্রীর গল্প শোনবার জন্য তাঁর মুখোমুখি বসলুম আমরা

তুজনে। আমাদের আগ্রহ দেখে তিনি খুশী হয়ে বললেন: বুঝলেন গোপালবাবু, উত্তরকাশী হল গঙ্গোত্রীর ঘাঁটি। একটা দিন আপনাকে সেখানে থাকতেই হবে।

কেন?

না থাকলে গঙ্গোত্রী যাবার অনুমতিপত্র পাবেন কী করে! বাস থেকে নেমেই তো আপনাকে থানায় ছুটতে হবে, দরখাস্ত দিতে হবে দারোগার হাতে। কিন্তু না, কোনও ঝঞ্ঝাট ঝামেলা নেই। এক দিনেই অনুমতির কাগজ সই হয়ে বেরিয়ে আসে।

বুঝতে পারলুম যে সীমান্তে নিরাপত্তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। হালদার মশাই বললেন: গঙ্গোত্রীতে আপনাকে ছবি তুলতেও দেবে না।

এর পরে তিনি পথের বর্ণনা দিলেন সংক্ষেপে। যাত্রীরা যখন পায়ে হেঁটে এই সব তীর্থ দেখত, তখন ধরাসুতে বাস বদল করে উত্তরকাশীতে আসত না। একটা সংক্ষিপ্ত পথ ছিল, এখনও আছে। তাতে পথ কিছু সংক্ষেপ হত। যমুনোত্রী থেকে পঁচিশ মাইল নেমে এসে সিম্‌লি নামের একটি জায়গা থেকে উত্তরকাশীর পথে নাকোরি আসতে হত। সিম্‌লি ছ হাজার ফুট উঁচুতে আর নাকোরির উচ্চতা সাড়ে তিন হাজার ফুট। পথ এগারো মাইল। এই হাঁটা পথে যমুনোত্রী থেকে গঙ্গোত্রীর দূরত্ব নিরানব্বুই মাইল। উত্তরকাশী নাকোরি থেকে মাত্র সাত মাইল।

স্বাতি বলল: উত্তরকাশীতে কী দেখেছেন, তাই আগে বলুন।

উত্তরকাশী এখন একটা জেলার সদর। যা থাকা উচিত, সবই আছে। আর ক্রমেই নাকি বাড়ছে। আমাদের থাকবার জন্যে বিড়লার ধর্মশালা আছে, কালিকম্‌লিওয়ালার ধর্মশালা। আর আপনাদের জন্যে হোটেল, ফরেস্ট রেস্ট হাউস। সাধুরা থাকেন মাইল খানেক দূরে ভাগীরথীর তীরে উজেনি গ্রামে। কালিকম্‌লি-ওয়ালা ও পাঞ্জাব-সিন্ধ ক্ষেত্রের সদাব্রতে তাঁরা খেতে পান। ধর্ম

চিন্তার জন্যে এমন সুখের স্থান আর নেই। ভিক্ষে করতে হয় না, হাত পাততে হয় না কোনও যাত্রীর কাছে। সকাল দশটায় সদাব্রতে ডাল রুটি পাওয়া যায়। যাঁরা দু বেলা খান, তাঁরা দু জায়গায় এই খাবার সংগ্রহ করেন।

স্বাতি বলল: এ জায়গার নাম উত্তরকাশী কেন হল হালদার মশাই ?

হালদার মশাই বললেন: উত্তরকাশীতেও বিশ্বনাথ আছেন। শহরের ঠিক মাঝখানে তাঁর মন্দির, সামনে একটি বিশাল ত্রিশূল মাটিতে পোঁতা আছে। তার উপরে কী সব লেখাও আছে। লোকে বলে যে কাশীর বিশ্বনাথ নাকি বলেছিলেন যে কলি যুগে কাশীর আদর যখন থাকবে না, তখন তিনি এই উত্তরকাশীতে এসে বাস করবেন। ভাগীরথীর তীরে এই শহরটিকেও বরুণা আর অসি নদী ঘিরে রেখেছে। উত্তরকাশীর নামও বারাণসী হতে পারত।

তার পরে স্মরণ করে বললেন: উত্তরকাশীতে আরও অনেক মন্দির দেখেছি। একাদশ রুদ্রের সুন্দর মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন জয়পুরের মহারাজা। তিন শো সাধু এখানে থাকতে পারেন। শক্তি পরশুরাম ও কালীর মন্দিরও আছে। আর সাধু সন্ন্যাসীদের আশ্রম ও কুঠিয়ার তো সংখ্যাই নেই।

তার পরে আমাব দিকে চেয়ে বললেন: গোপালবাবু, উত্তরকাশীতে গিয়ে এই সব সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আপনি আলাপ করবেন। আশ্চর্য হয়ে যাবেন এঁদের দেখে।

সত্যি!

সাধু বলতে তো আমরা জটাজূটধারী ছাইভস্ম মাখা কৌপীন পরা মানুষ বুঝি। কমণ্ডলু হাতে বাড়ির দরজায় এসে ডাকবে, ভিক্ষে দে মা! কিন্তু উত্তরকাশীর সাধু দেখে আপনার ভুল ভাঙবে। কাউকে দেখবেন গেরুয়া বা সাদা কাপড় পরে পরিচ্ছন্ন আশ্রমে বা ছোট্ট কুঁড়ের ভেতর বাস করছেন। এত পড়াশুনো করেছেন আর

এমন শাস্ত্রজ্ঞান যে আমার মতো মুখ্যু লোকের সাহস হয় না তাঁদের সামনে এগোতে।

হালদার মশাই আরও দু তিন জাতের সাধুর কথা বললেন। কেউ পূজাপাঠ ও জপতপে কাটাচ্ছেন সারা দিন। কেউ যোগাভ্যাস নিয়েই আছেন। তাঁদের মেদহীন পেশীবহুল শরীর দেখে আশ্চর্য হতে হয়। আর এক জাতের সাধুর কোনও কূল কিনারাই পাওয়া যায় না। কিছুই করেন না, শুধু স্থির হয়ে বসে থাকেন। তাঁদের অনেকের আবার বয়সের কোন হিসেবই নেই। শুধু শুনলুম, বড় রামানন্দর বয়স হল পাঁচ শো বছর। ছুটলুম তাঁকে দেখতে। উজেনি ছাড়িয়ে ভাগীরথীর তীরে তাঁর কুঠিয়া। তাঁরই সামনে একখানা কাঠের চেয়ারে তিনি বসে আছেন—দীর্ঘ ভারি দেহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ। একেবারে স্থির, কোনও ভাবের প্রকাশ নেই মুখে। সাধু সমাজের একজন বৃদ্ধ সাধু তাঁর সেবায় নিযুক্ত। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলুম যে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাবা একজন সিপাই ছিলেন। সেই হিসেবে তাঁর বয়স হয়েছে দেড় শো বছরের কাছাকাছি। কানে কম শোনেন তিনি, তাই কানের কাছে মুখ এনে কিছু বলবার জন্যে সাধাসাধি করে উত্তর পেলুম, রাম নাম লেও। ব্যস, এই পর্যন্ত।

স্বাতি বলল : আশ্চর্য তো!

খুশী হয়ে হালদার মশাই বললেন : গঙ্গোত্রীর পথেও এমনি সাধু আছেন, আছেন গঙ্গোত্রীতেও। তাঁরা কোন্ জগতের মানুষ তা তাঁরাই জানেন।

আমরা আবার উত্তরকাশীর কথায় ফিরে এলুম। স্বাতি বলল : উত্তরকাশী বুঝি খুব প্রাচীন তীর্থ?

হালদার মশাই হেসে বললেন : এ সব কথা গোপালবাবুকে জিজ্ঞেস কর মা, পুরাণ ইতিহাসের বিদ্যে আমার নেই।

আমিও হেসে বললুম : জতুগৃহ দেখেছেন?

কোথায়, উত্তরকাশীতে ?

বলে হালদার মশাই আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম : মহাভারতের জতুগৃহ তো শুনেছি এইখানেই হয়েছিল। শহরের কাছেই সেই জায়গাটি নাকি এখনও আছে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। মহাভারতের সেই গল্প তাকে মনে করিয়ে দিলুম। পঞ্চ পাণ্ডবকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল চতুর দুর্যোধন। তাই কুন্তীর সঙ্গে পাঁচ ভাইকে পাঠিয়েছিল বারণাবতে। তার আগে এক মন্ত্রীকে পাঠিয়েছিল জতুগৃহ নির্মাণের জন্য। মহামতি বিদুর দুর্যোধনের অভিসন্ধি সন্দেহ করেছিলেন। তাই যুধিষ্ঠিরের যাত্রার সময় ম্লেচ্ছ ভাষায় তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ম্লেচ্ছ ভাষা মাত্র এই দুজনেই জানতেন। জতুগৃহে প্রবেশ করে যুধিষ্ঠির তাই সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে সে গৃহ লাক্ষায় নির্মিত হয়েছে, পালাবার ব্যবস্থা না রাখলে আগুনে পুড়ে মরতে হবে। বিদুরই বোধ হয় এক খনক পাঠিয়েছিলেন। সে গোপনে একটি সুড়ঙ্গ নির্মাণ করে দেয়। তার পরে এক দিন নিজেরাই সেই জতুগৃহে আগুন দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে পালিয়ে গেলেন।

হালদার মশাই বললেন : সাবাস, এই না হলে গোপালবাবু!

হেসে বললুম : পৌরাণিক কাহিনী আরও একটু আছে।

আরও !

বললুম : হ্যাঁ। কিরাত-অর্জুনের যুদ্ধও নাকি এইখানে হয়েছিল।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল : উত্তরকাশীতে আমরা দিন কয়েক থাকব। সত্যিকার সাধু দেখতে আমার খুব ইচ্ছে।

হালদার মশাই বললেন : খুব ভাল কথা। জায়গাটির আব-হাওয়াও ভাল। গরম নেই, শীতও বেশি নয়। উচ্চতা শুনেছি ৩৮০০ ফুট। সারা বছরই সেখানে বাস করা যায়। ভাল লাগবে আপনাদের। অন্তত সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাবেন, পণ্ডিত সাধুদের কাছে জানতে পাবেন অনেক কথা।

তার পরে গঙ্গোত্রীর পথের কথা। হালদার মশাই বললেন: এ বছর আমরা লঙ্কা পর্যন্ত বাসে গিয়েছি। উত্তরকাশী থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল। তার পরে ভৈরোঁ ঘাঁটি পর্যন্ত দেড় মাইল হাঁটতে হয়েছে। গঙ্গোত্রী সেখান থেকে সাড়ে ছ মাইল। কিন্তু আমাকে হাঁটতে হয় নি।

কেন?

ওপারেও পথ তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু যানবাহন নেই। ভাগ্যক্রমে আমি একখানা জীপে ওঠবার সুযোগ পেয়েছিলুম।

আমি বললুম: পথের কথা খুবই সংক্ষেপ হয়ে গেল।

হালদার মশাই বললেন: পায়ে হেঁটে যখন চলতে হত, তখনই ছিল পথের কথা। এখন সে কথার আর প্রয়োজন কী?

বললুম: পুরনো ভ্রমণ কাহিনীতে অনেক কথা পড়েছি তো, তাই জানতে ইচ্ছা করে।

হালদার মশাই যেন একটু বেকায়দায় পড়লেন। বললেন: সব জায়গার নাম তো মনে নেই, কয়েকটা বড় জায়গার নাম মনে পড়ছে। বাসে বসে পেরিয়ে গেছি বলে দেখতে কিছুই পাই নি।

প্রশ্ন করে জানতে পারলুম যে ডোডিতালের নাম হালদার মশাই শোনেন নি। অসি গঙ্গার উৎপত্তি হয়েছে ডোডিতাল থেকে। উত্তরকাশী থেকে মাইল তিনেক দূরে ভাগীরথীর সঙ্গে তার সঙ্গম। তিনি ভাটোয়ারির কথা বললেন। তার নাম ভাস্কর প্রয়াগ। ভাটোয়ারি পৌঁছবার দু মাইল আগে মাল্লা চটি থেকে বেরিয়েছে কেদারনাথে যাবার পায়ে চলা পথ। মাল্লা থেকে বুদ্ধকেদার সাতাশ মাইল দূরে। আরও ছাব্বিশ মাইল এগিয়ে পানওয়ালি গিরিবর্ত্ম এগার হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু। ত্রিযুগীনারায়ণ সেখান থেকে চোদ্দ মাইল দূরে। কেদারনাথের যাত্রীরা একটু ঘুরে এই ত্রিযুগী-নারায়ণ দর্শন করে এগিয়ে যায়।

ভাটোয়ারি থেকে ন মাইল দূরে গাংনালিন প্রায় সাত হাজার

ফুট উঁচুতে। ভাগীরথীর পুলের কাছে ঋষিকুণ্ডের গরম জলে যাত্রীরা আগে স্নান করত। তার পরে শ্যাম প্রয়াগ ও গুপ্ত প্রয়াগ ছাড়িয়ে হর্সিল আট হাজার ফুট উঁচুতে। এই জায়গাকে হরি প্রয়াগও বলে। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আছে, আর আপেলের বাগান। এখান থেকে একটি পায়ে চলার পথ হিমাচল প্রদেশের রামপুর বুশহর পর্যন্ত গেছে।

হর্সিলের পর থেকেই হিমালয়ের দৃশ্য খুব মনোরম। আড়াই মাইল দূরে ধরালিতে দুধ গঙ্গার সঙ্গে ভাগীরথীর সঙ্গম। এরই ওপরে বিশ্বেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ধরালির পুরনো নাম তাই বিশ্বনাথ পুরী। আর ভাগীরথীর অপর পারে মুখ্যমঠে গঙ্গোত্রীর পাণ্ডাদের বাস। বছরের ছ মাস গঙ্গার পূজো হয় এইখানে। ধরালির পিছনেই ২০১২০ ফুট উঁচু শ্রীকণ্ঠ পর্বত। আরও চার মাইল এগিয়ে জংলা থেকে বেরিয়েছে কৈলাস ও মানস সরোবরের পথ। জাড-গঙ্গা বা জাহ্নবী নদীর তীরে তীরে এই পথ এগিয়ে গেছে। জাড নামের একটা যাযাবর জাতের বাস এই অঞ্চলে। কিন্তু ধরালির ধরিয়াল রাজপুতেরাই নাকি কৈলাসের ভাল গাইড। হালদার মশাই বললেন: জাহ্নবীর এপারেই লঙ্কা, আর এখানেই আমাদের বাস থেকে নামতে হয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলুম: কতটা পথ হাঁটলেন?

হালদার মশাই বললেন: মাইলের হিসেবে বোধ হয় মাইল দেড়েক, কিন্তু হাঁটতে গিয়ে আপনার দম ফুরিয়ে যাবে। জাহ্নবী পেরিয়ে ওপারে ভৈরোঁ ঘাঁটি ৯৩০০ ফুট উঁচুতে ভাগীরথী ও জাহ্নবীর সঙ্গমের কাছে। দেবদারুর ঘন বনে আচ্ছন্ন চারি দিক। আর খাদের দিকে পাহাড়ের উপরে ভৈরবের মন্দির। বুঝলেন গোপাল-বাবু, মাইল খানেক চড়াই ভাঙতে কষ্ট হয়েছিল খুব, কিন্তু সেই পাহাড় আর দেবদারুর বনের দিকে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়েছিল। আর আশ্চর্য! এত উঁচুতেও শীতবোধ হয় নি। পরে

শুনেছিলুম যে এখানকার পাহাড়ে গন্ধক আছে, আবহাওয়া তাই একটু উষ্ণ।

এর পরেই তো গঙ্গোত্রী ?

সাড়ে ছ মাইল দূরে, কিন্তু চড়াই আর নেই। পথ অল্প অল্প করে প্রায় হাজার ফুট উঠেছে। গঙ্গোত্রীর উচ্চতা শুনেছি ১০৩১৯ ফুট।

স্বাতি বলল : খুব সুন্দর জায়গা তো !

হালদার মশাই গম্ভীর হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তার পরে বললেন : তীর্থস্থানে আমরা কি সৌন্দর্য দেখতে আসি ! সে আমাদের উপরি লাভ। আর—

বললুম : বলুন।

গঙ্গার উৎস নয় গঙ্গোত্রীতে। নদীর নামও গঙ্গা নয়, তার নাম ভাগীরথী। এইখানে এসে উত্তরবাহী হয়েছে বলেই নাম গঙ্গোত্তরী বা গঙ্গোত্রী। যমুনোত্তরী বা যমুনোত্রী নামও এই কারণে। নদী কোন স্থানে উত্তরবাহী হলেই সে স্থানকে আমরা তীর্থ মনে করি। বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন, কাশীতেও গঙ্গা উত্তরবাহিনী।

একটু থেমে হালদার মশাই বললেন : তবে এখানকার মন্দিরটি খুব সুন্দর। যমুনোত্রীর মতো চালা ঘর নয়, অনেকগুলি চূড়াবিশিষ্ট পাথরের মন্দির। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গাড়োয়ালের গুর্খা সেনাপতি অমর সিং থাপা এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সেখানকার লোক বলে, যে পাথরের ওপরে বসে রাজা ভগীরথ সাড়ে পাঁচ হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন, সেই পাথরের ওপরেই এই মন্দির নির্মিত হয়েছে। ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে গঙ্গা অবতরণ করেছিলেন এইখানেই।

পুরাণের গল্প আমার মনে পড়ে গেল। সগর রাজার অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করে পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে বেঁধে রেখেছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। আর রাজার ষাট হাজার পুত্র ঘোড়া খুঁজতে এসে

কপিল মুনিকেই চোর ভাবলেন। তার ফলে মুনির শাপে তাঁরা ভস্ম হয়ে গেলেন। সগর রাজার বংশের পঞ্চম পুরুষ হলেন ভগীরথ। তিনি শুনেছিলেন যে গঙ্গার স্পর্শে সেই ষাট হাজার পূর্বপুরুষ উদ্ধার হবেন। তারই জন্যে তিনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন। গঙ্গা হিমালয়ের কন্যা, ব্রহ্মার বরে তিনি পৃথিবীতে নামবেন। তাঁর গতিবেগ ধারণ করবে কে? আবার তপস্যা করে ভগীরথ শিবকে রাজী করলেন। শিব স্থির হয়ে দাঁড়ালেন গঙ্গোত্রীর এই পাথরের উপরে, স্বর্গ থেকে নামছেন গঙ্গা। তাঁর ইচ্ছা হল শিবকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন, কিন্তু অন্তর্যামী দেবতা তা বুঝতে পেরে নিজের জটাজালেই বন্দী করে ফেললেন গঙ্গাকে। ভগীরথকে আবার তপস্যা করতে হল সহস্র বৎসর। তার পরে গঙ্গা মুক্তি পেলেন। সপ্ত ধারায় প্রবাহিত হয়েছিলেন গঙ্গা—তিনটি প্রবাহ পূর্ব দিকে, আর তিনটি পশ্চিম দিকে। আর সপ্তম ধারা ভগীরথকে অনুসরণ করে প্রবাহিত হয়েছিল। এই ধারাই ভাগীরথী, দেবপ্রয়াগ থেকে তার নাম গঙ্গা। দিব্য রথে আরোহণ করে ভগীরথ এই গঙ্গাকে গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির আশ্রমে নিয়ে যান। সেই ধারার স্পর্শে ভস্মীভূত সগর সন্তানরা মুক্ত হন।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: আর কী দেখলেন সেখানে?

কী দেখলুম! দেখলুম পুরোহিত পাণ্ডা দোকান পাট আর সাধু সন্ন্যাসী।

যাত্রী দেখলেন না?

যাত্রীদের জন্যেই তো ওঁরা ছ মাস গঙ্গোত্রীতে বাস করেন। আর যমুনোত্রীর চেয়ে অনেক বেশি যাত্রী আসেন গঙ্গোত্রীতে। কিন্তু তাদের জন্যে ধর্মশালায় স্থানাভাব হয় না।

পরে শুনেছিলুম যে উত্তরকাশী ভৈরোঁ ঘাঁটি আর গঙ্গোত্রীতে ট্রাভ্‌লার্স লজ তৈরি হয়েছে, আর লঙ্কায় পিলগ্রিম শেড। লঙ্কা থেকে ভৈরোঁ ঘাঁটি পর্যন্ত যত দিন হাঁটতে হবে তত দিন যাত্রীরা

লঙ্কা বা ভৈরোঁ ঘাঁটিতে বিশ্রাম করবে। আরও একটা কথা শুনেছিলুম।—উত্তরকাশীতে স্থাপিত হয়েছে নেহরু মাউন্টেনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউট।

হালদার মশাই বললেন: গঙ্গোত্রীতে আরও একটি কথা শুনে এলুম।

কী কথা?

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে পঞ্চপাণ্ডব এখানে দেবযজ্ঞ করেছিলেন স্বজন হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম: আশ্চর্য নয়। মহাপ্রস্থানে যাবার আগে এ রকম ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক।

তার পরে হালদার মশাইকে জিজ্ঞাসা করলুম: গোমুখে যান নি?

পাগল হয়েছেন!

কেন?

ও পথের কথা কিছু জানেন?

বললুম: না।

হালদার মশাই বললেন: কোনও পথ নেই। পাথরের ওপর পাথর সাজানো দেখে পথ চিনে চিনে চলতে হয়। আর গাইড না নিলেই নয়। দুর্গম বিপজ্জনক পথ বলে একা যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

আমি বললুম: বহু যাত্রীই তো যায় শুনেছি!

সে সব দুঃসাহসী যাত্রী। চোদ্দ মাইলে প্রায় আড়াই হাজার ফুট উপরে উঠতে হয়। পথে চীরবাসা ও ভুজবাসা নামে দুটি জায়গা আছে। ভুজবাসায় রাত্রিবাসের জন্য ধর্মশালাও আছে একটি। চীর গাছের বন বলে নাম চীরবাসা, আর ভুজবাসার নাম ভুজ গাছের জন্যে। ভুজবাসাকে যাত্রীরা বলে লক্ষ্মীর বন বা বাগান। অতি সুন্দর নাকি দৃশ্য। শুনলুম এক বাঙালী সাধু গোমুখের

যাত্রীদের এই পথে সেবা করেন। থাকতে দেন, খেতেও দেন যাত্রীদের। এই সেবাই তাঁর ধর্ম।

স্বাতি সবিস্ময়ে তাকাল আমার মুখের দিকে। বললুম : জীবে সেবা করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

স্বাতি বলল : গৌমুখ নিশ্চয়ই যমুনোত্রীর মত সুন্দর?

গোমুখী বা গৌমুখ সম্বন্ধে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। তার উচ্চতা শুনেছি ১২৭৭০ ফুট। আরও উপরে ১৩৫৭৮ ফুট উঁচুতে গঙ্গোত্রীর হিমবাহ বদ্রীনাথের নিকটে চৌখাম্বা শিখর থেকে গৌমুখের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। প্রায় বিশ মাইল দীর্ঘ এই হিমবাহের মুখ থেকে জন্ম হয়েছে ভাগীরথীর, আর গৌমুখের গিরিগুহা থেকেই তাকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। লোকে ভাবে যে ভাগীরথী একটি ছোট্ট নদী গুহার ভিতর থেকে ঝির ঝির করে বেরিয়ে আসছে। আসলে কিন্তু তা নয়। গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে জন্ম নিয়েই প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছে গৌমুখে, প্রশস্ত তার ধারা ও প্রবল তার গতিবেগ।

আরও একটা অদ্ভুত কথা আমি শুনেছি। যাত্রীরা যখন তিব্বতের দিক থেকে আসত, তারা নাকি বলত যে গৌমুখ থেকে চল্লিশ মাইল দূরে তারা নাকি ভাগীরথীকে দেখতে পায়। এ একই ভাগীরথী কিনা কে বলতে পারে।

স্বাতি বলল : গৌমুখের পরে আর বুঝি পথ নেই ?

বললুম : পথ আছে অভিযাত্রী দলের জন্যে। প্রতি বছরই একটা না একটা দল গৌমুখ থেকে বদ্রীনাথে যায় চতুরঙ্গী হিমবাহের পথ ধরে। আরও উপরে উঠতে হয়। চোদ্দ হাজারেরও বেশি উঁচুতে তপোবন আর নন্দনবন। তার পরে চতুরঙ্গী হিমবাহের দক্ষিণ তীর ধরে পূর্ব দিকে এগিয়ে যেতে হয়। বাসুকি বামক শ্বেতা বামক পেরিয়ে কালিন্দী খাল বিশ হাজার ফুট উঁচুতে। তার পরে অর্বা নদীর তীর ধরে সরস্বতী নদীর পথে মানা গ্রাম বদ্রীনাথ থেকে

ছ মাইল দূরে। ছ দিনে এই পথ অতিক্রম করা যায়। আর গঙ্গোত্রীর ব্রহ্মচারী সুন্দরানন্দকে পাওয়া যায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে।

আর একটি নদীর নাম শুনেছি। কেদার গঙ্গা। কেদারনাথ শৃঙ্গের নিচে জন্ম নিয়ে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলেছে গঙ্গোত্রীতে। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বললুম: হিমালয় কোথায় সুন্দর নয় বল! এক এক জায়গায় তার এক এক রূপ। কিন্তু কোনখানেই কুৎসিত নয়।

পরদিন ভোর ছটার বাসে আমরা কেদারনাথ যাত্রা করলুম। রাতে যখন খাবার জন্যে বেরিয়েছিলুম, তখন আমরা টিকিটের ব্যবস্থা করেছি। বাস না এলে টিকিট পাওয়া যায় না। বাসে জায়গা আছে দেখেই টিকিট দেয়। আমরা তিনখানা টিকিট কেটে ফিরেছিলুম। হালদার মশাই আমাদের সঙ্গে এক ঘরেই ছিলেন। আর একখানা খাটিয়া আমরা সংগ্রহ করেছিলুম।

বাস ছেড়ে যাবার ভয়ে ছুটতে ছুটতে এসে আমরা বাসে উঠেছিলুম। তার আগে একটা কুলি ডেকে আনতে হয়েছিল। যে কুলিকে বলা ছিল, সে সময় মতো আসে নি, কিংবা হয়তো ঠিকই আসত। আমরা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে আগেই চলে এসেছিলুম। বাসে ওঠার পরে চা খেয়েছিলুম নিশ্চিন্ত মনে। ব্যাগ থেকে স্বাতি একটা বিস্কুটের প্যাকেট বার করে দিয়েছিল।

ছটার আগেই বাস ছেড়ে দিল দেখে আশ্চর্য হলুম। কিন্তু স্থানীয় যাত্রীরা কোন মন্তব্য করলেন না। বাস শহর ছাড়িয়ে একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল। আরও দু একখানা গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হল না যে এটা রুদ্রপ্রয়াগের গেট। ওধার থেকে কোনও গাড়ি আসবার সম্ভাবনা নেই। তাই এই সব গাড়ি সময় মতোই ছাড়বে।

হালদার মশাই জিজ্ঞাসা করলেন: মন্দাকিনী আর অলকনন্দার সঙ্গম দেখেছেন?

বললুম: না।

সে কি! তবে বসে আছেন কেন! নেমে পড়ুন আমার সঙ্গে। বলে আমাকে টেনে বাস থেকে নামালেন।

ভয়ে ভয়ে আমি বললুম: বাস ছেড়ে যাবে না তো!

ছেড়ে গেলেই হল আর কী!

বলে কণ্ডাক্টরকে ভাঙা হিন্দীতে জানিয়ে দিলেন : বাস ছাড়লে তোমার মাথা ভাঙে গা।

স্বাতিকে সামলাতে বলে আমি হালদার মশাইয়ের সঙ্গে ছুটলুম। গেট খুললে যে ওরা কারও জন্যে অপেক্ষা করবে না তা জানি।

হালদার মশাই চলতে চলতেই বললেন : খুব কাছে। একটু-খানি এগিয়েই দেখতে পাবেন।

আরও দু চারজন যাত্রী আমাদের সঙ্গে আসছেন দেখে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলুম। ঘর বাড়ির মাঝখান দিয়ে একটা সরু পথ ধরে পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছেই সেই অপরূপ দৃশ্য দেখতে পেলুম। এক ধার থেকে মন্দাকিনী আর অন্য ধার থেকে অলকনন্দা বয়ে এসে চোখের সামনে মিলে যাচ্ছে। আর এই সঙ্গমের উপরেই রুদ্রনাথের মন্দির। উপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে এই মন্দিরের চূড়ো দেখতে পাচ্ছি—টিনের চালার উপরে সাদা শিখর। তার গায়ে একটা উঁচু দণ্ডের উপরে নিশান উড়ছে। অনেকটা নিচে নামলে এই মন্দির পাওয়া যাবে। নদী আরও নিচে। সামনে অরণ্যময় পাহাড়, তার গায়ে কিছু ঘর বাড়িও দেখা যাচ্ছে। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম।

হালদার মশাই যে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তা বুঝতে পারি নি। আমি তাঁর দিকে তাকাতেই সগৌরবে বললেন : কেমন দেখছেন ?

সংক্ষেপে বললুম : অপূর্ব।

টেনে আনছিলুম বলে তো পাগল ভাবছিলেন, এখন বলুন তো ঠিক কাজ করেছি কি না।

হেসে বললুম : আপনি তো বেঠিক কাজ করেন না !

হেঁ-হেঁ করে হাসলেন হালদার মশাই, তার পরে বললেন : চলুন এবারে।

সময় আমাদের সামান্যই লেগেছে। বাস দাঁড়িয়ে আছে,

যাত্রীদের অনেকেই নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে ফিরতে দেখেই স্বাতি বলল : কী দেখলে ?

বললুম : তুই নদীর মিলন। বদ্রীনাথ থেকে আসছে অলকনন্দা, আর মন্দাকিনী কেদারনাথ থেকে। এর পরে মন্দাকিনী নাম আর থাকবে না, অলকনন্দা নামেই মিলিত হবে ভাগীরথীর সঙ্গে দেবপ্রয়াগে।

এইখানেই একজন স্থানীয় লোকের কাছে শুনলুম যে অলকনন্দার উপরে আগে বাস যাতায়াতের উপযোগী পুল ছিল না। যাত্রীদের তখন এইখানেই বাস থেকে নামতে হত। তার পরে সামনের ঐ টানেল পেরিয়ে অলকনন্দার ওপারে গিয়ে অন্য বাসে উঠতে হত। এখন আর এ সব ঝামেলা নেই। এখন আমরা বাসেই অলকনন্দার পুল পেরিয়ে মন্দাকিনীর তীর ধরে কেদারনাথের দিকে এগিয়ে যাব।

বাস ছাড়বার সময় হয়েছে ভেবে আমরা উঠে বসলুম। হালদার মশাই বললেন : গঙ্গা নাম তো দেবপ্রয়াগ থেকে, সেই সঙ্গমে আমার স্নান করবার শখ ছিল, কিন্তু ভাগ্যে তা ঘটল না।

কেন ?

কেন আবার ! উত্তরকাশীতে বাসে চেপে সোজা এসে নামলুম শ্রীনগরে, তার পরেই রুদ্রপ্রয়াগ। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলুম যে ঋষিকেশ থেকে রুদ্রপ্রয়াগের বাসে বসলে দেবপ্রয়াগের ওপর দিয়ে আসত।

দেবপ্রয়াগের কথা আমি জানতুম। ঋষিকেশ থেকে বিয়াল্লিশ মাইল দূরে দেড় হাজার ফুট উঁচুতে এই জায়গা রঘুনাথজীর মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। দশানন রাবণকে বধ করে রামের ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়েছিল। তারই জন্যে তিনি এখানে হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন। সেই স্মৃতিরক্ষার জন্যে এই মন্দির নির্মিত হয়েছে—পাথরে তৈরি বিশাল মন্দির। দেড় শো বছর আগে ভূমিকম্পে

ভেঙে পড়েছিল, এখন নতুন করে গড়া হয়েছে। বদ্রীনাথের পাণ্ডারা বাস করে আসে এইখানে। বললুম: জলধর সেনের ভ্রমণ কাহিনীতে পড়েছি যে এক বাঙালী নাকি মন্দিরের অলঙ্কার চুরি করে ধরা পড়ে গিয়েছিল। সেই থেকে দেবপ্রয়াগে বাঙালীদের বড় দুর্নাম।

হালদার মশাই এই গল্প শুনে বললেন: বাঁচালেন আমাকে।

কেন?

দেবপ্রয়াগে আর নামতে হবে না।

সে কি! সেই চুরির গল্প এখন কি আর কেউ মনে রেখেছে!

তা না রাখুক।

বুঝতে পারলুম যে হালদার মশাই এখন তাঁর মনকে প্রবোধ দিচ্ছেন। ফেরার পথেও যদি দেখতে না পান তো এই কথা মনে করে সান্ত্বনা পাবেন।

এর পরে কীর্তিনগর ও শ্রীনগর। দুই শহরের মাঝখানে অলকনন্দা। কীর্তিনগর দেবপ্রয়াগ থেকে একুশ মাইল আর টেহরি থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল। অলকনন্দার পরপারে শ্রীনগর তিন মাইল দূরে। টেহরি গাড়েয়াল রাজ্যের মহারাজা কীর্তিশাহর নামে কীর্তিনগর। এক সময় রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখন সে গৌরব আর নেই। শ্রীনগর এর চেয়ে বড় শহর। পুরাকালে এও রাজ্যের রাজধানী ছিল। গত শতাব্দীর শেষে গোহ্‌লা লেকের বন্যায় শহরটি ধ্বংস হয়ে যাবার পরে নতুন করে আবার গড়ে উঠেছে।

আমাদের বাস হঠাৎ গর্জে উঠল। সামনে ও পিছনের গাড়ি-গুলোও। গেট। গেটের সময় হয়েছে। খুব বেশি গাড়ি নেই। তবু আমরা এক সঙ্গে যাত্রা করলুম। একটুখানি এগিয়েই ঢুকে গেলুম একটা টানেলের ভিতরে। তার পরে অপর প্রান্তে এসে দেখলুম অলকনন্দাকে। দেখতে দেখতেই অলকনন্দার পুল আমরা পেরিয়ে গেলুম। মন্দাকিনীর উপত্যকা ধরে এবারে আমরা অগ্রসর হব মন্দাকিনীর তীরে তীরে।

পথের দিকে মনোযোগ ফুরিয়ে যাবার পরে স্বাতি বলল : শ্রীনগরে কী দেখেছেন হালদার মশাই ?

হালদার মশাই বললেন : দেখবার সময় আর কোথায় পেলুম ! বাস থেকে নেমে চারি ধারটা শুধু দেখে নিয়েছিলুম। বাস স্ট্যাণ্ডের ওপবেই যাত্রীদের জন্যে মস্ত বড় ঘর করে দিয়েছে টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্ট। খুব কম পয়সায় থাকবার ব্যবস্থা। আর কাছাকাছি সব খাবার দোকান হোটেল রেস্তোরাঁ। শুনে আশ্চর্য হবেন—

বলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : মাছ মাংস সবই পাওয়া যায় এখানে। টেহরিতেও তাই। রান্নাও ভাল বলে শুনেছি।

আমি বললুম : শ্রীনগরে কমলেশ্বর শিবের মন্দির দেখেন নি ?

হালদার মশাই ছোটখাট একটা ভেংচি কেটে বললেন : নাম না শুনলে দেখবার প্রশ্নই ওঠে না।

বললুম : এই মন্দিরেব সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে বলেই জিজ্ঞেস করছি।

স্বাতি তৎপর ভাবে বলল : শুনি তোমার গল্প।

বললুম : দেবপ্রয়াগেব রঘুনাথজীর মন্দিরে রামের স্মৃতি। এখানেও তাই। রাম যখন এই শিবের পূজো করেছিলেন, তখন তাঁর নাম কমলেশ্বর ছিল না। এই অরণ্যময় অঞ্চলে বাস করতে এসে তিনি এই শিবের পুজো করতেন। এক দিন সহস্রাক্ষ রুদ্র-রূপে শিবের পূজো করবেন ভেবে তিনি এক হাজার কমল সংগ্রহ করলেন। কিন্তু শিব তাঁর ভক্তি পরীক্ষার জন্য একটি পদ্ম হরণ করলেন। রাম একটি একটি করে সেই পদ্ম দেবতাকে নিবেদন করে দেখলেন যে একটি পদ্ম কম হয়েছে। তিনি কোন দ্বিধা না করে তখনই নিজের একটি চোখ উপড়ে সেই পদ্মের অভাব পূরণ করলেন। সেই দিন থেকেই শিবের নাম হল কমলেশ্বর।

সত্যি ?

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

আমি হাসলুম তার মুখের দিকে চেয়ে। বললুম: শীতের শুরুতে বৈকুণ্ঠ একাদশীর রাতে এই মন্দিরে একটি উৎসব হয়। মেয়েরা সন্তান কামনা করে এসে ঘিয়ের প্রদীপ হাতে নিয়ে দাঁড়ায় মন্দিরের চারি ধারে। সেই দীপশিখা যদি সারা রাত ধরে জ্বলে, তাহলে দেবতার কৃপা হয়েছে বলে তারা বিশ্বাস করে।

এবারে স্বাতি কোন বিস্ময় প্রকাশ করল না, কিন্তু হালদার মশাই বললেন: এ সব গল্প তৈরি করে বলছেন নাকি!

বললুম: সন্তানলাভ হয় কিনা তার প্রমাণ নেই, কিন্তু উৎসবটি সত্য কিনা ফেরার পথে জেনে নিতে পারেন।

হুঁ।

বলে হালদার মশাই একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

বললুম: দেখবেন, কমলেশ্বর বলতে কিলকিলেশ্বর বলবেন না। নদীর ওপারে কিলকিলেশ্বর শিবও আছেন। কীর্তিনগর থেকে তিন মাইল দূরে শ্রীনগরের ঠিক উল্টো দিকে।

শ্রীনগর থেকে বাইশ মাইল দূরে রুদ্রপ্রয়াগ। রুদ্রনাথ শিবের নামেই শহরের নাম। দেবর্ষি নারদ এখানে রুদ্রনাথের দর্শনের জন্যে কঠিন তপস্যা করেছিলেন। আমরা সেই রুদ্রনাথের মন্দিরের উঁচু শিখরটি দেখলুম, শিবের দর্শন পেলুম না। যাত্রীরা যখন পায়ে হেঁটে আসত, তখন সব কিছুই দেখত। সেই পথশ্রমই ছিল দেবদর্শনের জন্যে তপস্যা।

ছোট একটি জনপদ পেরিয়ে এগারো মাইল দূরে অগস্ত্য মুনিতে এসে আমরা পৌঁছলুম। প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু এই জায়গা। ওধার থেকে বাস আসবে বলে আমাদের বাস এখানে মিনিট কুড়ি দাঁড়াবে। এই খবর পেয়েই স্বাতি বলল: আসুন হালদার মশাই, রুদ্রপ্রয়াগে চা খেয়ে তো তৃপ্তি হয় নি, এখানে গরম কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক।

বলে বাস থেকে নেমে পড়ল। আমরাও নামলুম।

চা খেতে খেতে শুনলুম অগস্ত্য মুনির গল্প। ঋষি অগস্ত্য এইখানে তপস্যা করেছিলেন বলে জায়গার নাম হয়েছে অগস্ত্য মুনি। তাঁর নামে একটি মন্দির এখানে আছে।

একজন স্থানীয় লোক বললেন যে এই পথের ধারে এই রকমের মন্দির কত আছে, তার কোন হিসাব নেই। এই সব মন্দিরের এখন খুবই জীর্ণ দশা। কিন্তু যাত্রীরা যখন পায়ে হেঁটে কেদারনাথে যেত, তখন এ রকম অবস্থা ছিল না। যাত্রীরা সর্বত্র দাঁড়াত, বিশ্রাম নিত, পূজার্চনা করত দেবদেবীর, তার পরে এগোত। যাত্রীরা এখন বাসে চলেছে। বাস কোনখানেই বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। বাস থেকে নেমে যাত্রীরা যে মন্দিরে যাবে তার সময় নেই, প্রয়োজনও নেই। যারা কেদারনাথ দর্শনে যাচ্ছে, তারা পথে কী দেখল না তার খবরও রাখে না।

হালদার মশাই বললেন: কথাটা মিথ্যা নয়। আর ইচ্ছে থাকলে এক দৌড়ে হয়তো দেখে আসাও যায়।

আমি বললুম: তাহলে এই দোকানে বসে চা খাওয়ার সময় পাওয়া যেত না।

কিন্তু স্বাতি বলল: আমরা কি চা খাবার জন্যে এ দিকে এসেছি!

না।

তবে?

পথের মন্দির দেখতেও আসি নি। আমাদের লক্ষ্য হল কেদারনাথ। তাঁর দর্শন পেলেই আমাদের এই তীর্থযাত্রা সার্থক হবে।

উত্তরাখণ্ডের এই সব পাহাড়ে কত মন্দির আছে কত শিবের মন্দির আর বিষ্ণুর মন্দির কত তার একটা হিসেব আমি কোনও বইএ পড়েছিলুম। সহসা সে কথা আমার মনে পড়ল না। চা

খাওয়া শেষ করে আমরা বাসে এসে বসলুম। আরও কিছু পরে এল ও ধারের গাড়ি। তার পরে আমরা যাত্রা করলুম।

চন্দ্রাপুরীর লোকালয় ছাড়িয়ে কুণ্ড চটি অগস্ত্য মুনি থেকে এগার মাইল দূরে। এখানে আবার গেট। বাস আসে দু দিক থেকে। দু দিকের পাহাড়ে ওঠবার দুটো পথ আছে এখানে। মন্দাকিনীর এপার থেকে যে পথ উপরে উঠেছে, তা উখীমঠ ও গোপেশ্বর হয়ে চামোলি যাবে। বদ্রীনাথে যাতায়াতের পথে আমরা চামোলি দেখেছি। এই পথের ধারেই তুঙ্গনাথ অনসূয়া দেবী ও রুদ্রনাথ। কেদারনাথের পথ অন্য। সে পথ মন্দাকিনীর পুল পেরিয়ে গুপ্ত-কাশীতে উঠবে। কিন্তু সে দুরন্ত চড়াই।

চন্দ্রাপুরীতে আমাদের বাস কয়েক মিনিটের জন্যে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বুঝতে পারি নি যে সেখানে চন্দ্রা নদী এসে মন্দাকিনীর সঙ্গে মিলেছে। এই চটিতে যে চন্দ্রশেখর মহাদেব ও দুর্গার মন্দির আছে তাও জানতে পারি নি। নিকটে ভিরি নামে একটি জায়গায় মন্দাকিনীর উপরে একটা পুল আছে। টেহরি থেকে একটা পায়ে চলার পথ বুদ্ধকেদারের উপর দিয়ে এইখানে এসে মিলেছে। ভীমসেনের মূর্তি আছে এইখানে। আমাদের বাসে স্থানীয় যাত্রী না থাকলে এ সব কথা আমরা জানতে পারতুম না।

কুণ্ড থেকে আমরা উপরে উঠতে লাগলুম। দু-আড়াই মাইল উঠেই গুপ্তকাশী। এর উচ্চতা ৪৮৫০ ফুট। একটা প্রশস্ত খোলা জায়গায় বাস মিনিট পনের দাঁড়ায়। জানতে পারলুম যে দুটি প্রাচীন মন্দির আছে এখানে—অর্ধনারীশ্বর ও চন্দ্রশেখর মহাদেবের। একটি কুণ্ডও আছে। মন্দাকিনীর পরপারে উখীমঠ দেখা যায় গুপ্তকাশী থেকে। হাঁটা পথে দূরত্ব মাত্র আড়াই মাইল। মাইল খানেক এগিয়ে নালা চটি থেকে উখীমঠে যাবার রাস্তা।

বাস থেকে নেমে হালদার মশাই বললেন: যাবেন নাকি মন্দির দেখতে?

বললুম ঃ এ বাস তাহলে ছেড়ে দিতে হবে।

সে আবার বিপদের কথা।

কেন ?

যাত্রীর ভিড় থাকলে বাসে জায়গা পাওয়া যাবে না।

বললুম ঃ আর এই বাসে ফাটা পৌঁছতে পারলে হয়তো সন্ধ্যার আগেই আমরা গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে যাব।

ত্রিযুগীনারায়ণ ?

ত্রিযুগীনারায়ণের কথা আমার মনে ছিল না। কেদারনাথের পথের উপরে নয়, একটু ঘুরে যেতে হয়। বললুম ঃ ফেরার পথেই বোধ হয় দেখার সুবিধে।

হালদার মশাই আপত্তি করলেন না। ইতিমধ্যে অনেক পথ তিনি হেঁটেছেন। শুধু যমুনোত্রীর পথে নয়, গঙ্গোত্রীর পথেও তাঁকে হাঁটতে হয়েছে। আবার হাঁটতে হবে কেদারনাথের পথে। বোধ হয় এই জন্যেই বললেন ঃ দেখা যাক, নারায়ণের কী ইচ্ছে।

ড্রাইভারকে বাসে উঠতে দেখে আমরাও উঠে পড়লুম। যাত্রীদের একবার দেখে নিয়েই বাস ছেড়ে দিল।

ফাটা চটি এখান থেকে ন মাইল দূরে। তার উচ্চতা ৫২৫০ ফুট। এ বছর বাস এই পর্যন্তই যাচ্ছে। এর পরেও মোটর পথ তৈরি হয়ে গেছে। আগামী বছরে যে সোনপ্রয়াগ পর্যন্ত বাস যাবে, সে সংবাদও আমরা পেয়েছি। তখন কেদারনাথে এক দিনেই যাওয়া যাবে। পায়ে চলার পথের দূরত্ব হবে বারো মাইলেরও কম।

পথে আমরা মাতা দেবী নারায়ণকোটি ও মৈখণ্ডার মহিষমর্দিনীকে প্রণাম করে বেলা পৌনে দশটার আগেই ফাটায় এসে নামলুম।

কাঁচা পথ। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে কাদা হয়েছে এখানে সেখানে। দু ধারে চালা ঘর। নানা রকমের জিনিসপত্র বিক্রি

হচ্ছে দোকানে। এরই মধ্যে চটি আছে, হোটেল খাবারের দোকান। ডাণ্ডিওয়ালা ঘোড়াওয়ালা কুলি পাণ্ডা ও যাত্রীতে সরগরম। বেশ একটা ব্যস্তসমস্ত ভাব।

আমি যখন মালপত্র নামাতে ব্যস্ত, তখন একজন পাণ্ডা স্বাতির হাতে তার পরিচয়পত্র দিল। স্বাতি বলল: পাণ্ডার দরকার আমাদের নেই।

কিন্তু হালদার মশাই বললেন: না মা, তা হয় না। তীর্থস্থানে পাণ্ডা একজন নিতেই হয়। সে আমার মতো মূর্খ হলেও ক্ষতি নেই।

স্বাতি বোধ হয় লজ্জা পেয়েছিল। তাই দূর থেকে আমি বললুম: আমাদের পাণ্ডা আছে।

কী নাম তার?

নাম তো জানি নে। তবে—

বলে আমি এক জনের নাম করলুম। তিনি প্রায় প্রতি বছরই আসেন হিমালয়ে। তাঁকে চেনে না এমন মানুষ এ অঞ্চলে নেই বলে জানি। তিনি আমাকে স্নেহ করেন অপরিমিত। বলেছিলেন, ও দিকে গেলে আমার পাণ্ডাকে খবর দিয়ে দেব। সে-ই সব ব্যবস্থা করে দেবে।

তাই হল। পরক্ষণেই এক ব্রাহ্মণ বিনীত ভাবে কাছে এসে নমস্কার করলেন। বললেন: এখনই যাত্রা করবেন তো? সব ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। একটুখানি অপেক্ষা করুন।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমাদের যাত্রার ব্যবস্থা হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ একজনকে ধরে আনলেন—একজন ঠিকাদার। ভদ্রলোক আমাদের মালপত্র পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলেন: সঙ্গে কী কী যাবে?

ব্রাহ্মণ বললেন: ইচ্ছা করলে অপ্রয়োজনীয় জিনিস-রেখে যেতেও পারেন।

স্বাতি বলল: স্যুটকেশটা রেখে যেতে পারি, তবে এক আধটা জিনিস বার করে নিতে হবে। বিছানা আর বড় ব্যাগটা সঙ্গে যাবে। হালদার মশায়ের জিনিসপত্রও।

সেই ঠিকাদাব বললেন: তবে একটা ছোকরাই বইতে পারবে। আপনারা ডাণ্ডিতে যাবেন, না ঘোড়ায় ?

স্বাতি বলল: ঘোড়ায়।

হালদাব মশাই আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালেন।

স্বাতি হেসে বলল: যদি নির্লজ্জ না ভাবেন, তাহলে পোশাকটা বদলে নেব।

সে সব তো ভাবনার কথা নয় মা, ভয় হল পড়ে যাবার। উঁচু নিচু পথ।

ব্রাহ্মণ বললেন: এঁর সাহস আছে। ইনি পারবেন।

আমি বললুম: ঝাঁসিব রানীর কথা ভুলে গেছেন হালদার মশাই! আবাব দেখতে পাবেন।

কিন্তু হালদার মশাই নিজে ঘোড়ায় উঠতে রাজী হলেন না। বললেন: যতক্ষণ এই পা দুখানা আছে, ততক্ষণ এর ওপবেই ভরসা বেশি। আব মালপত্র যখন অন্য লোকে বইবে—

বলে থেমে গেলেন।

ব্রাহ্মণ আমাদের স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে স্বাতিকে একটু আড়ালে পৌঁছে দিতে গেল। আর ঠিকাদার গেলেন দুটো ঘোড়া আনতে। পরক্ষণেই ফিরে এলেন, সঙ্গে একটি পাহাড়ী বালক। বললেন: বাহাদুর আপনাদের মাল বইবে। মাল ওজন করার পরে এর মজুরি ঠিক হবে।

দুটি ঘোড়াও এল। আর সেই ঘোড়া দেখে আমি আঁৎকে উঠলুম। হালদার মশাই একবার আমার দিকে আর একবার ঘোড়ার দিকে চাইলেন ভয়ার্ত চোখে। কাশ্মীরের গুলমার্গ বা পহলগামের মতো টাট্টু ঘোড়া নয়, এ যেন কলকাতার পুলিসের

ঘোড়া। যেমন লম্বা, তেমনি বলিষ্ঠ, কিন্তু হাবভাব শান্ত। তবু আমি করুণ স্বরে বললুম : এর চেয়ে ছোট ঘোড়া নেই ?

ঠিক এই মুহূর্তেই স্বাতি ফিরে এল। শাড়ির বদলে স্ল্যাক্স্ পরে নিয়েছে। এ বেশে আমি তাকে কোন দিন দেখি নি বলে একটু আশ্চর্য হয়েছিলুম। কিন্তু সে একেবারে স্বাভাবিক ভাবে বলল : তোমার ভয় করছে নাকি ?

বললুম : এ রকম ঘোড়ায় তো কখনও চড়ি নি !

ঘোড়াওয়ালা আমাদের সাহস দিল, বলল : কোন ভয় নেই বাবু, খুব শান্ত ঘোড়া। আর আমরা তো পাশে পাশেই চলব।

কাছেই কোনখান থেকে এক দল যাত্রী বোধ হয় যাত্রা করলেন। তারই ধ্বনি শুনলুম : জয় কেদার !

অন্যমনস্ক ভাবে আমিও বললুম : জয় কেদার !

৩২

যাত্রার আগে একটা দোকানে আমরা পুরি তরকারি খেয়ে নিলুম, আর খোয়ার মিষ্টি। ব্রাহ্মণ আমাদের তিনখানা লাঠি কিনে দিলেন। নিচে লোহার গজাল লাগানো লাঠি। পাহাড়ে পথ চলবার জন্যে দরকার। এই লাঠি ঘোড়াওয়ালার হাতে থাকবে, যখন হাঁটব তখন হাতে নেব আমরা। বাহাদুর আমাদের মালপত্র প্লাস্টিকের কাপড়ে জড়িয়ে নিল। আর ঠিকাদার আমাদের স্যুটকেশের একটা রসিদ দিয়ে গেলেন। এক টাকা ভাড়া দিতে হবে। ঘোড়া দুটির যাতায়াতের ভাড়া সত্তর টাকা। ষাট টাকার ঘোড়া নাকি এমন ভাল হত না। কুলির ভাড়া পাঁচসিকে মণ হিসেবে তিরিশ টাকা যাতায়াতের জন্যে। কেদারনাথে এদের খিচুড়ি খাওয়াতে হবে, মানে পয়সা দিতে হবে খাবার জন্যে।

জয় কেদার!

বলে আমরাও যাত্রা করলুম। ব্রাহ্মণ বললেন, তাঁর বড় ভাই কেদারনাথে আমাদের দেখাশুনো করবেন। ঘোড়াওয়ালারাই খবর দেবে।

স্বাতি বলল : এখন আমরা হাঁটব। হাঁটতে কষ্ট হলে উঠব ঘোড়ায়।

হালদার মশাই বললেন : ও দুটো কেন বইবে মা, ও তুমি ঘোড়াওয়ালার হাতে দাও।

স্বাতি আর দেরি না করে তার কাঁধের ব্যাগ আর ক্যামেরা ঘোড়াওয়ালার হাতে দিয়ে দিল। গল্প করতে করতে আমরা এগিয়ে গেলুম।

ফাটায় একটি ডাক বাংলো আছে পাহাড়ের উপরে। বেশ ভাল পরিবেশ। যাঁরা সন্ধ্যা বেলায় এসে পৌঁছবেন, তাঁরা সেখানে রাত্রিবাস করে ভোর বেলায় যাত্রা করতে পারবেন।

যাঁরা ত্রিযুগীনারায়ণ দেখে যাবেন, তাঁদের ভোর বেলাতেই যাত্রা করা উচিত। ফাটা থেকে ত্রিযুগীনারায়ণ সাড়ে সাত মাইল, আর ত্রিযুগীনারায়ণ থেকে গৌরীকুণ্ড সাড়ে ছ মাইল। ভোর বেলায় বেরোলে ত্রিযুগীনারায়ণ দর্শন করে সেই দিনই সন্ধ্যা বেলায় গৌরীকুণ্ডে পৌঁছনো সম্ভব। আর তা না হলে রাত্রিবাস করতে হবে ত্রিযুগীনারায়ণে। থাকবার জায়গার অভাব সেখানে নেই, পি. ডব্লু. ডি.র রেস্ট হাউসও আছে।

আমরা মোটর চলার উপযোগী প্রশস্ত পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ দেখলুম সামনেই একটা পায়ে চলার পথ নিচে নেমে গেছে। আর আমাদের বাহাদুর সেই পথেই পা বাড়িয়েছে। হালদার মশাই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। কিন্তু বাহাদুর ভ্রূক্ষেপ না করে নিচে নেমে গেল।

ঘোড়াওয়ালারা বলল, যাঁরা পায়ে হেঁটে যান তাঁদের ঐ পথ। ঐ পথও মোটর পথে মিলেছে খানিকটা এগিয়ে।

হালদার মশাই বললেন: তবে আমি ঐ ছোঁড়ার সঙ্গেই যাব।

বলে নিজের লাঠিটা রাস্তার উপরে ঠক ঠক করে ঠুকে নিচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমাদের পথের এক ধারে উঁচু পাহাড়, গাছপালার ছায়ায় শীতল হয়ে আছে। একটা হাল্কা স্লিপওভার গায়ে দিয়ে আমি চলেছি। স্বাতির গায়েও একটা পাতলা কার্ডিগান। বেশ ভাল লাগছে হাঁটতে। ঘোড়াওয়ালারা ঘোড়া নিয়ে আসছে আমাদের পিছনে।

স্বাতি বলল: কেদারনাথের পথ যে এই রকম তা আমি ভাবতেই পারি নি।

বললুম: এ পথ মোটর চলার জন্যে তৈরি হয়েছে, তাই এ পথ এই রকম। এ পথটুকু ফুরিয়ে গেলেই কেদারনাথের আসল পথ আমরা দেখতে পাব।

সামনের দিক থেকে ঘোড়ায় চেপে আসছিলেন এক ভদ্রলোক। আমাদের দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন : জয় কেদার!

আমরাও উত্তর দিলুম : জয় কেদার!

তার পরে আরও দু একজনকে দেখতে পেলুম। একজন বয়স্কা মহিলাকেও দেখলুম ঘোড়ার পিঠে। এক হাতে ঘোড়ার পিঠের জিন শক্ত করে ধরে আছেন, অন্য হাতে লাগাম। তাঁর দৃষ্টি পথের উপরে, আমাদের তিনি দেখতে পেলেন না। অন্যরা বললেন : জয় কেদার!

আমরাও উত্তর দিলুম : জয় কেদার!

স্বাতি বলল : এদের কেমন প্রসন্ন মুখ দেখেছ! অনেক তৃপ্তি নিয়ে যেন এঁরা ফিরছেন।

আর আমাদের উৎসাহ দিচ্ছেন এগিয়ে যেতে।

স্বাতি বলল : হিমালয়ে দীর্ঘ পথ হাঁটবার অভিজ্ঞতা এইবারে আমাদের প্রথম হবে, তাই না?

এই অভিজ্ঞতা কিন্তু মারাত্মক।

কেন?

বারে বারে ফিরে আসতে হবে, এমন প্রবল এর আকর্ষণ। অভিযাত্রীদের দেখো, দেশবিদেশ থেকে তারা বারে বারে আসছে। জয় পরাজয় তাদের কাছে যত বড়, তার চেয়ে বড় তাদের হিমালয়ে আসা। দার্জিলিঙে বা সিমলায় নয়, তাঁরা আসেন হিমালয়ের নানা দুর্গম স্থানে। এমন সব অজ্ঞাত অখ্যাত স্থান খুঁজে বার করেন, যার পথ শুধু স্থানীয় লোকেরাই জানে।

স্বাতি বলল : মাঝে মাঝে আমারও ইচ্ছা করে যে এই রকমের একটা দলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি।

বললুম : তার জন্যে শিক্ষার প্রয়োজন আছে। দার্জিলিঙে গিয়ে বেসিক ট্রেনিং নিতে হবে। তার পরে অ্যাড্‌ভান্স ট্রেনিং। বরফের উপর চলার শিক্ষা না থাকলে কোনও অভিযাত্রী দল তোমাকে সঙ্গে নেবে না।

স্বাতি কোনও উত্তর দিল না। কিছু মর্মাহত হয়েছে মনে করে বললুম: আমাদের জন্যে এই সব তীর্থপথ। শুধু কেদারনাথে নয়, চেষ্টা করলে পঞ্চকেদারে আমরা যেতে পারি।

পঞ্চকেদার!

বললুম: হ্যাঁ, পঞ্চবদ্রীর মতো পঞ্চকেদারও আছে। এই পঞ্চকেদার প্রতিষ্ঠার একটা গল্পও শুনেছি।

স্বাতির আগ্রহ দেখে সেই গল্পটি আমি বললুম। সত্য বা ত্রেতা যুগের গল্প নয়, দ্বাপরের গল্প। কলি যুগের প্রথমে প্রতিষ্ঠা হয়েছে কেদারনাথের। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে স্বজন হত্যার পাপ হয়েছিল পাণ্ডবদের। সেই পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাঁরা কাশীর বিশ্বনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বনাথ তাঁদের দর্শন দেবেন না বলে পালিয়ে এলেন হিমালয়ে। পাণ্ডবরাও তাঁকে অনুসরণ করে এখানে এলেন। যুধিষ্ঠির ধ্যানে সব দেখতে পাচ্ছিলেন, তিনি দেখলেন যে বিশ্বনাথ মহিষের রূপ ধারণ করে অন্যান্য মহিষের সঙ্গে মিশে আছেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে সেই মহিষটি দেখিয়ে দিতেই ভীম দেখলেন যে বিশ্বনাথ শিং দিয়ে মাটি খুঁড়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করছেন। বাধা দিলেন ভীম। মহিষের পিছনের অংশটাই শুধু বাহিরে রইল। এই অংশ হল কেদারনাথ। আরও চারটি জায়গায় তিনি রয়ে গেলেন। নাভি মধ্‌মহেশ্বরে আর তুঙ্গনাথে বাহু। মুখ রুদ্রনাথে আর কল্পেশ্বরে জটা। এই পাঁচটি জায়গাই এখন তীর্থ। পঞ্চকেদার। কেদারনাথ ও তুঙ্গনাথের নাম অনেকেই শুনেছে, কিন্তু মধ্‌মহেশ্বর রুদ্রনাথ ও কল্পেশ্বর তেমন পরিচিত নয়।

স্বাতি বলল: একি তোমার তৈরি গল্প নাকি?

হেসে বললুম: শিব নিজে এই পঞ্চকেদারের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন পার্বতীর কাছে।—

কেদারং মধ্যমং তুঙ্গং তথা রুদ্রালয়ং প্রিয়ম্।
কল্পকং চ মহাদেবি সর্ব পাপ প্রণাশনম্॥

কেদারে কেদারনাথ, মধ্যমে মধ্যমেশ্বর বা মধ্য মহেশ্বর, তুঙ্গে তুঙ্গনাথ, রুদ্রালয়ে রুদ্রনাথ ও কল্পকে কল্পনাথ বা কল্পেশ্বর। কেদার-খণ্ডের পাঁচটি হিমগিরির পাদদেশে এই পাঁচটি তীর্থে সর্বপাপ নাশ হয়।

স্বাতি বলল : এ যাত্রায় কি আমরা শুধু কেদারনাথ দেখব ?

বললুম : এ যাত্রাপথে আর কোনও তীর্থ তো পড়ে না !

তবে ?

স্বাতির এই প্রশ্নের উত্তরে আমি যতটুকু জানি ততটুকুই বললুম। গুপ্তকাশী থেকে কালীমঠ মাইল তিনেক দূরে। মন্দাকিনীর সঙ্গে কালী নদীব সঙ্গমস্থল থেকে কিছু দূরে কালী নদীর বাম তীরে অবস্থিত। এই তীর্থে আছে মহাকালী মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। গৌরীশঙ্কর মহাদেব ও ভৈরব। বশিষ্ঠ ও ব্যাসদেব এই তীর্থের উল্লেখ করে গেছেন বলে জনশ্রুতি আছে। মধ্‌মহেশ্বর এখান থেকে চোদ্দ মাইল উত্তরে চৌখাম্বা শৃঙ্গের নিচে মধ্‌মহেশ্বর নদীর মুখে। এর উচ্চতা প্রায় সাড়ে এগারো হাজার ফুট। শুধু এই তীর্থস্থানটি দেখবার জন্যে গুপ্তকাশী থেকে সাত হাজার ফুট উপরে উঠতে যাত্রীরা ভয় পান। সঙ্গীও পান না। বাস তো নেই, শুধু নিজের পায়েব উপরেই ভরসা। তার পরে ফিরে এসে কেদারনাথ আছে, তুঙ্গনাথ আছে—সে সব আরও বেশি উঁচুতে। তুঙ্গনাথ তো কেদারনাথের চেয়েও বেশি উঁচুতে।

স্বাতি বলল : মধ্‌মহেশ্বরে শুধু একটি মন্দির !

শিবের মন্দির। উপত্যকার মতো একটি জায়গায় পাথরের মন্দির। কারুকার্যহীন শিখর একটি, উপরে চতুষ্কোণ চালা। তার ওপরে ধাতুর দণ্ডে নিশান উড়ছে। খানিকটা তফাতে অরণ্যময় পাহাড়, পিছনে তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল : তুমি দেখেছ ?

হেসে বললুম : ছবি দেখেছি। অপরূপ মনে হয়েছে ঐ দৃশ্য,

তাই পরিষ্কার মনে আছে। যেমন কেদারনাথের মন্দির, না দেখলেও তা ভুলব না।

তার পরে বললুম : অন্যান্য মন্দিরের মতো এই মন্দিরও শীতের সময় বন্ধ থাকে। পাথরের শিবলিঙ্গ মন্দিরে ফেলে রূপার মহাদেব নিয়ে পূজারীরা নেমে আসেন উখীমঠে। কালীমঠ থেকে উখীমঠে আসবার জন্যে পায়ে চলার পথ আছে। মধ্‌মহেশ্বরের যাত্রীরা সাধারণত এই পথেই যাতায়াত করেন।

স্বাতি বলল : উখীমঠের কথা তুমি বল নি!

বললুম : কেদার-বদ্রীর যাত্রীর কাছে উখীমঠের আদর এখন কমে গেছে। কিন্তু কিছু দিন আগেও যখন কেদারনাথের যাত্রীকে হেঁটে যেতে হত বদ্রীনাথে, তখন উখীমঠের পথেই তাদের যেতে হত। কেদারনাথ থেকে নামবার সময় গুপ্তকাশীতে তারা আসত না। তার এক মাইল আগেই নালা চটি থেকে অন্য পথ ধরত। মন্দাকিনীর এপারে নালা চটি, ওপারে উখীমঠ। ব্যবধান মাত্র তিন মাইল। কিন্তু উৎরাই পথে নিচে নেমে মন্দাকিনীর পুল পেরিয়ে আবার উঠতে হত।

স্বাতি বলল : পথের কষ্ট খুব ছিল।

বললুম : আনন্দও ছিল। পুরনো যাত্রীদের কাছে শুনেছি যে সেকালের আনন্দ আর নেই। একালের সভ্যতাই নাকি নষ্ট করেছে সেকালের আনন্দকে।

তার পরে বললুম : উখীমঠ কেদারনাথেরও শীতাবাস। শীতের ছ মাস উখীমঠেই কেদারনাথের পূজো হয়। শিবের মন্দির আছে এখানে, কিন্তু মূর্তি সবই ধাতুর। শিব পার্বতী মান্ধাতা অনিরুদ্ধ ও ঊষা। বানাসুরের কন্যা ঊষা নাকি এইখানে তপস্যা করেছিল। ঊষার নামেই উখীমঠ। কৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধর সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল।

স্বাতি বলল : তুমি তো বলেছিলে আসামের শোনিতপুরে বানাসুরের রাজধানী ছিল!

তাই জানি। অসমিয়া ভাষায় অনিরুদ্ধ ও উষাকে নিয়ে অনেক সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে।

উখীমঠে আর কিছু নেই?

বললুম: নবদুর্গাও আছেন। আসলে উখীমঠ একটি সুন্দর পাহাড়ী শহর। ৪৩০০ ফুট উঁচু বলে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। বদ্রীনাথ কমিটির দানে স্থাপিত হয়েছে উত্তরাখণ্ড বিদ্যাপীঠ। মোটর বাস চলছে বলে শহরের উন্নতিও হচ্ছে।

তার পর?

বললুম: টুরিস্ট যারা, উখীমঠ থেকে তারা দিউরি তাল দেখতে যায়। মাইল ছয়েক উত্তর-পূর্বে আট হাজার ফুট উঁচুতে এই হ্রদের ধার থেকে চৌখাম্বা পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়—পাহাড়ের পাদ-দেশ থেকে উপরের বরফ পর্যন্ত। আধ মাইল লম্বা এই হ্রদের জলে কেদারনাথ বদ্রীনাথ প্রভৃতি গিরিশৃঙ্গগুলির পরিষ্কার ছায়া পড়ে ভোর বেলায়। টুরিস্টরা এই রূপ দেখে মুগ্ধ হয়।

কিন্তু তীর্থযাত্রীরা আরও অনেক উঁচুতে ওঠে তুঙ্গনাথ দর্শনে। উখীমঠ থেকে চামোলির পথে পনের মাইল দূরে চোপতা নামে একটি জায়গা থেকে তুঙ্গনাথের পথ উপরে উঠেছে। এই পাহাড়েব নাম চন্দ্রশিলা। তিন মাইলের কঠিন চড়াই ভেঙে উঠতে হয় উত্তরা-খণ্ডের সব চেয়ে উঁচু তীর্থ তুঙ্গনাথে। তুঙ্গনাথ পুরো বারো হাজার ফুট উঁচু। আর শ্রান্ত ঘর্মাক্ত দেহে উপরে পৌঁছে নাকি জীবন সার্থক মনে হয়।

কেন?

চোখের সামনে দেখা যায় যমুনোত্রী থেকে বদ্রীনাথ পর্যন্ত বিস্তৃত তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী।

স্বাতি বলল: ছবি দেখেছ বুঝি?

দেখেছি। কিন্তু সামনে দুটি নীল পাহাড় পিছনের বরফ-পাহাড়ের অনেকখানি আড়াল করেছে। দূরে থেকে ছবি না নিলে

এই বরফের পাহাড় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যাবে। মন্দিরের গড়ন ঠিক মধ্‌মহেশ্বরের মতোই। সামান্য যা প্রভেদ আছে, তা এখন মনে পড়ছে না। তুঙ্গনাথ হলেন তৃতীয় কেদার। এখানে তাঁর বাহুর পূজো হয়।

তুঙ্গনাথের মন্দির যে চন্দ্রশিলা পাহাড়ের শিখরে নয়, তা মনে পড়ে গেল। শুনেছি, অনেক টুরিস্ট নাকি এই পাহাড়ের শিখরেও ওঠে। পায়ে হাঁটা সরু পথ ধরে প্রায় মাইলখানেক উঠলে পৌঁছনো যায় চন্দ্রশিলায়। এ জায়গার উচ্চতা হল প্রায় তের হাজার ফুট। টুরিস্টরা এইখান থেকে অপ্রতিহত দৃষ্টিতে দেখে হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী—যমুনোত্রী থেকে বদ্রীনাথ পর্যন্ত সমস্ত শিখরগুলি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সামনে কোনও অবরোধ নেই। তীর্থের টানে মানুষ তুঙ্গনাথে ওঠে, আর চন্দ্রশিলায় ওঠে সৌন্দর্যের আকর্ষণে।

স্বাতি প্রশ্ন করল : রুদ্রনাথ কি তুঙ্গনাথের পথেই ?

বললুম : না। তুঙ্গনাথ থেকে অন্য পথ ধরে নিচে নামলে মণ্ডল চটি চামোলির পথের উপরে। চামোলি জেলার সদর গোপেশ্বর মণ্ডল চটি থেকে সাড়ে চার মাইল দূরে, আর সেখানে চামোলি মাত্র মাইল তিনেক। রুদ্রনাথ যেতে হলে মণ্ডল চটি থেকেই ব্যবস্থা করতে হয়। এই চটির কাছেই একটা জায়গা থেকে অনসূয়া দেবীর পায়ে চলার পথ বেরিয়েছে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : অনসূয়া দেবী !

বললুম : অনসূয়া দেবীর মন্দির। ছ মাইল দূরে সাড়ে ছ হাজার ফুট উঁচুতে গভীর বনের মধ্যে এই মন্দির। খানিকটা তফাতে মন্দিরের নিচে অমৃতকুণ্ড নামে একটি মস্ত জলপ্রপাত আছে। অত্যন্ত মনোরম স্থান বলে শুনেছি। মণ্ডল চটি থেকে এক দিনেই দেখে ফিরে আসা যায় স্বচ্ছন্দে। কিন্তু—

বল।

রুদ্রনাথ সেখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে। এই পাঁচ মাইলে পাঁচ হাজার ফুটেরও বেশি উঠতে হয়। রুদ্রনাথের উচ্চতা প্রায় কেদার-নাথের সমান। কিন্তু পথ অত্যন্ত দুর্গম এবং গাইড ছাড়া এ পথে যাতায়াত এক রকম অসম্ভব। মণ্ডল চটি থেকেই তাই যাত্রার সমস্ত আয়োজন করে বেরোতে হয়।

আমি জানতুম যে স্বাতি আমাকে এই মন্দিরের কথাও জিজ্ঞাসা করবে। এই মন্দিরের ছবিটি স্মরণ করার চেষ্টা করলুম। শিখর-বিশিষ্ট কোনও মন্দিরেব ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল না। মনে হল যেন দু চালেব একটি পাথরের ঘরের ছবি দেখেছি, পিছনে বড় বড় গাছ আর পাহাড়। বরফের পাহাড আছে সবার পিছনে। স্বাতিকে সংক্ষেপে আমি এই কথা বললুম। আরও একটি কথা বললুম : ছ মাসের জন্যে রুদ্রনাথকেও নিচে নামতে হয়। কিন্তু তিনি উখীমঠে যান না, কেদার-বদ্রী মন্দির কমিটির অধিকার নেই রুদ্রনাথের উপরে। শীতের ছ মাস তিনি গোপেশ্বরে থাকেন।

প্রশস্ত পথ ধবে গল্প করতে করতে আমরা এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে কেদারনাথ ফেরত যাত্রীর সঙ্গে। কেউ পায়ে হেঁটে ফিরছেন, কেউ ঘোড়ায় চেপে। ডাণ্ডিতে বসেও ফিরছেন অনেক বৃদ্ধ ও মহিলা। কেউ কাউকে নমস্কার করছেন না, বলছেন জয় কেদার! আমরাও উত্তরে বলছি, জয় কেদার! জয় হিন্দের মতো এই অভিবাদন সারা কেদারনাথের পথে ধ্বনিত হচ্ছে।

স্বাতি বলল : আর একটি কেদারের কথা বাকি রইল।

বললুম : কল্পনাথ বা কল্পেশ্বরের কথা।

স্বাতি বলল : বদ্রীনাথের পথে এই নামটি যেন শুনেছিলুম।

ঠিকই মনে আছে। কল্পেশ্বর দর্শনের জন্যে বেশি পরিশ্রমের দরকার নেই। যোশীমঠে পৌঁছবার আগেই হেলাং নামে একটা জায়গায় নেমে পড়তে হয়। বাস থামে এইখানে। তার পরে

নিচে নামতে হয় অলকনন্দার তীরে। সে জায়গার নাম ত্রিবেণী। একটি পাহাড়ী নদী আর একটি ঝর্ণা—এই তিনে মিলেই বোধ হয় ত্রিবেণী নাম হয়েছিল। ত্রিবেণীতে অলকনন্দার জল পেরিয়ে ন মাইল দূরে উর্গম উপত্যকায় এই কল্পেশ্বর। সৌন্দর্যের জন্যেই এই জায়গাটি পরিচিত।

মন্দির ?

যত দূর মনে পড়ছে, ছবিতে আমি এ মন্দিরেরও কোন শিখর দেখি নি। সাদামাটা পাথরের ঘর একখানি। দেবতা বোধ হয় তারই মধ্যে আছেন।

সহসা সামনে দুখানা লরি ও একখানা জীপ গাড়ি দেখতে পেলুম। তার পরে আর এগোবার পথ নেই। আমরা দাঁড়িয়ে গেলুম। ঘোড়াওয়ালারা এগিয়ে এসে বলল: মোটরের পথ এই পর্যন্তই তৈরি হয়েছে। এগুলো সরকারী গাড়ি। অনুমতি নিয়ে যাত্রীদের ট্যাক্সিও এই পর্যন্ত আসে।

তার পর ?

সোনপ্রয়াগ পর্যন্ত এই পথ তৈরি হচ্ছে। কাজ হচ্ছে খুব দ্রুত। আগামী বছরে বাস চলবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এখন আমাদের একটা সাময়িক পথ ধরে এগোতে হবে।

বলে পাহাড়ের উপরে ওঠার একটা পথ দেখিয়ে দিল।

বেশি উপরে উঠতে হয় না। খানিকটা উপর দিয়ে এই পথ সামনে এগিয়েছে। নিচের পথে কাজ হচ্ছে। সর্বত্র পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে, ছোটখাট পুল তৈরি করা হচ্ছে স্থানে স্থানে। কখনও উপরে কখনও নিচে দিয়ে আমরা চলতে লাগলুম। অনভ্যস্ত বলে হাঁটতে বেশ অসুবিধা হতে লাগল। তাই দেখে ঘোড়াওয়ালারা বলল: এইবারে ঘোড়ায় উঠুন।

খানিকটা ভয় আছে, কষ্ট লাঘব হওয়ার আশাও আছে খানিকটা। আবার অ্যাডভেঞ্চারের শখও আছে। একখানা উঁচু

পাথরের গায়ে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে তারা স্বাতিকে ঘোড়ায় তুলে দিল। বেশ সামনে বসে স্বাতি আমার দিকে ফিরে কৌতুকের হাসি হাসল।

আমিও তারই মতো করে ঘোড়াওয়ালাদের সাহায্যে উঠে পড়লুম। পড়ে যাবার ভয় হয়েছিল একটু, কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নলুম। পাশাপাশি যাবাব পথ নেই, তাই স্বাতির পিছনেই আমি চলতে লাগলুম। খুব সাবধানে, খুব সতর্ক ভাবে।

আমাব ঘোড়াওয়ালা বলল : আর একটু পরেই স্বচ্ছন্দে চলতে পারবেন।

৩৩

কখন আমরা রামপুর পেরিয়ে এসেছিলুম খেয়াল করি নি। ফাটা থেকে রামপুর তিন মাইল দূরে। আমরা আরও দেড় মাইল এগিয়ে এলুম। আমার ঘোড়াওয়ালা বলল: এই জায়গার নাম পাটাগড়, আর এই পথ হল ত্রিযুগীনারায়ণের।

স্বাতি এই কথা শুনতে পেয়েছিল, বলল: ত্রিযুগীনারায়ণের পথ!

ঘোড়াওয়ালা বলল: এখান থেকে তিন মাইল চড়াই ভাঙতে হয়। ভোর বেলায় বেরোলে ত্রিযুগীনারায়ণ হয়ে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছনো যেত। পথে শাকম্ভরী দেবীর মন্দির।

স্বাতি বলল: শাকম্ভরী দেবীর নাম শুনি নি তো!

বললুম: শাকম্ভরী হলেন মনসা দেবী।

ত্রিযুগীনারায়ণের পথে না গিয়ে আমরা সোজা পথে গৌরীকুণ্ডের দিকে এগোলুম। শুনেছি, এই সব পথে পথশ্রমের কথা যাত্রীদের বারে বারে ভুলে যেতে হয়। পথের বাঁকে বাঁকে এমনি সব দৃশ্য চোখের সামনে ধরা দেয় যা দেখবার সৌভাগ্যের কথা স্বপ্নেও মনে হয় না। ছোট বড় পাথর আর অরণ্যময় পাহাড়, ঝর্ণা আর নদীর কলোচ্ছ্বাস, তুষারাচ্ছন্ন গিরিশ্রেণী—এই সমস্ত মিলে এমন একটি পরিবেশ রচিত হয়েছে যে মনকষ্টের দিকে না গিয়ে সামনের সৌন্দর্য উপভোগেই ব্যস্ত থাকে। একটা অদৃশ্য আকর্ষণ সকল যাত্রীকে টেনে নিয়ে চলে সামনের দিকে।

ত্রিযুগীনারায়ণে পৌঁছেও নাকি মনে হয় যে জীবন সার্থক হয়ে গেল। এক দিক থেকে গঙ্গোত্রীর পথ ধীরে ধীরে নেমে এসেছে—মাল্লা চটি থেকে বুদ্ধকেদার হয়ে ১১৩৬৪ ফুট উঁচুতে পানওয়ালি, তার পরে ত্রিযুগীনারায়ণ; অন্য দিক থেকে উঠে এসেছে রুদ্রপ্রয়াগের

পথ—পাটাগড় থেকে ত্রিযুগীনারায়ণ। আর তৃতীয় পথ সোন-প্রয়াগের দিকে ধীরে ধীরে নেমে গিয়ে কেদারনাথের পথের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কিন্তু ত্রিযুগীনারায়ণে এসে উত্তর দিগন্তের দিকে খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকতেই হবে। বরফের এমন সুন্দর দৃশ্য মনে হবে আর কোথাও দেখি নি। মন যখন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তখন মনে পড়বে তীর্থের কথা—ত্রিযুগীনারায়ণের কথা। ইনি হলেন তিন যুগের সাক্ষী নারায়ণ। হরপার্বতীর বিবাহ দিয়েছিলেন এইখানে। আজও সেই অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলছে। যাত্রীরা এই কুণ্ডে কাঠ কিনে দিচ্ছে, কিংবা কাঠের দাম দিয়ে যাচ্ছে সেই কাঠ পোড়াবার জন্যে। এই আগুন কোন দিন নিভবে না, যাত্রীদের ভক্তিতেই চিরকাল জ্বলবে এমনি ভাবে।

শুনেছি এই ত্রিযুগীনারায়ণে আরও চারটি কুণ্ড আছে—সে জলের কুণ্ড, আগুনের নয়। সেগুলির নাম হল ব্রহ্মকুণ্ড বিষ্ণুকুণ্ড রুদ্রকুণ্ড ও সরস্বতীকুণ্ড। এই সব কুণ্ডে যাত্রীরা স্নান তর্পণ করেন। ত্রিযুগীনারায়ণে ধর্মশালা আছে, দোকান পাটও আছে। রাত্রিবাসের কোন অসুবিধা নেই। সব জেনে শুনেও আমরা ত্রিযুগীনারায়ণের দিকে এগোলুম না, আমরা এগিয়ে গেলুম কেদারনাথের পথে।

ঘোড়ায় চেপে আমরা অস্থায়ী পথে চলেছি। খানিকটা অসুবিধা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু গড়িয়ে পড়ার ভয় দূর হয়ে গেছে। অভ্যাস নেই বলে শক্ত জিনের উপরে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। আর সোজা থাকবার জন্যে রেকাবের উপরে পা চেপে থাকতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যে নামবার পরে পা টনটন করবে। তবু আমরা সব কিছু দেখতে দেখতে আনন্দেই চলেছি।

এক সময় আমরা সোনপ্রয়াগে পৌঁছে গেলুম। পথের খানিকটা নিচে একটা জায়গা চেঁচে ছুলে বেশ প্রশস্ত করা হয়েছে। তার চারি দিকে দোকান পাট। সামনের বছর এইখেনেই বাস স্ট্যাণ্ড

হবে। তখন ফাটায় আর নামতে হবে না, রুদ্রপ্রয়াগের বাস সোজা এসে সোনপ্রয়াগে দাঁড়াবে। যারা পথ নির্মাণের কাজ করছে, তাদেরই একজনকে জিজ্ঞাসা করে এই খবর পেলুম।

সোম বা বাসুকি নদী এখানে মন্দাকিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে বলে এই জায়গাকে সোমদ্বার বা সোমপ্রয়াগ বলে। সোনপ্রয়াগও বলে অনেকে। ত্রিযুগীনারায়ণের পথ এসে এইখানে মিলেছে—সাড়ে তিন মাইল উৎরাইএর পথ। নদীর উপরে একটি সুন্দর পুল আছে, এই পুল পেরিয়ে চড়াইএর পথে গৌরীকুণ্ড মাইল তিনেক দূরে। গৌরীকুণ্ডে আজ আমাদের রাত কাটাতে হবে।

আকাশের সূর্য কখন অন্তর্হিত হয়েছিল, তা খেয়াল করি নি। বড় গাছপালায় ছায়াচ্ছন্ন দেখেছি সোমদ্বার। তার পরেও আর পথের উপরে সূর্যালোক দেখছি না। তবু ভরসা হচ্ছে যে অন্ধকার হবার আগেই আমরা এই তিন মাইল পথ অতিক্রম করতে পারব।

এখন আমি আগে চলেছি, স্বাতি আমার পিছনে। কিন্তু হালদার মশাইকে দেখতে পাচ্ছি না। তিনি এগিয়ে গেছেন, না পিছিয়ে পড়েছেন, তাও বুঝতে পারছি না। আমার ঘোড়াওয়ালা বলেছিল যে তার জন্যে কোনও ভাবনা নেই। এই পাহাড়ের পথে সবাই কাছাকাছিই থাকে—ঘোড়া ডাণ্ডি আর কুলি। সাধারণত ঘোড়া আগে, তার পর ডাণ্ডি, পদযাত্রী তার পরেই আসে। গৌরীকুণ্ডে কুলির জন্যে আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।

স্বাতির ঘোড়ার শব্দ আমি ঠিক পিছনেই শুনতে পাচ্ছিলুম। জিজ্ঞাসা করলুম : কেমন লাগছে ?

স্বাতি এ কথার উত্তর না দিয়ে বলল : রাতে কোথায় উঠবে ভাবছ ?

বললুম : গৌরীকুণ্ডে থাকবার অনেক জায়গা আছে—ডাক বাংলো মন্দির কমিটির রেস্ট হাউস ধর্মশালা চটি—

বুঝেছি।

বলে স্বাতি আমাকে থামিয়ে দিল। কোথায় উঠব তা যে স্থির করতে পারি নি, সে কথা সে ঠিকই বুঝেছে।

তখনও আমরা গৌরীকুণ্ডে পৌঁছই নি, পিছনে ঘোড়াওয়ালাদের ডাক শুনে দুজনেই আমরা থমকে দাঁড়ালুম।

ব্যাপার কী ?

একজন ঘোড়াওয়ালা কাছে এসে বলল : যদি ডাক বাংলোয় থাকতে চান তো এই পথে পাহাড়ে উঠতে হবে।

কত উপরে ?

তা খানিকটা উঠতে হবে বৈকি।

স্বাতি বলল : খাবার জন্যে আবার নিচে নামতে হবে তো ?

হ্যাঁ।

মন্দির কমিটির রেস্ট হাউস ?

সে সামনে বাজারের মধ্যে।

স্বাতি বলল : সেইখানেই আমরা থাকব। কত দূর এখান থেকে ?

খুব কাছে।

তবে আমরা এইখানেই নামব।

বলে ঘোড়াওয়ালাকে সাহায্যের জন্যে ডাকল।

বেশ কসরৎ করে নামতে হয়। দুজন লোক তাকে সাবধানে নামিয়ে নিল। আমিও তাদের সাহায্য নিয়ে নামলুম।

সত্যিই পা দুখানা এখন টনটন করছে, আর ব্যথা করছে পিছনটায়। এতক্ষণ ঘোড়ায় চড়ার ইচ্ছা ছিল না। মাঝে মাঝে হাঁটতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু নামা ওঠার ভয়ে সে কথা বলতে পারি নি। এখন একটু খোঁড়াতে দেখে ঘোড়াওয়ালা বলল : গৌরীকুণ্ডে গরম জলের কুণ্ড আছে। সেখানে স্নান করলেই সব ব্যথা মরে যাবে।

স্বাতি বলল : সন্ধ্যা বেলায় স্নান !

গৌরীকুণ্ডে পৌঁছেই তো যাত্রীরা স্নান করতে ছোটে, আবার ভোর বেলায় স্নান করে যাত্রা করে কেদারনাথ। কেদারনাথে মন্দাকিনীর জল তো বরফ গলা জল! খুব কম যাত্রী জলে নামতে সাহস পায়!

আমি বললুম: তোমাদের একজন এইখানে থাক, আর একজন চল আমাদের সঙ্গে। হালদার মশাইকে নিয়ে মন্দিরের রেস্ট হাউসে এস।

কিন্তু রেস্ট হাউসে আমরা জায়গা পেলুম না। একখানি ঘর খালি ছিল, তা একটু আগেই এক ভদ্রলোক দখল করেছেন। দুখানা খাট আছে, কিন্তু তিনি একা থাকবেন। ফিরিয়ে দিলেন আমাদের।

আমি বললুম: তবে কি ডাক বাংলোয় যাবে?

পাগল!

স্বাতির কথায় আশ্চর্য হয়ে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল: তীর্থের পথে এসেছি, চটিতে থাকব।

প্রতিবাদ করে লাভ নেই বলে কাছেই একটা চটিতে গিয়ে উঠলুম। দোতলায় ঘর পেলুম একখানা, মেঝের উপরে ঘরজোড়া মাদুর বেছানো। আর কোনও আসবাব নেই। পিছনের দিকের বারান্দায় একটা পায়খানাও আছে। কাজেই আশ্বস্ত হওয়া গেল যে ভোর বেলায় নদীর ধারে যেতে হবে না। এই চটিওয়ালাই আমাদের রাতের আহার তৈরি করে দেবে—ভাত ডাল আর আলুর তরকারি—স্পেশাল মীল। তার জন্যে তাকে ঘণ্টা দুই সময় দিতে হবে।

স্বাতি বলল: ঠিক আছে। এই সময়ে একটু চা খেয়ে আমরা গৌরীকুণ্ডে স্নান করে আসব। তুমি হালদার মশাইকে ধর, আমি কাপড় বদলে আসি।

রাস্তায় বেরিয়েই আমি হালদার মশাইকে দেখতে পেলুম। আর আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন: কোথায় গিয়েছিলেন মশাই! খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান হয়ে গেলুম!

বাহাদুর তাঁর পিছনেই ছিল। তাকে আমি উপরের ঘর দেখিয়ে দিলুম। নিঃশব্দে সে উপরে উঠে গেল। আর হালদার মশাইকে বললুম: সামনের ঐ দোকানটায় চা তৈরি করছে না?

চা!

বলে হালদার মশাই এক গাল হাসলেন। বললেন: এ দিককার চায়ের আস্বাদ বেশ ভাল, জানেন! সারা পথেই পকৌড়া জিলিপি আর চায়ের দোকান দেখছি!

তাঁর কথা শুনে আমি হাসলুম। আর হালদার মশাই চটে গিয়ে বললেন: হাসছেন কি! ঘোড়ায় চেপে এসেছেন, হাঁটার যে কী সুখ তা বুঝবেন কী করে! ঐ চটিগুলো ছিল বলেই এখানে পৌঁছতে পেরেছি।

তাঁকে ডেকে নিয়ে আমি দোকানের সামনে চলে এলুম, বললুম: গরম চা চাই।

এই চা আমাদের হাতে আসবার আগেই স্বাতি এসে উপস্থিত হল। তার হাতে কাপড় গামছার একটা প্যাকেট। এসেই হালদার মশাইকে বলল: আপনিও আমাদের সঙ্গে স্নান করতে যাবেন।

এই অবেলায় স্নান করতে হবে!

হালদার মশাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

আমি হেসে বললুম: গরম জলে স্নান করলে গায়ের ব্যথা মরবে হালদার মশাই। ভাল লাগলে কাল ভোরেও একবার স্নান করে নেওয়া যাবে। কেদারনাথে পৌঁছে আর ভাবনা থাকবে না।

ব্যাপারটা হালদার মশাই বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাই স্বাতি বলল, এখানকার নিয়মই এই। চা খেয়ে আপনার

কাপড় গামছা নিয়ে আসুন, ওপরে আমাদের ঘরে আপনার জিনিস-পত্র আছে।

চায়ের পাট শেষ করে আমরা স্নান করতে এগোলুম। কেদার-নাথের পথে সাড়ে ছ হাজার ফুট উঁচুতে গৌরীকুণ্ড একটি জমজমাট জায়গা। যাত্রীদের জন্য অনেক বাসস্থান আছে। অনেক দোকান পাট। জলের কুণ্ড আছে ছুটি; লাল জলের একটি কুণ্ডের নামে গৌরীকুণ্ড নাম। গৌরী নাকি ঋতুস্নান করেছিলেন এই কুণ্ডের জলে। জল খুব শীতল, তাই যাত্রীরা এখানে স্নান করে না। পথের ধারে এই কুণ্ডটিও আমরা দেখলুম, কিন্তু অন্ধকারে জলের রঙ ভাল দেখতে পেলুম না।

আমরা যে কুণ্ডে স্নান করতে যাচ্ছি, তার জল উষ্ণ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে সেই কুণ্ডটি মন্দাকিনীর নিকটে। সেখানে পৌঁছে দেখলুম যে এই অবেলাতেও স্নানার্থীর বেশ ভিড় আছে। চারি দিকের বাঁধানো চত্বরে অনেক মেয়ে পুরুষ। কেউ স্নান শেষ করে কাপড় বদলাচ্ছে, কেউ স্নান করছে। আর কেউ অপেক্ষা করছে স্নানের জন্যে। আমরাও ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলুম জলের ধারে।

রীতিমতো গরম জল। কুণ্ডে নামা যায় না। যাত্রীরা ঘটিতে জল নিয়ে গায়ে সইয়ে স্নান করছে। জলের ধারা পড়ছে ওপর থেকে। যারা সেই ধারার কাছে পৌঁছতে পেরেছে, তারা সেই ধারার জলেই ধীরে ধীরে স্নান করে নিচ্ছে। আমরাও স্নান করে নিলুম। বাঁধানো চত্বরে দাঁড়িয়ে কাপড়ও বদলে নিলুম। তার পরে ফেরার পথ ধরলুম।

গৌরীকুণ্ডে নাকি ছুটি মন্দির আছে—পার্বতী আর কৃষ্ণের মন্দির। একটি মন্দিরের সঙ্গে সৌভরি মুনির কাহিনী যুক্ত। বৃদ্ধ ঋষি রাজা মান্ধাতার পঞ্চাশটি কন্যাকে বিবাহ করে সংসারী হয়েছিলেন, ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর তপস্যার কথা। কিন্তু অন্ধকারে

এই সব মন্দির দেখার আগ্রহ আমাদের হল না। স্নান করে প্রচুর আরাম পাওয়া গেছে। পথের ক্লান্তি দূর হয়েছে অনেকখানি। এইবারে খেয়ে শুয়ে পড়তে হবে। খাবারের অর্ডার দেওয়াই আছে। ফিরেই হয়তো খাবার পাব। তার পরে ঘুম।

কেদারনাথ এখান থেকে ন মাইল দূরে। এই ন মাইলে পাঁচ হাজার ফুটেরও বেশি উপরে উঠতে হবে। ভোর বেলায় বেরোতে পারলে দুপুরে মন্দির বন্ধ হবার আগেই আমরা পৌঁছতে পারব। ভারি ভাল লাগছিল এই কথা ভাবতে। বললুম : হালদার মশাই, কাল অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়তে চাই।

কেন ?

বলে হালদার মশাই আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম : তাহলে সকাল বেলাতেই কেদারনাথের দর্শন পাব।

একটা ভেংচি কেটে হালদার মশাই বললেন : পাগল !

এইবারে আমি প্রশ্ন করলুম : কেন ?

কেন আবার ! কেদারনাথ আপনাকে দর্শন না দিলে কি আপনি তাঁর দর্শন পাবেন ভাবছেন ! সে আশা আপনার দুরাশা। ভাববেন না যে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছেছেন বলে কেদারনাথেও পৌঁছে যাবেন।

তাঁর এই মন্তব্য শুনে আমি আশ্চর্য হলুম।

একটু থেমে তিনি নরম সুরে বললেন : কেদারনাথের ওপরেই সব ছেড়ে দিন। তিনি আপনাকে সময় মতোই দেখা দেবেন।

হালদার মশায়ের এই কথাটি আমার ফেরার পথে মনে পড়েছিল। এ যে কত বড় সত্য কথা তাও বিশ্বাস করেছিলুম। সাধন গুপ্ত ও তাঁর স্ত্রীর দেখা পেয়েছিলুম এইখানে একটা চটির এক তলায়। মেঝের চাটাইএর উপরে শুয়েছিলেন ম্যানিলা গুপ্ত। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর কোমরে আঘাত লেগেছে। ডাক্তার মনে করছেন যে কোনও হাড় ভেঙে থাকাও আশ্চর্য নয়। তাই

ডাণ্ডিতে বসে ফিরে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে ফাটা ও সোনপ্রয়াগের মাঝে নতুন পথের শেষ প্রান্তে। কুলিরা ডাণ্ডি সংগ্রহ করতে গেছে। তাঁরা এখান থেকেই ফিরে যাবেন। এত আয়োজন, এত অর্থব্যয়, সব ব্যর্থ হল। কেদারনাথে পৌঁছতে তাঁরা পারলেন না। তাঁদের জন্যে আমরা দুঃখ প্রকাশ করেছিলুম। আর কিছু করবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। হালদার মশাই বলেছিলেন, দেখলেন তো, যাবার পথে কী বলেছিলুম আমি!

ঠিকই বলেছিলেন। দেবতা দর্শন দেন, তাঁকে আমরা দেখতে পাই না।

৩৪

আশ্চর্য দেশ! প্রত্যুষের আলো পৃথিবীকে স্পর্শ করবার আগেই আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। যাত্রার জন্যে আমরা যখন তৈরি হয়ে নিলুম, আকাশ তখন স্বচ্ছ হয়ে গেছে। বিগত দিনের কোন ক্লান্তি নেই, নতুন উদ্যমে মন যাত্রার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

স্বাতি বলল: মন্দাকিনীতে স্নান করা কি সত্যিই অসম্ভব?

আমি বললুম: হার্ট ফেল করার সম্ভাবনা আছে।

তবে আমরা গৌরীকুণ্ডেই স্নান করে যাব।

স্বাতির অসুবিধাই যে সব চেয়ে বেশি, তা আমি জানি। তাই প্রতিবাদ করার প্রয়োজন নেই। আমি তার মুখের দিকে তাকাতেই বলল: তোমার কোনও ভাবনা নেই।

দেখলুম যে গত রাত্রির স্নান করার কাপড় গামছা তার সঙ্গেই ছিল। নিজে শাড়ি পরে বেরিয়েছে। ঘোড়ায় চড়ার পোশাক আছে পাট করা। সেই চায়ের দোকানটায় উনুনে জল বসানো আছে, একটু দাঁড়ালেই হয়তো চা পাওয়া যাবে। কিন্তু স্বাতি বলল: আজ আর ওদিকে তাকিয়ো না।

হালদার মশাই বললেন: ঠিক বলেছ মা, দেহের ক্ষুধা ভুলতে পারলে মন পবিত্র হয়।

গরম জলের কুণ্ডের কাছে পৌঁছে হালদার মশাই বললেন: তুমি আগে স্নান করে এসো, তার পরে আমরা যাব।

স্বাতি তার ব্যাগটি আমার হাতে দিয়ে এগিয়ে গেল। গতকালও আমি তার ব্যাগ এমনি করে সামলে ছিলুম।

হালদার মশাই একবার আকাশের দিকে তাকালেন, আর একবার চারি ধারের ঘর বাড়ির দিকে। পথঘাট নির্জন। যারা জেগেছে, তারা ব্যস্ত আছে নিজ নিজ কাজে। কুণ্ডের চত্বরেও এখন লোকজন

নেই। হালদার মশাই এবারে আমার দিকে চেয়ে বললেন: আপনাকে প্রথম দেখেছিলুম রামেশ্বরে, তাই না?

বললুম: না। গোদাবরী স্টেশনে আপনি আমাদের গাড়িতে উঠেছিলেন। তার পরে দেখা হয়েছে রামেশ্বরে।

হালদার মশাই বললেন: রামেশ্বরের কথাটাই মনে আছে। আপনারা দুজনে সারা রাত বাইরে ছিলেন, আর গোঁসাইজীরা ভেবে অস্থির। আর আপনারও বলিহারি সাহস দেখেছিলুম।

তাঁর সেদিনের কথাগুলি আমার মনে আছে। চাপা গলায় বলেছিলেন, বাঘের মুখে যাচ্ছেন অবলীলাক্রমে, প্রাণের মায়া নেই এতটুকু! আমার মনে হয়েছিল যে বাঘের কানেও বোধ হয় তাঁর সেই গর্জন পৌঁছেছিল। তার পরে কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে প্রশ্ন করেছিলেন, কোথায় ছিলেন রাত্তিরে? তাঁর পুরু ঠোঁটের ফাঁকে নোংরা দাঁতের পাটিও আমি দেখতে পেয়েছিলুম। আর সেই অভদ্র ইঙ্গিত শুনে ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর ঐ খোঁচা দাড়িওলা ফুলো গালে একটা চড় কষে দিই।

সেদিন আরও অনেক ইতর অভদ্র ইঙ্গিত করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ছেলেমানুষি করে নিজের ইহকালটি ঝরঝরে করলেন! অমন পয়সাওয়ালা মামা, কোথায় আখেরে গুছোবেন, তা নয় সুন্দর মুখ দেখেই সব ভুললেন! পরামর্শ দিয়েছিলেন, নিজের ভবিষ্যৎটা আগে গুছিয়ে নিন। সঙ্গতি থাকলে মেয়ে অনেক জুটবে বাঙলা দেশে। আমি ঘুমের ভান করলে আরও কদর্য ইঙ্গিত করেছিলেন, সারা রাত্তির রাসলীলা করছেন কেষ্ট ঠাকুর, ঘুমের আর দোষ কী!

স্বাতির মা বাবার ভয়ের কারণ জেনেছিলুম পরে। স্বাতির বাবা বলেছিলেন, ধর্মশালায় কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদারকে দেখলুম। ধর্মের নামে অধর্ম করে হাত পাকিয়েছে। লক্ষ্মীছাড়া মন্ত্রের নামে নিন্দে ছড়ায়, আর ধর্মসভায় পরচর্চা করে। দেশে

ফিরে যা দুর্যোগ আসবে, তাই ভেবেই মরে যাচ্ছেন তোমার মামী। এ দেশে মুখরোচক মিথ্যে তো কেউ যাচাই করে দেখে না!

সেই হালদার মশাই আজ আমাদের সঙ্গে কেদারনাথে চলেছেন। আমি এই ভদ্রলোকের মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু দেখি নি, কিন্তু স্বাতি তাঁকে প্রশ্রয় দিচ্ছে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। কেন দিচ্ছে তা আজও আমাকে বলে নি।

হঠাৎ তার গলা শুনতে পেলুম: একি হালদার মশাই! চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, স্নান করে আসুন!

তার দিকে ফিরে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। স্নান সেরে স্ল্যাক্‌স্‌ পরেই সে এসেছে। গায়ে সেই উলের কার্ডিগান। তার ভিজে শাড়ি গামছা একজন ঘোড়াওয়ালার হাতে দিয়ে বলল: তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে।

আর দেরি না করে আমরাও তাড়াতাড়ি স্নান করে এলুম। তার পরে ভিজে কাপড় গামছা ঘোড়াওয়ালার হাতে গছিয়ে 'জয় কেদার' বলে যাত্রা করলুম। একটা দোকানের চাতালে বোঝা নামিয়ে বাহাত্তুর অপেক্ষা করছিল। সেও উঠে পড়ল।

খানিকটা এগিয়েই গৌরীকুণ্ডের সীমানা শেষ হল। ঘোড়াওয়ালারা বলল: এইবারে ঘোড়ায় উঠুন। এখান থেকে শুধুই চড়াই।

তাদের সাহায্য নিয়েই আমরা ঘোড়ায় উঠলুম। দেখলুম যে এখানে আরও অনেক ঘোড়া আছে। এ পর্যন্ত পথ যারা হেঁটে এসেছে, তাদেরও অনেকেই এখানে ঘোড়া নিচ্ছে। মাঝ পথে রামবাড়ায় ঘোড়া নেবে আরও অনেকে। কাণ্ডি নামে এক রকমের ঝুড়িও ভাড়া পাওয়া যায়। ঝুড়ির এক ধারটা কাটা। হাল্কা বুড়োবুড়ি বা বাচ্চারা তাতে পা ঝুলিয়ে বসতে পারে। আর একজন লোক সেই ঝুড়িটি পিঠে নিয়ে চলে। এ পথে কাণ্ডিওয়ালাও অনেক আছে। দুঃসাধ্য চড়াই ভাঙতে তারা সাহায্য করে।

আবার যখন পারে না, তখন পিঠের মানুষকে নামিয়ে দিয়ে একটু-খানি হাঁটবার জন্যেও অনুরোধ করে। কিন্তু ডাণ্ডিবাহক চার বা ছ জন। যেমন ওজনের মানুষ, ততগুলি বাহক। কিন্তু চারজনেই বইতে হয়। দুজন পালা করে কাঁধ বদল করে। ডাণ্ডি হল কাঠের ডিঙি নৌকোর মতো। এক দিকে হেলান দেবার ব্যবস্থা, অন্য দিকে পা ছড়িয়ে বসার জায়গা। বাহকদের কাঁধের বাঁকের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝুলোনো। তারা জোরে জোরে খানিকটা পথ চলে, তার পর ডাণ্ডি পথে নামিয়ে বিশ্রাম করে খানিকক্ষণ। চটি দেখলে চটির সামনে দাঁড়ায়, যাত্রীকে চা দিয়ে নিজেরাও খায়। গৌরীকুণ্ডেও দেখলুম খানকয়েক ডাণ্ডি যাত্রীর অপেক্ষায় আছে।

১১৭৫৩ ফুট উঁচুতে কেদারনাথ। এখান থেকে শুধুই চড়াই, কিন্তু যাত্রীরা নির্ভয়। অনেকেই পায়ে হেঁটে চলেছে বীরের মতো লাঠি ঠুকে ঠুকে। পাহাড়ের গায়ে পাকদণ্ডি দেখলেই উঠে পড়ছে তাই দিয়ে। পথ তাতে সংক্ষেপ হচ্ছে। ন মাইল পথ নাকি সাত মাইল হবে। কিন্তু কষ্ট করতে হবে একটু বেশি।

ঘড়ি দেখে পাহাড়ের সময় চলে না, আলো দেখে সময়ের হিসেব। আকাশ ফর্সা হলেই কাজের শুরু, আর যাত্রার শুরু তারও আগে। রৌদ্র প্রখর হলে পথ চলতে কষ্ট হয়, বেলা বাড়লে ঝড় বাদলের ভয়। কাল গৌরীকুণ্ডে পৌঁছবার আগে একবার জলে ভিজবার ভয় হয়েছিল। আকাশে মেঘ দেখেছিলুম, দু এক ফোঁটা জলও পড়েছিল। আমরা একটা আশ্রয়ের অন্বেষণ করেছিলুম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি হয় নি। পথে ভিজতে হয় নি আমাদের। ঘোড়াওয়ালারা বলেছিল, এ কেদারনাথেরই কৃপা।

এখন আমরা পথের উপরে রোদ দেখছি, কোথাও দেখছি অরণ্যের ছায়া। কোথাও বা মন্দাকিনীকে দেখছি ঝর্ণার মতো।

এক সময়ে আমরা রামবাড়া চটি পৌঁছে গেলুম। খুব শীতল স্থান। বুঝতে পারলুম যে চার-পাঁচ মাইল পথ আমরা উপরে উঠে

এসেছি। কেদারনাথে রাত্রিবাস করতে যাঁরা ভয় পান, তাঁরা থাকেন এখানে। ভোর বেলায় বেরিয়ে কেদার দর্শন করে ফিরে আসেন বিকেল বেলায়। বিকেল বেলায় ঝড় বৃষ্টি এখানে লেগেই থাকে। পাহাড়ে তাই সকালে চলাই নিরাপদ।

হালদার মশাইকে আর দেখতে পাচ্ছি না। তিনি পিছিয়ে পড়েছেন, না পাকদণ্ডি দিয়ে আরও উপরে উঠে গেছেন বুঝতে পাচ্ছি না। আমরা রামবাড়ার চটিতে আর থামলুম না। চায়ের তৃষ্ণা এখন আর নেই, এখন শুধু কেদারনাথে পৌঁছবার বাসনা।

খানিকটা এগিয়ে আমি একজন বিশালবপু প্রৌঢ়কে দেখলুম ঘোড়ার পিঠে। খুব ধীরে ধীরে চলেছেন। আমাকে কাছাকাছি পৌঁছতে দেখে ফিরে দেখলেন। এক হাতে লাগাম ধরেছেন, আর হাতে শক্ত করে চেপে আছেন ঘোড়ার জিন। মুখে বললেন: জয় রামজী কি!

আমি বললুম: জয় কেদার!

চলতে চলতেই পরিচয় হল। উত্তরপ্রদেশের বিজনোরে তাঁর ভুরার ব্যবসা। ভুরা মানে দেশী চিনি বা গুড়ের চিনি। কেদারনাথ দর্শনে একা চলেছেন। আরও খানিকটা এগিয়ে আর একজন যাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁর গায়ে খদ্দরের কোট, সাদা ধবধব করছে, তিনিও ঘোড়ায় চেপে চলেছেন। গুজরাতের ধনী ব্যবসায়ী তিনি, লোহার কারখানা আছে বম্বের নিকটে। সঙ্গে তাঁর পরিবার আছে। পিছনে আটখানা ডাণ্ডিতে তাঁরা আসছেন।

সহসা সামনের দিক থেকেও যাত্রীদের নেমে আসতে দেখলুম। খানিকটা শুকনো চেহারা, কিন্তু মুখে অদ্ভুত প্রসন্নতা। আমাদের উদ্যম দেখে তাঁরা উৎসাহ দিলেন, জয় কেদার!

আমাদের গলা খানিকটা শুকিয়ে উঠেছে। তবু উত্তর দিলুম: জয় কেদার!

একজন মহিলাকে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: কেমন দেখলেন?

মহিলা তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন : চমৎকার।

সত্যিই চমৎকার এই যাত্রার পথ। কোথাও বরফের পাহাড় দেখতে পাচ্ছি, কোথাও দেখছি একটা ঝর্ণা পাহাড়ের গায়ে বরফ হয়ে জমে আছে। আরও গরম না পড়লে সেই ঝর্ণা জল হয়ে নিচে নামবে না। এই রকমের বরফের ঝর্ণা পেরিয়ে এগোতে হচ্ছে। পথের উপর থেকে বরফ সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে। হাত দিয়ে মুঠো ভরে নেওয়া যায় সেই চিনির মতো বরফ, দলা পাকিয়ে খেলা করা যায় বলের মতো। এমন দৃশ্যের তুলনা আমরা আর কোথাও দেখি নি।

স্বাতি বলল : এ পথে না এলে জীবনে এ সব দেখা হত না।

আর নিজের চোখে না দেখলে এ সৌন্দর্য কল্পনা করা যায় না।

রামবাড়ার পরে চড়াই যেন আরও কঠিন। ঘোড়ার পদক্ষেপ আরও মন্থর হয়েছে, পা টিপে টিপে চলছে ঘোড়া। ওধার থেকে অন্য ঘোড়া এলে পাহাড়ের দিকে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। খুব অভ্যস্ত এরা, লাগাম ধরে টানাটানি আমাদের করতে হচ্ছে না।

একটা চড়াইএর মাথায় উঠে আমার ঘোড়া দাঁড়িয়ে গেল। কী হল ?

পিছনে ফিরে দেখলুম যে ঘোড়াওয়ালা নিচে থেকে চেঁচিয়ে বলছে : দেবদেখনি।

মানে, কেদারনাথের প্রথম দর্শন এইখানে।

স্বাতি এই কথা শুনতে পেয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে গেল। তার পর ঘোড়াওয়ালার সাহায্য নিয়ে নেমে পড়ল পথের উপরে। এগিয়ে এসে বলল : তুমিও নামো। এই পথটুকু আমরা হেঁটে যাব।

এই নাকি রীতি। তীর্থের পথে হেঁটেই যেতে হয়। অন্তত মন্দির দেখবার পরে হেঁটে এগোনোই উচিত। স্বাতি এসে আমার পাশে দাঁড়াল। দু জনে এক সঙ্গে দেখলুম কেদারনাথের মন্দির।
দেবদেখনি থেকে উঁচু নিচু পথ অনেকটা ঘুরে ছোট একটা পুল

পেরিয়ে ঢুকেছে কেদারনাথের লোকালয়ে। তারই শেষ প্রান্তে এই মন্দিরের চূড়া দেখতে পাচ্ছি। তার পিছনে বরফে আচ্ছন্ন পাহাড়। এই পাহাড় যেন মন্দিরের পিছন থেকে উপরে উঠে গেছে। আমাদের ঘোড়াওয়ালারা পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল : জয় কেদার!

আমরাও বললুম : জয় কেদার!

তার পরে এগিয়ে চললুম। আকাশের সূর্য তখনও মাথার উপরে ওঠে নি। কিন্তু প্রসন্ন রৌদ্রে ঝকঝক করছে চারি দিক। এই আলো বরফের উপরে পড়ে রূপোর পাহাড় বলে মনে হচ্ছে। এই মাইলখানেক পথ এগিয়ে গেলেই আমরা কেদারনাথের দর্শন পাব।

স্বাতি বলল : শুধু এই মন্দির নিয়েই কি কেদারনাথ?

বললুম : মন্দিরের জন্যেই সব। ঘরবাড়ি ধর্মশালা রেস্ট হাউস দোকান পাট পাণ্ডাদের আস্তানা যা দেখতে পাচ্ছি, সবই এই মন্দিরের জন্যে।

আর কিছু দেখবার নেই?

সামনে শীর্ণ ধারার মন্দাকিনী দেখতে পাচ্ছি প্রচণ্ড বেগে বয়ে আসছে। কিন্তু স্বাতির প্রশ্ন আমি বুঝতে পেরেছি। বললুম : মন্দাকিনী ছাড়া কাছে আর কিছু নেই। তার জন্যে দূরে যেতে হবে।

স্বাতি সেই কথা জানবার জন্যে আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম : মন্দিরের কাছে আছে উদককুণ্ড আর পাহাড়ের গায়ে ভৈরবের মন্দির।

আর—

আর আছে দুটি সরোবর—চোরাবারি তাল আর বাসুকি তাল।

স্বাতি বলল : এ সব কত দূরে জানো?

বললুম : বই পড়া বিদ্যে। মন্দিরের পিছনে মন্দাকিনী পার হতে হয়। পাথরের উপরে কাঠ ফেলে পুল তৈরি হয়েছে। তার পরে বরফের পাহাড়ের দিকে উঠতে হয়। বরফের পাহাড়ের

কোলে হ্রদ। বোধ হয় কোনও হিমবাহের সঙ্গে যুক্ত। এরই এক ধার থেকে মন্দাকিনীর জন্ম। মহাত্মাজীর অস্থি বিসর্জনের পরে এই চোরাবারি তালের নাম হয়েছে গান্ধী সরোবর। এক দিনেই যাতায়াত করা যায়। সকালে বেরিয়ে স্বচ্ছন্দে ফেরা যায় বিকেল বেলায়।

আর বাসুকি তাল?

চোখের সামনে তখন আমরা কাঠের সেতুটি দেখতে পাচ্ছি। আর বাঁ হাতে একটি সরু পায়ে চলার পথ পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে। পিছনের ঘোড়াওয়ালাকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: এ পথ কোথায় গেছে?

উত্তর পেলুম যে এই হল বাসুকি তালের পথ। কিন্তু অত্যন্ত দুর্গম বলে খুব কম যাত্রীই সেখানে যায়। কিন্তু কষ্ট স্বীকার করে সেখানে গেলে আনন্দে মন ভরে যায়। পাহাড়ে ঘেরা নীল জলের হ্রদ, মাইল দেড়েক লম্বা আর চওড়া এক মাইলেরও বেশি। শুধু পাহাড় আর বরফ, চিহ্ন নেই গাছপালার। এই হ্রদেই জন্ম হয়েছে বাসুকি গঙ্গার, সোমপ্রয়াগে তার সোম নাম। মন্দাকিনীর সঙ্গে তার মিলন।

আর একটি অপরূপ ফুল দেখা যায় এই পথের ধারে। ব্রহ্মকমল। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে কেদারনাথের পূজো হয় এই ফুলে। পাথরের আশেপাশে ছোট ছোট গাছে এই ফুল ফোটে। ব্যানার মতো লম্বা পাতার গাছ। মাটি থেকে একটি ডাটা বেরোয় তিন চার হাত লম্বা। তারই মাথায় বড় বড় সাদা ফুল। দু হাতের মুঠো ভরে ধরতে হয়। যেমন সুন্দর, তেমনি তার সৌরভ। বাতাস আকুল হয়ে থাকে তার তীব্র গন্ধে। এ ফুল ফোটার সময় এখনও হয় নি, পাণ্ডারা যাত্রীদের নির্মাল্য দেয় শুকনো ব্রহ্মকমলের। আর খরচ দিয়ে গেলে ব্রহ্মকমলের পূজো দেয় তাদের কল্যাণের জন্যে।

তার পরেই আমরা মন্দাকিনীর পুলের উপরে পৌঁছে গেলুম। কাঠের ছোট পুল। বাঁধানো ঘাট। তার পরেই কেদারনাথের

লোকালয়। পাথরের পথের দু ধারে পাথরের ঘর বাড়ি। কোন কোনটি দোতলা, একতলাই বেশি। মূল পথটি গিয়ে শেষ হয়েছে মন্দিরের সিঁড়িতে। সেখানে পৌঁছে স্বাতি আমার দিকে তাকাল। বলল : জানো, স্বপ্নে আমি এই মন্দিরটিই দেখেছিলাম।

বললুম : স্বপ্ন তোমার সার্থক হয়েছে।

মন্দিরের দ্বার খোলা ছিল। কিন্তু আমরা মন্দিরে ঢোকার চেষ্টা করলুম না। হালদার মশাইকে খুঁজলুম পিছন ফিরে। তিনি এখনও এসে পৌঁছন নি। কিন্তু আমাদের পাণ্ডা এসে উপস্থিত হলেন। বললেন : আসুন, আপনাদের পূজোর ব্যবস্থা করি।

বলে সামনের এক দোকানে টেনে আনলেন। পূজার উপকরণ বিক্রি হয় এখানে—শুকনো ফুল বেলপাতা, শুকনো ফল ও মিষ্টি। দোকানদার রেকাবিতে করে সাজিয়ে পাণ্ডার হাতে দিল।

স্বাতি বলল : দাম ?

দাম পরে দিলেও চলবে। আসুন আমার সঙ্গে।

আমরা জুতো মোজা খুলে কলের জলে হাত ধুয়ে নিলুম। কয়েকটি ধাপ উপরে উঠেই রেলিঙ দিয়ে ঘেরা মন্দিরের চত্বর। সামনে পাথরের নন্দী। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

স্বাতি হতাশ হয়ে তাকাল পাণ্ডার দিকে। তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন : ভোগের জন্যে বন্ধ হয়েছে, এখনই দরজা খোলা হবে।

চারি দিক ঘুরে আমরা মন্দির দেখলুম। পাথরের মন্দির। সামনেটা চালার মতো, তার পরে শিখর গর্ভগৃহের উপরে। সামান্য কারুকার্য, কিন্তু গম্ভীর ভাবে পূর্ণ। পিছনেই তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী। এক ধারে মন্দির কমিটির অফিস, অন্য ধারে তাদের রেস্ট হাউস। খানিকটা তফাতে শঙ্করাচার্যের মর্মরমূর্তি স্থাপিত হয়েছে। আরও কিছু নির্মাণ করা হবে বলে বোধ হল।

পাণ্ডা বললেন : গরিবের বাড়িতেই থাকবেন তো !

তার পরেই বললেন: বাড়ি আমার নয়, আমার উপরে রক্ষণাবেক্ষণের ভার।

স্বাতি বলল: এই রেস্ট হাউসে জায়গা পেলে অন্য কোথাও যাব না।

এখানে জায়গা পাওয়া যাবে।

বলে তিনি অফিসে ঢুকে ব্যবস্থা করে এলেন।

ঠিক এই সময়েই মন্দিরের দরজা খুলে গেল। পাণ্ডা বললেন: আসুন।

তিনি আমাদের পূজা করালেন যত্ন করে। বাইরে গণেশের পূজা শেষ করে মন্দিরের ভিতরে ঢুকলুম। আশ্চর্য হলুম শিবের জ্যোতির্লিঙ্গ দেখে। কালো এক শিলাখণ্ডই কেদারনাথ। কোনও আকার নেই, কোনও সজ্জা নেই, বিরাট এক পাথরকে আমরা পূজা করলুম। ধূপ দীপ জেলে পাথরের গায়ে ঘি মাখিয়ে মন্ত্র পড়ে প্রাণ ভরে দেখে দু হাতে দেবতাকে আলিঙ্গন করলুম। এখানে কোনও দ্বাররক্ষী নেই, নিকটে যেতে বারণ করে না কেউ, স্পর্শ করার অধিকার আছে সকলের। আরও অনেক যাত্রী এসেছেন ভিতরে। কেউ মন্ত্র পড়ছেন, কেউ ধ্যান করছেন, কেউবা চোখের জলে ভিজিয়ে দিচ্ছেন পাথরের দেবতাকে। কী আনন্দ, কী তৃপ্তি, কী অপূর্ব শিহরণ জাগে মনে।

বাহিরে কেউ ঘণ্টা বাজাল, তার প্রতিধ্বনি এল ভিতরে। ব্যোম ব্যোম শব্দ করলেন একজন, আর একজন বুঝি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন। না, কষ্টের কান্না এ নয়, এ কান্না আনন্দের। জীবন সার্থক হয়েছে তাঁর, তাই প্রকাশ করলেন কেঁদে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আবছায়া অন্ধকারে তার দু চোখেও আমি জল দেখলুম। আমার কণ্ঠস্বরও তখন ভারি হয়ে এসেছে, আমি কোন কথা বলতে পারলুম না।

৩৫

মন্দিরের বাহিরে বেরিয়ে হালদার মশাইকে দেখতে পেলুম। মন্দিরের সিঁড়ির ধাপেই তিনি বসে পড়েছেন। খানিকটা তফাতে অপেক্ষা করছে বাহাদুর। স্বাতি চেঁচিয়ে উঠল: এই যে হালদার মশাই!

হালদার মশাই ফিরে তাকালেন, কিন্তু কোন কথা বললেন না। মনে হল, অভিমানে থমথম করছে তাঁর মুখ।

আমি বললুম: আসুন, পূজো করবেন না!

পাণ্ডাকে স্বাতি বলল: হালদার মশাইকে পূজো করিয়ে দিন।

বলে মন্দির কমিটির অফিসে খোঁজ নিয়ে রেস্ট হাউসে ডেকে নিয়ে গেল বাহাদুরকে। ফিরে এসে পথের ধারের একটা খাবারের দোকানে ঢুকল।

কী পাওয়া যাবে?

পুরি আর আলুর তরকারি।

ভাত ডাল?

দোকানদার হেসে বলল: ভাত ডাল এখানে সেদ্ধ হয় না। এখানকার আগুনে অত আঁচ নেই।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: ঘোড়াওয়ালারা তাহলে খিচুড়ি খাবে কেমন করে?

সে ওরাই জানে।

তাহলে আমরা পুরি তরকারিই খাব।

দেখা গেল যে আলু সেদ্ধ করা আছে, তারই ঝোল হবে। আর কাঠের আগুনে ভাজা হবে পুরি। হালদার মশাই পুজো করে ফিরে এলে আমরা এক সঙ্গে খাব।

আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে তাঁর জন্যে আমরা অপেক্ষা করি নি বলেই তাঁর অভিমান হয়েছে। এই দেশের নানা জায়গায় তাঁর

সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। রামেশ্বরের পরে আমাদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখেছেন পুষ্করের পথে, দ্বারকার সমুদ্রবেলায় অন্ধকারে, আর সোমনাথের মন্দিরের আড়ালে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়। এ নিয়ে সত্যিই অনেক মুখরোচক গল্প হতে পারত, কিন্তু সে রকমের কিছু করেছেন বলে শুনি নি।

অথচ জো রায়ের সঙ্গে স্বাতির বিয়ের সম্বন্ধটা বোধ হয় তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন। পুরীর সমুদ্রবেলায় যখন দেখা হয়েছিল, তখন আমাকে বলেছিলেন, পরনিন্দার জন্যে পরনিন্দা করি না, করি পেটের জন্যে। আর ভয় দেখিয়েই যদি রোজগার হয় তো ও কাজ কেন করব! এই আপনাদের কথাই ভাবুন না! যা দেখেছি, তাই কি যথেষ্ট নয়! ইচ্ছে করলে এই কথা ভাঙিয়েই খেতে পারতুম। কিন্তু তা করি নি। আপনারা যে নির্দোষ, সে কথা তো জানি!

তার পরে বলেছিলেন, এবারে এই ধর্মই তো করে এলুম। কিন্তু যার পয়সায় এলুম, তার নাম আমি কিছুতেই বলব না।

স্বাতির বিয়ে ভেঙে দেবার গল্পটাও বলেছিলেন।—জো রায় যে পাত্র খারাপ অঘোর গোস্বামীর কাছে সে কথা বলা চলে না। জো রায়ের কাছে টাকা নিয়ে তীর্থস্থানে শপথ করেছিলেন। কাজেই জো রায়ের বাপের কাছে মেয়ের কথা বলতে হল। মেয়ে ভাল, কিন্তু—

এক গাল হেসে আমাকে বলেছিলেন, এই কিন্তুটি আমাকে বলতে বলবেন না। তার পরে দুই বুড়োয় কী কথা হল জানি না। গোঁসাইজীর বাড়ি গিয়ে খবর পেলুম, বিয়ে ভেঙে গেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, খাঁটি খবর তো?

হালদার মশাই তার নোংরা দাঁত আকর্ণ বিস্তার করে বলেছিলেন, বললুম তো, কার পয়সায় এসেছি তা কিছুতেই বলব না। শপথ করেছি কিনা!

বুঝতে আমার কিছুই বাকি ছিল না। হালদার মশাইকে সেদিন সুন্দর দেখাচ্ছিল। সমুদ্রের মতো সুন্দর।

আজ তাঁকে কেদারনাথ পাহাড়ে দেখছি। ঐ তো, কেদারনাথের পূজো শেষ করে তিনি এই দিকেই আসছেন। কিন্তু তাঁর মুখখানা থমথম করছে কেন!

স্বাতি উঠে এগিয়ে গেল তাঁকে ডেকে আনতে। সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে দুজনের কথা হল খানিকক্ষণ। তার পরে বড় বড় পা ফেলে দুজনেই মন্দিরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। পাণ্ডাও তাঁদের সঙ্গে গেলেন।

বেশিক্ষণ নয়, অল্পক্ষণ পরেই তাঁরা ফিরে এলেন। কিন্তু হালদার মশায়ের পরিবর্তনটা বেশ লক্ষ্য করবার মতো। আনন্দে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, কণ্ঠস্বরে সেই সজীবতা। উচ্চকণ্ঠে বলছেন: তোমাদের সারাক্ষণ তাড়া। একটুখানি অপেক্ষা করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত!

স্বাতি কোন উত্তর না দিয়ে হাসছিল অল্প অল্প। আমার কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা করলুম: ব্যাপার কী?

উত্তর দিলেন হালদার মশাই, বললেন: ভোর বেলায় একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, তারই খেসারত দিতে হল।

খেসারত!

তাছাড়া আর কী! গঙ্গোত্রীর জল এনেছিলুম খানিকটা। আমার মাকে দেখে ইচ্ছা হয়েছিল যে এই জল মায়ের হাতে দেব কেদারনাথের মাথায় চড়াবার জন্যে।

স্বাতি বলল: খুব ছেলেমানুষ আপনি!

চেয়ে দেখলুম স্বাতির দৃষ্টি তখন ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে।

পাণ্ডা বললেন: আসুন, ফলাহারী বাবার সঙ্গে দেখা করে আসি।

ফলাহারী বাবা!

পাণ্ডা বললেন: ঐ তো, সামনের কুঠিয়ার সামনে এখন বসে আছেন।

পথের অন্য ধারে তাঁর দোতলা কুঠিয়া। একজন ছোটখাট মানুষ বাইরের রোদে বসে আছেন। আশেপাশে দু চারজন যাত্রী। পাণ্ডা বললেনঃ বাবা এখানে বিশ পঁচিশ বছর আছেন। শীতের সময়েও এইখানে থাকেন। যখন একতলা কুঠিয়ায় থাকতেন, তখন একবার বরফে চাপা পড়ে গিয়েছিল তাঁর কুঠিয়া। গৌরীকুণ্ড থেকে লোকজন এসে বরফ সরিয়ে তাঁকে তারা উদ্ধার করে। সেইবারেই এই কুঠিয়াকে দোতলা করে দিয়েছে তাঁর ভক্তরা।

তাঁর কাছে যেতে যেতে স্বাতি বললঃ ফলাহারী বাবা নাম কেন হল?

পাণ্ডা বললঃ আর তো কিছু খান না। শুধু শুকনো ফল খেয়েই থাকেন।

বৃদ্ধ সাধু, আশ্চর্য সরল মানুষ। মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি গোঁফ, গায়ে একখানা কম্বল। সামনে একটা ধুনি জ্বলছে। শিশুর মতো হাসেন, প্রণামের উত্তর দেন আশীর্বাদ করে। সবাই তাঁর আপন জন।

বছর কয়েক পরে তাঁর কথা আবার শুনেছি। যে বছরে যাত্রীরা ফলাহারী বাবাকে দেখতে পায় নি। তিনি দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর বদলে তারা হোটেল হিমলোক দেখে এসেছে।

কেদারনাথ সত্যিই হিমলোক। যে পাহাড়ের পাদদেশে এই মন্দির, তার উচ্চতা ২২৭৭০ ফুট। কেদারশৃঙ্গের উল্টো দিকেই গঙ্গোত্রী গৌমুখ, কুড়ি পঁচিশ মাইল দূরে। শোনা যায়, উলঙ্গ সাধুরা মাঝে মাঝে এই পাহাড় ডিঙিয়ে চলে আসেন। শুধু হাতে, শুধু পায়ে। আশ্চর্য দক্ষতা তাঁদের।

বদ্রীনাথের দূরত্ব এখান থেকে ছাব্বিশ মাইল। পুরাকালের যাত্রীরা শোনা যায় এই বরফের উপর দিয়েই যাতায়াত করতেন। এখনকার মতো ঘুরে উখীমঠ চামোলি হয়ে যেতেন না।

মহাভারতের যুগে পঞ্চপাণ্ডব এখানে এসেছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে। এই পথেই স্বর্গারোহণের চেষ্টা করেছিলেন। দ্রৌপদী এই

কষ্ট স্বীকার করতে পারেন নি, সকলের আগে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। তার পর একে একে সহদেব নকুল অর্জুন ও ভীম। একমাত্র যুধিষ্ঠিরই পৌঁছতে পেরেছিলেন তাঁর লক্ষ্যে।

এ যুগের যাত্রীরা এ পথে যায় না। এ পথ অতিক্রমের দুঃসাহস নেই তাদের। এখন এই সব পথে যাতায়াত করে তরুণ অভিযাত্রী-দল। তারা ছবি তোলে, বই লেখে। সেই সব পড়ে আমরা অনেক নতুন কথা জানি, আনন্দ পাই আরও বেশি।

দুপুরের আহারে বসে হালদার মশাই বললেন: এই মন্দিরটি কার তৈরি গোপালবাবু?

স্বাতি হেসে বলল: ঠিক লোককেই ধরেছেন।

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম: ভীমের তৈরি।

ভীম!

বললুম: হ্যাঁ, মধ্যম পাণ্ডব ভীম।

সত্যি!

সত্যি বৈকি। শিব মহিষের রূপ ধারণ করে পাতাল প্রবেশ করছেন দেখে ভীমই তো তাঁকে জাপটে ধরে উপরে আটকে রাখলেন। শিবের সেই পশ্চাৎভাগই তো পাথর হয়ে আছে। তার ওপরে মন্দির করবে কে? এই সব পাথর আনার শক্তি আছে কার?

হালদার মশাই বললেন: ঠিকই বলেছেন।

স্বাতি বলল: আপনাকে ঠকাচ্ছে হালদার মশাই। অত দিনের পুরনো মন্দির কি আজও টিকে থাকতে পারে!

হালদার মশাই গম্ভীর ভাবে বললেন: এই স্বর্গরাজ্যে সবই সম্ভব।

বললুম: তাহলে আর একজন মানুষের নাম জেনে রাখুন। তাঁর নাম হল শঙ্কর। পাঁচ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। বৌদ্ধ মত জয় করে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছিলেন

ভারতের সর্বত্র। তার পরে বত্রিশ বছর বয়সে এই অঞ্চলে এসে বদ্রীনাথ ও কেদারনাথকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে চিরদিনের মতো হারিয়ে গিয়েছিলেন। আজ এত দিন পরে আমরা এখানে তাঁর মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছি।

খেতে খেতেই হালদার মশাই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বললেন ঃ শঙ্করাচার্য কী বলেছিল বলতে পারেন ?

বলেছিলেন, এক কোটি বইএ যা লেখা আছে, তা আমি আধখানা শ্লোকে বলব। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

হালদার মশাই নিঃশব্দে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম ঃ শঙ্করাচার্য বলেছেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জীব আর ব্রহ্ম অভিন্ন।

মানে ?

এর মানে তো বলতে পারব না হালদার মশাই, এ হল অনুভব করবার কথা। তপস্যায় বলুন, ধ্যানে বলুন, সাধনায় বলুন—মহা-মানবেরাই শুধু এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করেন। আর পণ্ডিতরা মারা-মারি করেন এর অর্থ নিয়ে।

হালদার মশাই আর কোন কথা বললেন না।

সারা দিন ঘুরে বেড়াবার পরে ক্লান্ত হয়ে আমরা শুয়ে পড়েছিলুম। কয়েকখানা লেপ দিয়ে গিয়েছিলেন পাণ্ডা। খাটের উপরে নরম বিছানা, তার উপরে লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে বেশ আরাম হয়েছিল। বাহিরে বেরিয়ে চা খেতে যেতেও ইচ্ছা হচ্ছিল না। সন্ধ্যা বেলায় স্বাতি আরতি দেখতে যাবে। ব্যবস্থা হয়েছিল, পাণ্ডা এসে ডেকে নিয়ে যাবেন। আমি নিশ্চিন্ত, আমার কোনও কাজ নেই।

ঠিক এই সময়ে আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল। আর চমকে

লাফিয়ে উঠল স্বাতি। বলল: চল চল, তৈরি হয়ে নাও শিগগির। হালদার মশাই, ও হালদার মশাই!

কিন্তু পাশের ঘর থেকে কোনও উত্তর এল না।

আমরা জামা কাপড় পরেই শুয়েছিলুম। উঠে মাথায় গায়ে গরম চাদর জড়িয়ে নিলুম। পাণ্ডাও এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু হালদার মশাইকে খুঁজে পাওয়া গেল না। পাশের ঘরে তাঁর বিছানা শূন্য। তিনি বোধ হয় আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

ঘরের বাহিরে বেরিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। জ্যোৎস্নায় চারি দিক উদ্ভাসিত হয়ে আছে। আর মাথার উপরে ঝির ঝির করে কি যেন পড়ছে। স্বাতি বলল: এ কী পড়ছে?

পাণ্ডা হেসে বললেন: বরফ।

এ তো পেঁজা তুলোর মতো নয়!

এ যে সরু চিনির দানার মতো মনে হচ্ছে!

পাণ্ডা বললেন: দু রকমেরই বরফ পড়ে। এই বরফে ঠাণ্ডা বেশি। কাল সকালে দেখবেন, মাটির উপরে বরফ জমে আছে। মুঠো করে গোলা করতে পারবেন। আর বরফের যে সব বড় বড় তাল দেখেছেন, তা আরও বড় হয়ে থাকবে।

পাণ্ডার সঙ্গে স্বাতি মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেল। কিন্তু আমি ভিতরে ঢুকতে পারলুম না। বাহিরের এই সুন্দর পৃথিবী আমার পা দুখানা আড়ষ্ট করে দিল। মন্দিরের বাহিরের চত্বরে আমি থমকে দাঁড়ালুম।

এখন আমার আশেপাশে কেউ নেই, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কাছে। তবে খানিকটা তফাতে খাবার দোকান দুটো এখন সরগরম হয়ে উঠেছে। যাত্রীদের অনেকে এখন চায়ের সঙ্গে গরম পকৌড়া খাচ্ছেন। কিন্তু হালদার মশাইকে আমি তাঁদের মধ্যেও দেখতে পেলুম না। তবে কি তিনি মন্দিরের ভিতরে ঢুকেছেন আরতি দেখতে!

ফলাহারী বাবার কুঠিয়ার দিকে আমি তাকালুম। না, তিনি এখন বাহিরে নেই। এখন তিনি নিশ্চয়ই তাঁর কুঠিয়ার মধ্যে ধুনির সামনে বসে ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন। পৃথিবীর সঙ্গে এখন আর তাঁর সম্পর্ক নেই, তিনি এখন অন্য জগতে বিরাজ করছেন। যে জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই, হবেও না কোন দিন। সে জগতের রূপ চোখ মেলে দেখতে হয় না, তার রূপ দেখতে হয় মনের চোখ দিয়ে।

আমি এবারে অন্য দিকে তাকালুম। সে দিকে শঙ্করাচার্যের মর্মরমূর্তি উন্মুক্ত আকাশের নিচে স্তব্ধ হয়ে আছে। কিন্তু এ কী! তার নিচে যে একজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছি! গায়ে কম্বল ও মাথায় চাদর জড়িয়ে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন পাথরের মূর্তির মতো। খানিকটা এগিয়ে গেলুম আমি। না, ভুল হয় নি আমার! হালদার মশাইকে আমি ঠিকই চিনতে পেরেছি। কিন্তু তাঁকে যে আমি এই ভাবে বসে থাকতে দেখব, এ আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। দিনের বেলায় তিনি আমার কাছে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের কথা জানতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলুম, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। এ কথা বুদ্ধি দিয়ে বিচারের নয়, এ উপলব্ধির জিনিস, তপস্যায় এই বিশ্বাস জন্মে। হালদার মশাই কি আজ তাঁর সমস্ত চেতনা দিয়ে এই সত্য উপলব্ধি করতে চাইছেন!

আমি আবার ফিরে এলুম মন্দিরের দরজার সামনে। কিন্তু বন্ধ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে আমার মন রাজী হল না। ভিতরে এখন আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছে, ডমরুর মতো ধ্বনি ভেসে আসছে বাহিরে। ব্রাহ্মণেরা বোধ হয় শিবকে সাজিয়েছেন রাজ বেশে, ফুলের মালা পরিয়েছেন। ধূপে ও ধুনার গন্ধে ভরে গেছে মন্দিরের গর্ভগৃহ। বেদপাঠ হচ্ছে, মন্ত্র পড়ছেন পূজারী, আর ভক্তরা দাঁড়িয়ে আছেন করজোড়ে।

কিন্তু আমি কেন ভিতরে ঢুকতে পারছি না! এই উন্মুক্ত

পৃথিবীর আকর্ষণ কি আরও বেশি নয়! এ কি মানুষের পৃথিবী, না দেবতার! মানুষের পৃথিবী তো এ রকম নয়!

মাথার উপরে যে বরফ পড়ছিল, আমি তা ভুলে গিয়েছিলুম। শীতের কথা আমার মনে ছিল না। নিজের কথাও না। মন্দিরের কথাও আমি বুঝি ভুলে গিয়েছিলুম। আমার মন যে অন্য জগতে চলে গিয়েছিল, আমি তা জানতে পারি নি। সে এক স্বপ্নের জগৎ। সে জগতে পৃথিবী আরতি করছে বিশ্বদেবতার। আমি তাঁকে প্রণাম করলুম।

হিমালয় পর্ব সমাপ্ত

রম্যাণি বীক্ষ্য

মানুষের নূতন দেশ দেখার বাসনা কতকটা নেশার মতো। কেউ সে সুযোগ পান, কেউ পান না। কিন্তু শখ সবারই সমান। যাঁরা ভ্রমণ করেন, তাঁদের একটা সঙ্গীর দরকার, যে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর জন্য ভ্রমণকাহিনীই সবচেয়ে ভাল সঙ্গী। আর যাঁরা বাড়িতে বসে ভ্রমণের আনন্দ পেতে চান, তাঁদেব কাছেও ভ্রমণকাহিনী অপরিহার্য। এঁদের সবার জন্যে লেখা হয়েছে রম্যাণি বীক্ষ্য। পর্বে পর্বে এই গ্রন্থ রচনা করে লেখক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী শুধু রবীন্দ্র-পুরস্কারেই সম্মানিত হন নি, গত কয়েক বৎসরে বাঙলার ভ্রমণ-সাহিত্যকে অভাবনীয় রূপে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের একটি শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ কবেছেন 'সুন্দর নেহারি'। তার মানে, নানা রম্যস্থান প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল, তারই অভিব্যক্তি এই রচনায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা কিছু মনোরম দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকার এক ধারাবাহিক ভারত-দর্শনের কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে ভারতের পৌবাণিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ই শুধু নয়, বর্তমানের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও আছে। তীর্থ-মাহাত্ম্যের পৌরাণিক বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকার মন্দির-স্থাপত্য ও তার কিংবদন্তী জনশ্রুতিকেও আলোচনার বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন। এতে নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ পাঠকেব দৃষ্টির সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

কিন্তু শুধু মাত্র ভ্রমণ-বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়। ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে একটি জীবন-ঘনিষ্ঠ কাহিনীও বইগুলির ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার করেছে। ভ্রমণে যাঁরা উৎসাহী নন, জীবনে যাঁরা শুধু প্রাণরসেরই সন্ধানী, উপন্যাসের রসের আকর্ষণে তাঁরাও এই গ্রন্থের প্রতিটি পর্ব সাগ্রহে পাঠ করবেন। ভ্রমণ-রসসিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

ধনী মামা অঘোর গোস্বামী তাঁর স্ত্রী ও অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য হাওডা স্টেশনে ট্রেন ধরতে এসেছেন। এই সময় প্ল্যাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পাতানো ভাগনে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী, কেরানীর কাজ করে কলকাতায়। মার্জিত

রুচি ও শিক্ষায় তার আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত। মামা-মামী তাকে সঙ্গী হবার অনুরোধ জানালেন, আর স্বাতির দৃষ্টিতে গোপাল আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আহ্বান। চল্‌তি ট্রেনে তাকে উঠে পড়তে হল।

প্রথম গ্রন্থ **অন্ধ্র পর্বে** ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপাল এল দুজনের কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিদ্যাবত্তায় স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। ওয়ালটেয়ার ও সীমাচলমে, বিজয়ওয়াডা ও মঙ্গলগিরিতে, অমরাবতী নাগার্জুন সাগর ও তিরুপতিতে দুজনেই আছে পাশাপাশি।

তামিল পর্বেও তারা একত্র আছে—মাদ্রাজ মহাবলীপুরম ও পক্ষীতীর্থে, কাঞ্চীপুর ও তাঞ্জোরে, ত্রিচিনপল্লী ও মাদুরায়, ধনুষ্কোডি রামেশ্বর ও তিরু-চেন্দুরে। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর **কেরল পর্বে** তাদের ঘরে ফেরার পালা। কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবেন্দ্রাম, বর্কলা, পেরিয়ার স্যাঙ্ক্‌চুয়ারি। যমজ শহর এর্নাকুলম-কোচিন থেকে ত্রিচুর গুরুভায়ুর। সেখান থেকে কালিকটের সমুদ্র দেখে নীলগিরি পাহাড়।

কর্ণাট পর্ব শুরু হয়েছে উটাকামণ্ডে। সেখান থেকে কর্ণাটক রাজ্য। হালেবিড বেলুর ও শ্রবণবেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেখে তারা এল হায়দ্রাবাদে। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই পর্বের পরিসমাপ্তি।

তারপর গোপালকে দেখা গেল দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রায় ভ্রমণরত। এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে **কালিন্দী পর্বে**। এখানে গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির আপাত পরিহাসপ্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদাবোধের আন্তরিক পরিচয়।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জির সঙ্গে মামা মামী মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি **রাজস্থান পর্বে**। দিল্লী থেকে জয়পুর আজমীর পুষ্কর চিতোর উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের কথা আছে **সৌরাষ্ট্র পর্বে**। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। এই বিত্তবান যুবককে

দেখে মামীর অপত্য স্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সোমনাথের পথে তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে কৃতসংকল্প হলেন।

জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি। পরবর্তী গ্রন্থ **কোঙ্কণ পর্বে**ও তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সঙ্গলাভে সমুৎসুক, সে তখন গোপালের সঙ্গে পুনা ও গোয়া ভ্রমণে ব্যস্ত। গুজরাটের আমেদাবাদ থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কোঙ্কণ উপকূলের কথা এই পর্বে বিবৃত হয়েছে।

তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে দেখল মধ্য ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—ধারা মাণ্ডু ইন্দোর ও উজ্জয়িনী, সাঁচী ভোপাল বিদিশা ও খাজুরাহো। এই কাহিনী পাওয়া যাবে **অবন্তী পর্বে**।

পরবর্তী তিনটি পর্বে সাক্ষাৎভাবে মামা মামী ও স্বাতির কথা নেই। তবে স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে মুহুর্মুহুঃ। **উৎকল পর্বে** পুরীর সমুদ্রবেলায়, ভুবনেশ্বরে ও কোনারকে গোপাল ঋতার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। **মগধ পর্বে** শীলা নিয়েছে নায়িকার ভূমিকা। সমগ্র দক্ষিণ বিহার ভ্রমণ করেছে এক সঙ্গে। তারপর আবার মিলিত হয়েছে পাটনা ও গয়ায়। ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য মগধের কথায় আধুনিক বিহারের কথাও এসে পড়েছে। আর **কোশল পর্বে** বর্ণিত হয়েছে কাশী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের প্রসঙ্গ। বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মসুরিতে চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গোপালকে তারা দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা।

হিমাচল পর্বে গোপাল আবার মামা মামী ও স্বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিমলায় অমৃতসরে ও কাংড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান। কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হিমাচল প্রদেশে এই ভ্রমণ শেষ হয় নি। পাঠানকোট থেকে সবাই জম্মুর পথে কাশ্মীরে গেছেন, যে কাশ্মীর দেখে আবুল ফজল বলেছিলেন হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন ভূস্বর্গ। শ্রীনগরের পর্বত-বেষ্টিত লেক ও হাউস্ বোটে তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। ঝিলমের তীরে তীরে, গুলমার্গ ও পহলগামের পাহাড়ে, সোনমার্গের হিমবাহে, উলারে, মোগল উদ্যানগুলিতে— সর্বত্র তার সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন। এক দিকে অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দিরে কাশ্মীরের অস্পষ্ট অতীত, অন্য দিকে ক্ষীরভবানী ও অমরনাথে তীর্থযাত্রীর সমারোহ। উত্তরে বিচিত্র দেশ লাদাখ ও দক্ষিণে ডোগরা রাজ্য জম্মুকে নিয়ে

আজকের কাশ্মীর সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। **কাশ্মীর পর্বে** এই রাজ্যের যাবতীয় কথা বিবৃত হয়েছে।

কামরূপ পর্বে সমগ্র আসামের পরিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ কামরূপ কামাখ্যা নয়, শুধু শিলঙ আর চেরাপুঞ্জি পাহাড় নয়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কোচ ও আহোম রাজাদের সভ্যতার কথাও জানা যাবে, আর জানা যাবে নেফা নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরের কথা এবং এই স্বল্প-পরিচিত দেশের বিচিত্র অধিবাসীদের আশ্চর্য পরিচয়।

এর পরে **গৌড় পর্বের** যবনিকা উঠেছে নাটকীয় পরিবেশে। মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গোপাল দার্জিলিঙের হাসপাতালে। দিল্লী থেকে স্বাতি এসেছে উড়ো জাহাজে। তারপর দুজনে দেখেছে দার্জিলিঙ কালিম্পঙ ও গ্যাংটক। হিমালয়ের প্রসঙ্গ অপরূপ বর্ণনায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কথা প্রসঙ্গে এসেছে পূর্ববঙ্গ ও ত্রিপুরার কথা। প্রাচীন ও আধুনিক গৌড়ের কথা সম্পূর্ণ হয়েছে মালদহে এসে।

ভাগীরথী পর্বে পশ্চিম বাঙলার কথা। রাজধানী কলকাতা যে কত বিচিত্র নিজের চোখে দুবেলা দেখেও তা জানা যায় না। আর কলকাতাই পশ্চিম বাঙলার সব নয়। বিস্মৃত-প্রায় তাম্রলিপ্ত সপ্তগ্রাম ও কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুর, রাঢ় দেশ ও শান্তিনিকেতন, দীঘা গঙ্গাসাগর ও সুন্দরবন—সব দেখা হতে না হতেই মামা মামী এলেন দিল্লী থেকে। স্বাতি ও গোপাল তখন মন্ত্রোচ্চারণ শুনছে : ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব…

এর পরে **হিমালয় পর্ব**। কাশ্মীর ও হিমাচলেই তো হিমালয়ের শেষ নয়, উত্তরাখণ্ড নেপাল সিকিম ও ভুটান ছাড়িয়ে অরুণাচলের শেষ প্রান্তে পরশুরাম কুণ্ড পর্যন্ত এই হিমালয় তার বিশাল মহিমায় সুবিস্তৃত। উত্তরাখণ্ড হল হিমালয়ের হৃৎপিণ্ড। শত সহস্র যাত্রীর প্রণামে নন্দিত কেদার-বদ্রীর পথে এসেছে স্বাতি ও গোপাল।

তারপর ?

অষ্টাদশ পর্বে বেদব্যাসের মহাভারত শেষ হয়েছে। কিন্তু বর্তমান মহাভারতের কথা কি এই অষ্টাদশ পর্বেই শেষ হয়ে যাবে ?

নিভা মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক